চীনা ইতিহাসের ধারা

অমল সান্যাল

পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৫২

দাম আড়াই টাকা

সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা, পূর্ব্বাশা লিঃ মুদ্রিত ও
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পুথিঘরের পক্ষ হইতে সতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

ভূমিকা

চীনের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা আলোক দেওয়া এবং সেই আলোকে নিজেও আলোকিত হওয়া—এই ছিল আমার ইতিহাস লেখার প্রেরণা। চীনের ইতিহাস শুধুমাত্র চীনেরই ইতিহাস নয়—সমস্ত জাতিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা এখানে ভীড় করে আছে। ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডবের প্রথম সুত্রপাতও এই চীনে। কাল্পনিক বলশেভিক-ভীতি প্রচারের ফ্যাসিষ্ট কৌশলও চীনের বুকেই প্রথম ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে। তারপর ফ্যাসিষ্টদের মতলব ফাঁস করে দিয়ে চীনের বুকেই প্রথম ফ্যাসিবিরোধী যুক্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে। এই সমস্ত নানা কারণে চীনের ইতিহাসের কাছে পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তি অশেষ ঋণী, বিশেষত ভারতবর্ষ। কুয়োমিনটাংএর মত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথেও যদি চীনে বিভিন্ন দলের মিলন সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের দেশে কেন সম্ভব হবে না—তা ভেবে পাই না—

চীনা ইতিহাসের ধারাতে ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে কোন কোন দিক থেকে অভিযোগ আসতে পারে। অবশ্য, নিরপেক্ষতা বলে কোন পদার্থ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আজ সারা দুনিয়া দুটো পরস্পর-বিরোধী চিন্তা-ধারায় সুস্পষ্ট ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ঐতিহাসিক যখন বলেন তিনি নিরপেক্ষই আছেন, তখন তিনি অজানিতে আত্মপ্রতারণাই করেন। চীনের ইতিহাস লেখার সময় তার মধ্যে যতটুকু মূল্যবান—বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণে সেই ঘটনাকেই গৌরবান্বিত করবার চেষ্টা করেছি। অবশ্য, অন্যান্য পাঁচজনের মত আমারও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে—সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঘটনার বিচার করেছি। তাতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে বলে কেউ যেন ক্ষুণ্ণ না হন। নিরপেক্ষতা আজ শত্রুরই হাতিয়ার—"only ghosts can live between two fires."

অমল সান্যাল

প্রাচীন কাল

পৃথিবীর প্রাচীনতম কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে চীন সভ্যতা অন্যতম। হাজার হাজার বছর আগে এর গোড়া পত্তন হয়। কিন্তু যে সুবিধের দৌলতে এই সভ্যতার প্রথম অভিযাত্রা সুরু হয় সেই সুবিধেই আবার সময়ের গতিফেরে বদ্ধ জলাশয়ের মত গতিহীন স্তব্ধ জীবনের অবসাদ ডেকে আনে। যে প্রাসাদ একদিন জমিদার বাবুর শ্লাঘার বস্তু ছিলো সেই প্রাসাদই যে আবার তাঁর নিরুপায় বংশধরের বুকে বোঝার মত চেপে বসতে পারে—বাংলার পুরোণো গ্রামের ততোধিক পুরোণো জমিদার গোষ্ঠির অনেকের এই দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা আছে। অনেকটা হুবহু অবস্থা হয়েছিলো চৈনিক সভ্যতারও।

চীনদেশটা খুবই বড়—স্থানে স্থানে খুবই উর্বর এর মাটি, তাই যুগের পর যুগ দলের পর দল আদিম মানবের সন্ধানী শোভাযাত্রা এর মাটিতে মিলিয়ে গেছে। নিজ নিজ ইচ্ছামত তারা জমির ওপর ঘর সংসার বেঁধেছে—অনাবিল শান্তিতে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে সভ্যতার পত্তন করেছে। যারাই এসেছে পরবর্তীকালে, জায়গা বা জমি নিয়ে তাদের রক্তারক্তি করার খুব বেশী প্রয়োজন হয়নি। মোঙ্গলদের উৎপাত মাঝে মাঝে হ'য়েছে সত্য কিন্তু কালে সেই মোঙ্গলরাই চীনের মাটীকে আপনার ক'রে নিয়েছিলো। তাছাড়া দীর্ঘ পনেরোশো মাইল প্রাচীর তুলে তারও মীমাংসা করা হয়। চীনের নদীগুলোও এমন বেথাপ্পা যে সাগরে মেশার মুখে এদের দুরন্তপনা এতই উগ্র হ'য়ে উঠেছে যার ফলে বহিসমুদ্রে যাওয়া বা সাগর সঙ্গমের নদী বেয়ে বাহির থেকে ভেতরে আসা

একরকম অসম্ভবই ছিল। ফলে, সাগরপথে বাইরের সংস্পর্শ পাওয়ার সুযোগ তার দীর্ঘকাল জোটেনি—যখন জুটেছিলো তখন চৈনিক সভ্যতার কাছে সেটা চরম অভিশাপের ক্ষণ।

স্থলপথেও অন্য কোন দেশের সম্পর্কে আসার সুযোগ তার তেমন ছিলো না—যাও বা ছিলো তা' যেমনি দুর্গম তেমনি বন্ধুর। সে পথে বেন্ হেডিন্, ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ড, হিউয়েনসাং প্রভৃতির মত দু'চারজন দুঃসাহসী লোক অথবা দু'চারদল স্বার্থবাহী বণিকের আকস্মিক আনাগোনা চল্‌তে পারে—কিন্তু, নিয়মিত সংস্পর্শে আসবার পথ হিসেবে সে পথ একেবারেই ছিল অব্যবহার্য।'

এইভাবে বহির্জগতের থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হ'য়েই চীন সভ্যতার এক বিশেষ ধরণের বিকাশ হয়। মাঝে মাঝে দু'চারজন পরিব্রাজক বা মার্কোপোলোর মত সাহসী পর্যটক চৈনিক রাষ্ট্রশক্তির সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির সংযোগ ঘটিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার গতি—শামুকের গতির মতই অর্থহীন এবং অবোধ্য। আর তাতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হ'তো তাতে তার ফলাফল সম্বন্ধে ভরসা রাখার মত কিছু ছিলো না। ভেবে দেখুন, মার্কোপোলোর ভেনিস্ থেকে পিকিংএ যেতে সাড়ে তিন বছর লেগেছিলো—এ থেকেই পরস্পর সংস্পর্শে আসার নমুনাটা পাওয়া যেতে পারে। মেনে নিলাম, ভারতের কয়েক হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হাজার হাজার বছর আগে চীন দেশে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলেন, তা'তেও অবস্থার বিশেষ কিছু এদিক ওদিক হয় না—এক সেন্টিমেণ্টাল্ আরাম পাওয়া ছাড়া। সংস্পর্শে আসার অসুবিধা সেদিন চীনের পক্ষে মঙ্গলজনকই হ'য়েছিলো—কেননা, বর্বরতার প্লাবন থেকে চীন সভ্যতা নির্বিঘ্নে শান্তি ও নিরাপত্তার এক অভিনব সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি ক'রেছিলো—একমাত্র ভারতের সাথে যার মিল হয়। শান্তি ও নিরাপত্তার

আড়ালে চীনের পক্ষে তখন কয়েকটি আবিষ্কার সম্ভব হয়। বারুদ সৃষ্টি তাদের মধ্যে অন্যতম—এই বারুদ সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া ইউরোপীয় সমাজ কাঠামোর উপর কতটা হয় তার নজীর ইতিহাসে র'য়েছে। কম্পাস আবিষ্কারও চীন সভ্যতার এক উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। সভ্যতার পক্ষে কাগজের মূল্য কত বেশী, সেই কাগজও চীনেরই প্রথম সৃষ্টি।

শান্তি ও আয়াসের মধ্যে গড়ে উঠে দৈনিক জীবন দর্শন অনাবিল শান্তির বাণীতেই ভরা থাকে। কনফুসিয়াস্, লাও-সে সে বাণীর রূপস্রষ্টা। হাজার হাজার বছর ধরে জীবন সংগ্রামের তীব্র তাগিদ হ'তে মুক্ত থেকে চীনের জীবনদর্শন হয়ে উঠেছিলো কতকটা ভাববাদী দর্শন। ভূমির অনুপাতে লোক সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু ইউরোপে জীবন সংগ্রামের তীব্র কঠোরতা যখন বেড়েছে এবং তার ফলে একের পর আর সামাজিক ব্যবস্থা চুরমার হয়ে গেছে—জীবনধারণের জন্য ইউরোপ যখন নতুন নতুন পণ্যের সৃষ্টি ক'রে সমাজ জীবন দ্রুত বদলিয়েছে, চীন তখন নিশ্চিন্তে বসে আধ্যাত্মিক শান্তির পথে তীর্থযাত্রা করেছে। বাইরের সমস্যা তাকে পীড়িত করে নি বলেই তাকে অন্তরাশ্রয়ী হতে হয়। এইদিক দিয়ে ভারতের সাথে চীনের অবস্থার বেশ একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়।

আমরা যখন চীন ও ভারতের নিজস্ব বাণীর ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে থাকি তখন ভুলে যাই যে এটা গৌরবের বা শ্লাঘার কোন বিষয়বস্তু নয়। এক বিশেষ ধরণের ভৌগলিক কাঠামোর এই-ই অনিবার্য ফল। চীনের পাহাড় বা সমুদ্র, ভারতের উদার বিস্তৃতি এবং তার শ্যামল উর্বরতা সংঘর্ষ ও সংগ্রামের পথ থেকে তাদের অনেকটা রক্ষা করেছিলো ব'লেই এই দুই দেশের জীবন দর্শনে স্নিগ্ধ প্রশান্তির আভাস পাওয়া যায়। জওহরলাল 'Glimpses of Worlds History'র এক জায়গায় ব'লেছেন, "There is a great beauty in China, but it is the calm

beauty of the afternoon or evening." সন্ধ্যার প্রশান্ত সৌন্দর্য মনের ওপরে শুধু পূরবীর মূর্চ্ছনাই তোলে—উদাসী মনকে ঘরের পথের সন্ধান দেয়। জীবনসংগ্রামের এগিয়ে চলার সুর সে মাটির রসে পল্লবিত হ'তে পারে না। তাই, ভারত ও চীনের আধ্যাত্মিক অবদানের মধ্য দিয়ে যখন আমরা ঐশ্বরিক আশীর্বাদের সন্ধান পেতে চেষ্টা করি তখন সে মনের পেছনে থাকে অনৈতিহাসিক ভাবপ্রবণতার উত্তাপ। তা দিয়ে পরমার্থিক মূল্য নিরূপণ করা যায় হয়তো, কিন্তু বস্তু-মূল্যের পরিমাপ করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না কখনও।

ভৌগলিক কাঠামো যে বহুলাংশে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করে তার আরও অনেক নজীর আছে। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস্ নদীর মাঝখানের জমিতে মানবসভ্যতার প্রথম স্বর্ণ উষা যে ঝিলিক দিয়েছিল তার কারণও প্রধানত ভৌগলিক। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর তীরে একরকম বার্লি আপনিই জন্মাতো। তাই মধ্য এসিয়া থেকে উৎসারিত যাযাবরের দল ওইখানে এসেই বসবাস করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে মানবসভ্যতার এক স্থায়ী বনিয়াদ এখানে গড়ে উঠে, যা নিয়ে ঐতিহাসিক আজও গর্ববোধ করে থাকেন।

মিশরের ইতিহাসও ওই একই। নীল নদী ছাড়া মিশরীয় সভ্যতা ভাবা যায় না। নদীর তীরই সভ্যতার প্রথম প্রসূতি—হোয়াং হো, গঙ্গা, তাইগ্রিস, নীল তার সাক্ষী।

কিন্তু যে প্রতিবেশের আনুকূল্যে চীন, মিশর, ভারত প্রভৃতি সভ্যতার পত্তন হয় সেই প্রতিবেশই শেষে সৎ মায়ের মত ছেলের বিকাশের পথ প্রতিকূল করে তোলে। যে পাহাড়, নদী আর সমুদ্র চীন সভ্যতাকে গড়ে উঠবার অবকাশ দেয়, তারাই আবার সে অবকাশকে নির্জীব অবকাশে রূপান্তরিত করে। ফলে চীন সভ্যতার

মত অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাও ক্রমে বদ্ধজলার মত দূষিত ও সঙ্কীর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্কীর্ণতার চারপাশেই আমরা অভিনব অভিনব বলে চীৎকার করে গর্বে ও আনন্দে নাচতে থাকি। আসলে সে যে গতিশীল জীবনের এক পশ্চাৎপদ সংস্করণ, মনের উচ্ছ্বাসে সে কথা আমরা আদৌ ভাববার সময় পেলাম না। জাতীয়তার জোয়ার যখন প্রথম আসে তখন তার সাথে কিছু জঞ্জাল ভেসে আসা স্বাভাবিক—পরেও সে জঞ্জালের কিছু অংশ থেকেই যায়। যে জঞ্জাল হুটোপুটি করে তাকে প্রাঞ্জল করার এক নেশা আছে—সে নেশা ছেলেমি নেশা, তার পেছনে বিশুদ্ধ বিপ্লবের তাগিদ নেই—আছে উচ্ছ্বাস, আছে তারল্য।

পাহাড়, সমুদ্র আর নদীর বাঁধনে চীন সভ্যতার বিকৃতি ঘটলো। ভূগোল এক একটা করে সমস্যা ইতিহাসের সামনে এগিয়ে দিয়েছে তারই সমাধানের ভিত্তিতে ইতিহাস চ'লেছে এগিয়ে—নানা রূপ ও নানা রঙে সে বিচিত্র ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সেই কথাই 'An outline of Economic Geographyর এক জায়গায় Horrabin সুন্দরভাবে বলেছেন—"Geographical factors have played a passive part in History by providing the problems which man had to solve". ভৌগলিক গ্রন্থি মোচনের ইতিহাসই ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ, করেছে গতিশীল। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক কিন্তু যেখানে মানুষ হয়েছে শুধু দর্শক আর প্রকৃতির রূপান্তরের মুগ্ধ সমালোচক সেখানে সে হয়েছে নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদী দার্শনিক, হয়েছে অমানবীয় কবি, হয়েছে ভাববাদী শিল্পী। প্রত্যক্ষের দায়মুক্ত জীব ইতিহাসেরই বোঝা ব'য়ে কাটিয়েছে চিরকাল, ইতিহাসকে সে সৃষ্টি করতে পারেনি, তাকে এগিয়ে চলার গতির স্পর্শ দিতে সে অপারগ।

নদী, পাহাড় আর সমুদ্র ডিঙিয়ে আসার ভৌগলিক সমস্যা মীমাংসা করতে না পেরে চীন তার বিরাট চাইনিজ ওয়ালের মধ্যেই শুকিয়ে উঠতে লাগলো—বাইরের আলো আর বাতাস তাকে সজীব করতে পারলো না। সংস্পর্শ আর সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই জীবন বিচিত্র হয়—সেই সংঘর্ষ হারিয়েই বোবা জলের মত চৈনিক জীবন থমকে দাঁড়ালো—সামনে এগোবার পাথেয় পেলো না। এই অনগ্রগতি পরে সুদ শুদ্ধ তার প্রায়শ্চিত্ত আদায় করেছে। পরে সে কথায় আসব।

মিশরীয় সভ্যতাও তার বালু বেলাভূমিতেই নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকলো। মরুভূমির বালু ঠেলে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার সাথে সে মিলতে পারলো না।

ভারতের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই বলা চলে। প্রাচীন গ্রাম্য সমাজকে কেন্দ্র করে কেমন ভাবে ভারতীয় সভ্যতা কেবলই ঘুরপাক খেয়েছে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্ক্সের আলোচনায় সেটা একেবারে জলের মত হয়ে গেছে। সৃষ্টিই জীবনের লক্ষণ, একই পথে ঘুরপাক খাওয়া মৃত্যুরই সামিল। ভারত, মিশর বা চীন সভ্যতার অতুলনীয় অবদানের কথা স্বীকার করেও একথা বলা চলে যে, ভৌগলিক পরিবেশই তাদের সৃষ্টি করেছিলো আবার ভৌগলিক পরিবেশই তাদের মাথায় অচলতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সেই বোঝা নিয়ে শুধু তীর্থযাত্রায়ই যাওয়া চলে, গতিশীল জীবনের পথ তার কাছে রুদ্ধ।

চীন পেছনে পড়ে রইলো, অথচ তারই আবিষ্কৃত বারুদ, কম্পাস আর কয়লা (মার্কোপোলের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে, চীন দেশে একরকম কালো পাথর ব্যবহার করা হয়—ঐতিহাসিকরা ঠিক ক'রেছেন ওটা কয়লা ছাড়া আর কিছু নয়) নিয়ে ইউরোপ গেলো এগিয়ে। এগুলো দিয়ে চীনের ভৌগলিক সমস্যার মীমাংসা চলে না কিন্তু ইউরোপে চলে।

তাই করুণ হ'লেও নির্ম্মমভাবেই ইতিহাসের চাকা একদেশে গেলো এগিয়ে—বদ্ধজলাভূমির কদর্য পাকে জড়িয়ে তার আর একখানা রথ চীনে অচল হয়েই রইলো। পুরোণো কথার রোমন্থন করে চীনের দিন কাটলো। নতুন কথার গতিশীল প্রবাহ তুলে ইউরোপ এলো এগিয়ে। গতির ইতিহাসে এ হেঁয়ালির অভাব নেই। একে শুধু হেঁয়ালী বলেই উপেক্ষা করা মারাত্মক—মানুষের জাত্যাভিমানের সামনে এ এক মস্ত-বড় মীমাংসা। এই মীমাংসাকে যে গ্রহণ করবে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে উঠবে। সমস্ত সংসারের ঊর্ধে এই শিক্ষা মানবজীবনকে সহজ করবে, সুচারু করবে—কৃত্রিমতার মায়াজালে বুদ্ধি আচ্ছন্ন করবে না। যে চৈনিক সম্রাট একসময় ইংলণ্ডের রাজাকে হুকুম করেছিলেন, "Tremblingly obey and show no negligence"—চীনের হৃৎপিণ্ড নিয়ে সেদিন পর্যন্তও যারা টানাটানি করেছেন, বেঁচে থাকলে তিনি তাদের কি উত্তর দিতেন সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বাইরের সংস্পর্শ হারিয়ে চীনা জীবন অনেকটা খর্ব হয়েই রইলো—কিন্তু সংস্পর্শ যখন ঘটলো, তখন সে সংস্পর্শ চীনের মাথায় এক মর্মান্তিক অভিশাপ হয়েই দেখা দিলো—সে ইতিহাসে পরে আসছি। বাস্তব জীবনের সমস্যা কম বলে ব্যাকরণ, শব্দ তত্ত্ব, ভাষা, দর্শন ইত্যাদির দিকেই চীনা সংস্কৃতিবানদের দৃষ্টি পরে। ভাষাকে গুরুগম্ভীর করার কেরামতিতে তাঁরা মাতেন—তাই চল্লিশহাজার character নিয়ে তৈরী Chinese Dictionary যাকে বলা হয় Chinese ভাষায় Kang Hi—ইহা পৃথিবীর এক দুর্বোধ্যবস্তু বলেই গণ্য হয়। ভারতবর্ষেও সংস্কৃতভাষার গুরুভারও এই একই কারণে। পণ্ডিতদের special পাণ্ডিত্যই যেখানে উপজীবিকা, সেখানে শব্দারণ্যের এই গোলকধাঁধাঁ তৈরী না করলে সময়ই বা কাটে কি করে আর সাধারণ লোকের সাথে

ব্যবধানই বা থাকে কি করে! তাই, বেকার জীবনে এই ভাষা সৃষ্টির দিকে মন দেওয়া চানের মনীষীদের পক্ষে, চীনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষনীতে স্বাভাবিক ছিলো। যা স্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক বলে মানাই উচিত। আজকের বিচারে তার মূল্য যাচাই করতে গেলে সেটা অস্বাভাবিক হয়েই উঠবে।

যাক্, এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় চৈনিক জীবন খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো এক বিশেষ ধরণের রূপের মধ্য দিয়ে। একটা বৈশিষ্ট্য চীনের ছিলো—চীনের জীবনধারায় কোন ছেদ পড়েনি। যতই ধীর হোক না কেন এর গতি একটানা। মোঙ্গলরা আকস্মিক উৎপাত সৃষ্টি করেছিলো বটে—কায়েমী হয়েও বসে কিছুদিন তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীনের আবহাওয়া বরদাস্ত করতে না পেরে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। যারা ছিলো তারাও চৈনিক নরনারীর সাথে মিশে যায়। চৈনিক সভ্যতার পীত রং-এ শুধু ফিকে একটু রং এর ছোপ ধরিয়েই তারা মিলিয়ে যায়। তাতে রংএর রূপান্তর বিশেষ কিছুই হয়নি।

চীনা ইতিহাসের এই অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটা মূল সুর জড়িয়ে আছে—সেটা হ'চ্ছে, চীনাজনসাধারণের জীবনপ্রীতি। এই মূল সুরটি যদি আমরা মনে না রাখি তবে চীনা ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রই আমরা হারিয়ে বসবো সে হুঁসিয়ারী আগে থেকেই ক'রে রাখা দরকার।

বস্তুর সংস্পর্শে থেকে জনসাধারণ চিরকালই বস্তুনিষ্ঠ। জীবনকে তারা ভালোবেসেছে—তাই, জীবনের পরিপুষ্টির জন্য ভাববাদী দর্শন থেকেও সে মনের মত জিনিস বেছে নিয়েছে—যা তার জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। সহজ জীবন বিশেষত পারিবারিক জীবনকে উপভোগ করাই চীনা জীবনের মূল লক্ষ্য এবং তারই সাথে সামাজিক সম্পর্কের সামঞ্জস্য তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন

কালে তিনটি দর্শন তার জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। কনফুসিয়ো দর্শন, এটাকে দর্শন না বলে কতকগুলি নীতির বোঝা বলাই ভাল—তাকে শিখিয়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃতিকতাকে এড়িয়ে চ'লতে। অজ্ঞেয়-বাদী কন্‌ফুসিয়াস্ অতি প্রাকৃতিকতাকে অজ্ঞেয় রাজ্য ব'লে দূরে রেখে দিয়েছেন। যা সত্য, যা বিচার সাপেক্ষ তাকেই শ্রদ্ধা ক'রতে শিখিয়েছেন তিনি। তন্ত্র, মন্ত্র, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়বস্তুকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু কন্‌ফুসিয়ো-মতবাদ জনসাধারণকে বেশীদিন সন্তুষ্ট ক'রে রাখতে পারেনি। প্রথমত, কন্‌ফুসিয়ো দর্শন ছিলো শাসকশ্রেণীর দর্শন—"To enable the People to follow, but not to understand"—এই ছিলো তাঁর মতবাদ। উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার প্রভৃতি গুণ কন্‌ফুসীয়ো নীতির অঙ্গ ছিলো। সেই সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহের দিনে জন-সাধারণকে হাতে রাখার জন্য ওই সমস্ত গুণের একান্ত আবশ্যকতা ছিলো। তাই, দেখা যায় কন্‌ফুসীয় নীতি সামন্তশাসকদের ক্ষমতা বজায় রাখার দিক দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাই, কন্‌ফুসীয়ো ধর্ম প্রধানত শাসকশ্রেণীর ধর্ম। দ্বিতীয়ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এক বিশেষ অবস্থায় মানুষের অন্ধ আবেগ ম্যাজিক, তন্ত্র, মন্ত্র, প্রকৃতির রহস্যময় গভীরতার মধ্যে মুক্তি চায়। কৃষ্টির সেই স্তরে মানুষ শুধু বুদ্ধি, বিচার, পরিমার্জিত রুচি এবং শৃঙ্খলার মধ্যে মনের খোরাক পায় না। কন্‌ফুসীয়াস্ মনের সেই আবেগকে তৃপ্ত করতে পারলো না। Taoism মানুষের মনের সেই অভাব মেটালো। তাই; চীনা জনসাধারণ একসময় এই মতবাদের দিকে ঝোঁকে। এক ইন্দ্রিয়াতীত লোকের বাণী নিয়ে এসেও তাওবাদ জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলো—তাই, তাও-বাদও জীবনবাদের স্বাক্ষর রেখে গেছে চীনের মাটিতে।

তারপর, আসে বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য নির্বাণ হলেও, সূক্ষ্ম

ভাবরাজ্যে আনাগোনা থাকলেও, চৈনিক জীবনকে বহুদিক থেকে ঋণী করে গেছে। প্রথমত, তা আসে মানুষের সেবার আহবান নিয়ে। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের এক নিষ্ঠুরতম সময়ে এর অহিংসার বাণী প্রচুর ক্ষয় ও ক্ষতি থেকে সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করে। বৌদ্ধশাস্ত্রের অপূর্ব-কলাকুশলতা, এর ভাষার প্রাঞ্জলতা সাহিত্য ও শিল্পকে বহুল পরিমাণে বিকশিত করে তোলে। শিল্পীর মনে সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়ে বৌদ্ধধর্ম এক অপূর্ব শিল্প সৃষ্টির সহায়তা করে। এসব ছাড়াও চীনা জনসাধারণ বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আরও কতকগুলি অভাব পরিপূরক আহার পায়। বৌদ্ধমঠ নরনারীর অবাধ মিলনের সুবিধা দিয়ে মানবমনের এক সুগুপ্ত আকাঙ্খার খানিকটা তৃপ্তি ঘটাতে সক্ষম হয়। সেই সময়ে চীনে মেয়েদের সমাজে মেলামেশার অবাধ সুযোগ ছিলো না। বৌদ্ধমঠ নরনারী সবার পক্ষেই অবারিত ছিলো। ফলে, মেয়েরা মাসের মধ্যে দু'একবারও অন্তত তাদের অন্তঃপুরের বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্ত প্রকৃতির মাঝে নিজেকে মেলে ধরতে পারতো। পুরুষেরাও এই বৌদ্ধ মঠের মারফৎ নারীর সাহচর্য লাভে নিজের রুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির মুক্তি দিতে পারত। তারপর, বৌদ্ধমঠ সাধারণত পাহাড়ের মাথায় মাথায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগের সুযোগ জুটতো। সর্বশেষে, পরিব্রাজক বৌদ্ধ শ্রমণ গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকের সুখ দুঃখের কথা শুনতো—নিজেদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জনসাধারণকে পরিবেশন ক'রে লোকশিক্ষার অভাব আংশিকভাবেও মিটাতে পারত।

এইভাবে দেখতে পাই প্রাচীন চৈনিক দর্শন ভাববাদের আড়ালেও জনসাধারণের জীবনকে পুষ্ট করেছে। কিন্তু চীনের শাসকশ্রেণী ওই ভাববাদকেই বড় করে তুলে গণজীবনের এই পুষ্টির পথে প্রাচীর তুলতে চেয়েছে। তাই, এই সমস্ত ভাবধারাকে জীবনের পথে টেনে নিয়ে

না এসে আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়াটে পথেই নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে—যাতে তার শোষণ ও শাসন সেই ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে। এই জীবন-প্রীতি, এই বস্তুনিষ্ঠতা, সমাজ ও সংসারের ওপর এই আকর্ষণই চীনা জনসাধারণের বিপ্লবী ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্য চিরদিনের মত আজও সে কঠোর সংগ্রামে রত। কিন্তু, এই ঐতিহ্যের শত্রুদলও তার ঐতিহ্য ভোলে নাই। তাই, তলোয়ার আর বন্দুকের জায়গায়, কামান আর মেশিনগান নিয়ে আজও সে বিপ্লবী চীনা জন-সাধারণের সে ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন ক'রবার জন্য উদ্যত হয়ে আছে। জয়-পরাজয়ের চরম মীমাংসার সময় এসে গেছে।

এরপর আসে চীনের সমাজ-ব্যবস্থার কথা। আদিম সামন্ততান্ত্রিক প্রথা (যাতে কৃষক জমির সাথে সংযুক্ত থেকে ভূঁইদাসে পরিণত হয়) অনেকদিন আগে শেষ হয়ে গেছে—কিন্তু, সামন্ততান্ত্রিক প্রথা তখনও পূরাদস্তুর বজায় ছিলো—কেননা, জমি যতদিন পর্যন্ত ক্ষমতার প্রধান উৎস ততদিন এ ব্যবস্থার শেষ নেই। ভারতের মতই চীনও ছোট ছোট গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই এক বিচিত্র সমাজরূপ সৃষ্টি করে। একমাত্র সেচকার্যের জন্যই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অভাব লোকে বোধ করতো। এই সেচকার্যই ছিলো অসংখ্য পরস্পর-বিচ্ছিন্ন গ্রাম্য সমাজের যোগসূত্র। আমাদেরই মত চীনের বাড়ীতে বাড়ীতে চরকা ঘুরতো—বাড়ীতেই কাপড় তৈরী হ'তো—কেননা, কেনবার ক্ষমতা তার কই? জলই ছিলো জমির মূল্যের পরিমাপ। এই পরিমাপের ওপর কর্তৃত্ব করেই আমলাতন্ত্র তার কায়েমী স্বার্থ গড়ে তোলে। ভালো জমির সুবিধাভোগী জমিদার আর এই কায়েমী স্বার্থসর্বস্ব আমলাতন্ত্রের গাঁটে গাঁটে গিঁট পড়ে চীন বহু প্রাচীনকাল থেকেই এক ভয়াবহ শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়। এই শোষণের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ

কখনও ধূমায়িত হয়ে উঠতো—কখনও বা বন্য হিংস্রতায় চৌচির হয়ে ফেটে পড়তো। মোট কথা, এই দুঃসহ শোষণ ও জুলুমকে চীনাজনসাধারণ মুখ বুঁজে সহ্য করে নাই।

গবর্ণমেণ্টের কাজ ছিলো প্রধানত জলের উপর কর্তৃত্ব করা এবং তা থেকে শুল্ক আদায় করা। এই জলকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা, এটা চীনেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—কার্ল মার্কস্ লিখেছেন—প্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্রই এমন,জলকেন্দ্রিক ছিলো। পয়ঃপ্রণালীই ছিলো রাষ্ট্রীয় যোগসূত্রের প্রধান অবলম্বন। চীনা সরকারের কাজ ছিলো প্রাদেশিক সরকারের ওপর কর্তৃত্ব করা এবং নিয়মিতভাবে ট্যাক্স আসছে কিনা সেটা দেখা।

চীন রাষ্ট্র আঠারোটা প্রদেশে বিভক্ত ছিলো—অনেকগুলি জেলা ছিলো প্রদেশের অধীন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সব ব্যাপারেই হর্তা-কর্তা। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-গোলযোগ বন্ধ করার জন্য Pao-chia নামে এক অভিনব প্রথা চীনা সরকার সৃষ্টি করেন। একশোটি পরিবার নিয়ে একটি করে chia. এই chiaর প্রতিটি লোকের দুষ্কৃতির জন্য chiaর সবাই সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকতো। শোষিতের অভ্যুত্থান বন্ধ করার জন্য দেশে-দেশে, যুগে-যুগে শাসকশ্রেণী কত অভিনব ব্যবস্থাই গড়ে তুলেছেন, কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব বন্ধ হয়েছে কিনা ইতিহাসই তার সাক্ষী।

চৈনিক-ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীকে লোকে বলতে Yamen. সেই বাড়ী সম্বন্ধে চীনে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। "While Ye live enter not a Yamen: When Ye die descend not into hell."

অনেকগুলি বংশ একে একে চীনে রাজত্ব করে—সংক্ষেপে তাদের সম্বন্ধে একটু আভাস দেব। Chou দের সময়েই চীন প্রথম এক সুগঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তারপর, চিন্ (এদেরই নাম অনুযায়ী

চীনের নামান্তর হয়), সিং, হীন্, টাং প্রভৃতি বংশ একে একে রাজত্ব করে। এদের সময় চীনে শিল্পকলার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে—এমন কি, শোনা যায়, শিল্পের দিক দিয়ে চীন রেণেসাঁসের ইটালীকেও ছাড়িয়ে যায়। চীনের শ্রেষ্ঠত্ব তখন ইউরোপের অনেক ওপরে। রোম সাম্রাজ্যের চেয়েও চীনসাম্রাজ্যের সীমানা বড় ছিলো। কাপড়, ছাপাখানা, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, রেশম শিল্প সবদিক দিয়েই চীন অগ্রদূত। চা আর লিচু কথাটা চীনা ভাষা থেকে নেওয়া—এ থেকে বোঝা যায়, ও দুটো জিনিসের আবাদও চীনই প্রথম করে।

কৃষি ব্যবস্থায় যতটুকু উন্নতি সম্ভব, চীন তার সবটুকু গৌরবই প্রায় দাবী করতে পারে। কিন্তু যন্ত্রের দুর্জয় শক্তি যেদিন থেকে শক্তির সাধনায় প্রথম স্থান অধিকার স্থান করলো সেদিন থেকে চীনের স্থান নীচুতে নেমে গেলো। অভ্যস্ত গরিমার বাঁধা বুকনিই সেদিন থেকে তার একমাত্র সম্পদ হয়ে রইলো। যেদিন তার ঝাপসা দৃষ্টিতে নতুন প্রভাতের আলো এসে ঠিকরে পড়লো, সেদিন সে সাম্রাজ্যবাদের কারায় বন্দী। সেদিন থেকে বহুদিন পর্যন্ত সে পরের মুখের প্রলাপ হয়েই রইলো। পৃথিবী শুনলো এবং তারা নিজেরাও শুনলো, বেণীওয়ালা চীনারা আফিংএর নেশায় বসে বসে ধোঁকে—তেলাপোকা খেয়েই তাদের দিন কাটে। স্বাধীনতার প্রতি তাদের মোটেই আস্থা নেই। আমাদের মতই পরের খবরদারীতে বাস করতে ভালোবাসে।

ষোড়শ শতাব্দীর ocean-going steamship আবিষ্কারই চীনের পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে উঠলো। এক একটা জিনিস আবিষ্কার হ'য়েছে আর তার প্রতিধ্বনি যে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে তার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বারুদ আবিষ্কার হ'লো, সেই বারুদের শক্তিতে শক্তিমান্ মোঙ্গোল জাত প্লাবনের মত সারা ইউরোপ, এসিয়া ভাসিয়ে নিয়ে

গেলো—ইউরোপীয় সভ্যতার রূপান্তর হয়ে গেলো কিছুদিনের জন্যে। সেই বারুদের আঘাতের সামনে সামন্ততন্ত্র ভেঙে পড়লো।

তেমনি, ocean-going steamship আবিষ্কারেও রাষ্ট্রশক্তির ভারসাম্যের তারতম্য হলো। এর আগে সামুদ্রিক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছে স্পেন, পর্তুগাল। আমেরিকার সোনা মুঠো মুঠো লুটে, সাত সাগরের পার থেকে তারা তাদের দুঃসাহসী আবিষ্কারের পুরস্কার লুফে নিয়ে এসে বিজয় গর্বে মেতে উঠলো। পূর্ব গোলার্ধ এবং পশ্চিম গোলার্ধ স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে বেঁটে দিয়ে পোপ বিজয়ীর সম্মান রাখলেন—ক্ষমতাশালী শ্রেণীর জন্য যুগে যুগে যে স্বাক্ষর তিনি চিরদিনই রেখে গেছেন।

ফলে, ইংলণ্ড আর হল্যাণ্ড হলো প্রোটেষ্টাণ্ট। নতুন steamship আবিষ্কার হবার পর তারা স্পেন, পর্তুগালের সে ক্ষমতা স্বীকার করতে নারাজ হলো—তাই, পোপের এই অবিচারকে তারা মানতে রাজী হ'লো না। প্রোটেষ্টান্ইজ্‌ম্-এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এই।

যাক্, steamship আবিষ্কারের ফলে যে শোচনীয়ভাবে গোলামির পথ খুলে গেলো—তার উদাহরণ চীন, ভারতবর্ষ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অসংখ্য দ্বীপ। বিদেশী বণিকের হামলায় অর্ধ-মুদ্রিত-নয়ন দার্শনিক চীন-ভারতবর্ষের জীবনদর্শনে আঘাত পড়লো। হুঁস হবার আগেই দেখা গেলো দার্শনিকের গলায় লোহার শিকল এঁটে বসেছে।

অবশ্য, এই শিকল পড়াবার কাজে পাশ্চাত্যের শক্তিপুঞ্জ চীনা শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছে—এই শিকল ভাঙ্গার শক্তি চীনা জনসাধারণের ছিলো, কিন্তু সে শক্তিকে পঙ্গু করে রাখাই ছিলো শাসকশ্রেণীর কাজ। তবু, গণশক্তির হাতিয়ার সেই শিকলের ওপর আঘাতের কার্পণ্য রাখে নি এবং এই আঘাতেই চীনের দাসত্ব-শৃঙ্খলকে

দুর্বল করে তুলেছে—যার পরিচয় আমরা প্রতিরোধী গেরিলা, অষ্টম রুট আর্মি, নিউ ফোর্থ আর্মি, চীনা জনসাধারণের অদ্ভুত বীরত্বের মধ্যে পেতে পারি। সে বর্ণনায় পরে আসছি। কিন্তু, প্রাচ্যের এই পথ তৈরী করবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় বণিকদের জোট পাকিয়ে বহুদিন ধরে আর এক কাজ করতে হয়েছে। ইতিহাসে সেটা Crusade নামে বিখ্যাত।

বহুদিন থেকে প্রাচ্যের চাবিকাঠি ছিলো তুরস্কের হাতে। মিশর ছিলো প্রাচ্যের দ্বাররক্ষী। মিশর অধিকারে থাকায় তুরস্কের হাতে প্রাচ্যের প্রবেশ পথের চাবি থাকে। অথচ, ইউরোপের কাছে প্রাচ্যের মূল্য ভয়ানক। মাংসের জন্যে যে মসলা দরকার সে মসলা আসতো প্রাচ্য থেকে। সোনার ওজনে সে সময় মসলা বিকোতো এমন প্রবাদ আছে—কেননা, মাংসই হ'লো ইউরোপের প্রাণ আর সেই মসলা ছাড়া মাংস-সংরক্ষণ সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রাচ্যের বাজারও লোভনীয়—রাজা-বাদশার দেশ, হীরা-জহরৎ, মণি-মাণিক্যের দেশ, ইউরোপীয় বণিকের সমষ্টিগত স্বার্থ, প্রাচ্যের এই চাবিকাঠি কেড়ে নেবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠলো। প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টানদের পুণ্যভূমি বিধর্মী তুর্কীদের হাত থেকে উদ্ধার করবার ওজর তুলে পোপ ধর্মবিশ্বাসী খ্রীষ্টানদের আহ্বান করলেন। নিষ্ঠাবান বিশিষ্ট খ্রীষ্টানরা সে আহ্বান অগ্রাহ্য করেন সাধ্য কি? বিশেষত যখন বলা হলো পুণ্যভূমি উদ্ধার করবার জন্য যে প্রাণ দেবে তার সশরীরে স্বর্গবাস। আরও একটি কারণে খ্রীষ্টানদের মধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। এর আগে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, পৃথিবী এক মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন। তার ফলে দলে দলে লোক তাদের যথাসর্বস্ব বেচে দিয়ে খ্রীষ্টানদের পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে—উদ্দেশ্য, শেষ দিন যখন আসছেই

তখন তীর্থ-ক্ষেত্রেই যেন সে শেষদিনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দলে দলে লোক প্যালেষ্টাইন্ মুখো চলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু, পথে দস্যু-তস্করের আক্রমণে, অনাহার-অনশনে, ব্যাধিতে বহুলোক মারা যায়। এসব অভিযোগ তুরস্কের মাথায় চাপিয়ে তুরস্ককে আক্রমণ করার এক প্রত্যক্ষ কারণ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এর আসল কারণ যা তাতো বলেইছি—সোনার চাবিকাঠি ছিনিয়ে নেওয়া।

কয়েক শো বছর ধ'রে এ লড়াই চলে। ইউরোপের বহুলোক সে লড়াইএ প্রাণ হারায়। পোপের আশ্বাসিত স্বর্গরাজ্যের সন্ধান তারা পেয়েছে কিনা তা' জানিনা, কিন্তু স্বর্গরাজ্যের সন্ধান যে ইউরোপীয় বণিককুল পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই কোন। চীন সেই স্বর্গরাজ্যের একাংশ।

এতটা লেখার উদ্দেশ্য চীনের দুর্ভাগ্যের পটভূমিকা তৈরী করা। এই পটভূমিকায় চীনের ইতিহাস পড়লে তাকে বোঝা হবে।

একজন ইংরেজ লেখক লিখেছেন—"1st the missionary, then the gunboat, then the land grabbing—this is the procession of events in Chineasemind".

বাইরের স্পর্শ পেয়ে চীন যখন জাগলো তখন দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে খ্রীষ্টান পাদরী তাকে মুক্তির বাণী শোনাচ্ছে—তার পেছনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ টমি বন্দুক বাগিয়ে ধরে মুচকি হেসে সেই পথ গ্রহণ না করার পরিণতির ইঙ্গিত দিচ্ছে; আর এরা যে পথ দিয়ে এগিয়ে গেলো সেই পথের প্রান্তে পাহারাদার রইলো জেগে—সে চীনা জনসাধারণকে বললো, খবরদার এ পথে হেঁটো না, এপথ আর তোমার নয়। এমনি ক'রে দুরন্ত ঝড়ের দাপটে গোবি মরুভূমির বালু যেমন অন্য দেশের মাটির বুকে গিয়ে

জুড়ে বসে, সাম্রাজ্যবাদের ঝড়ের মুখে তেমনি বণিক আর সৈনিকের পায়ের ধুলোয় ভারী হয়ে উঠলো চীনের মাটি।

স্বদেশে প্রবাসী হবার মত অবস্থা হলো চীনাদের। প্রথমে বসার জায়গা পরে শোবার জায়গা এই হলো নীতি। বণিকেরা সে নীতি ভালো করেই পালন করলো। একে একে চীনের স্নায়ুকেন্দ্র বড় বড় বন্দরগুলো বিদেশী গান্‌বোটের দাপটে হাতছাড়া হয়ে গেলো। কখনও আফিং খাওয়াবার মত্ততায়, কখনও মিশনারী হত্যার অজুহাত তুলে চীনের গা থেকে বড় বড় টুক্‌রো ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

আফিংএর যুদ্ধেই প্রমাণ হয়ে গেলো শোষণের লোভে মানুষ কত বড় পশু হতে পারে। ডাচরা প্রথমে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব উপদ্বীপে তামাকের সাথে আফিং মিশিয়ে ধূমপান করার প্রথা প্রচলিত করে। দেখতে দেখতে এটা অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে যায়। অবশ্য ছড়াবার প্রধান যন্ত্রই হচ্ছে ব্যবসায়ীরা—যারা মরার পাহাড়ের উপর সৌধ রচনা করতে পারে। এইভাবে চীনেও রীতিমত আফিংএর ব্যবসা চলতে আরম্ভ করে। এতদিনের মনুষ্যত্ব খুইয়ে দিন দিন অমানুষ হয়ে যাওয়া আর একদিকে মুনাফার স্ফীতিতে হিমালয়কেও ছাড়িয়ে যাওয়া। মরা আর বাঁচার এই প্রতিযোগিতায় যখন মুমূর্ষুর চেতনা ফিরে এলো তখন দেখা গেলো বজ্রবেষ্টনীতে শত্রু তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। আফিং খাওয়ায় আপত্তি করা চলবে না। জোর করে অমানুষ বনতেই হবে নইলে বণিকের মণিমাণিক্যের জৌলুষ খোলে না। সোনার পাহাড় তৈরীর প্রতিযোগিতায় বণিক যে পেছনে পড়ে থাকে। কিন্তু, এই ভদ্রবেষ্টনীকে অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা তাসত্ত্বেও যখন চীনের দেখা দিলো তখন সমস্ত শক্তি দিয়েই তার প্রতিকার করা হ'লো। গোপনে আফিং আমদানি বন্ধ করার জন্য যখন চীনা গবর্ণমেণ্ট কমিশনার নিযুক্ত করলেন

তখন পাহারাদার গান্‌বোট সে কথার উত্তর দিলো। ফলে, চীনের ভাগ্যে হলো বাড়তি লোকসান, আর বণিকরা বাড়তি লাভের আনন্দে আত্মহারা হয়ে আরও রক্তলোলুপ হ'য়ে উঠলো। এইভাবে হংকংএর মত বন্দর হাত ছাড়া হয়ে গেলো। হংকংএ ব্রিটিশবাহিনী জাপানী বোমার আঘাতে যখন দিশেহারা হয়ে ওঠে তখন তারা একবারও মনে করেছিলো কিনা জানিনা, ওই হংকংএই তাদের পূর্বপুরুষ আর এক দুর্বল শক্তির মাথার খুলি কামানের গোলায় চূর্ণ করেছে। ইতিহাসকে ফাঁকি দেয় সাধ্য কার!

এই আফিংএর যুদ্ধ চীনের ইতিহাসে একটা যুগান্তরকারী ঘটনা—কেননা, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ভিত্তি পাকাপাকিভাবে এই যুদ্ধের ফলেই গড়ে ওঠে। ১৮৩২ সালের 'Reform Bill' Parliamentএ পাশ হবার ফলে Chinese Tradeএর একচ্ছত্র অধিকার East India Companyর হাত থেকে চলে যায়। ফলে, চীনের লোভনীয় বাজারে মুনাফালোভীর ভীড় লেগে যায়। বেআইনী আফিংএর ব্যবসা কেঁপে উঠতে থাকে। সবাই প্রায় চীনা Customকে ফাঁকি দিয়ে আফিং আমদানি করে চীনের মাটিতে। এই বেআইনী কারবার বন্ধ করার জন্য চীনা সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৪০ সালে এই অবৈধ কারবার নিয়ে যখন চীন সরকারের সাথে গণ্ডগোল বেঁধে ওঠে তখন সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি (১৮১৯ সালেই এই ঘাঁটিটি ব্রিটিশের হাতে আসে) থেকে রণোদ্যত সশস্ত্র ব্রিটিশ জাহাজ ক্যাণ্টন্‌ বন্দরে গিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। অথর্ব মাঞ্চু সম্রাট্‌ নানকিং চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়—ফলে, সাংহাই বন্দর বিদেশী বণিকের কাছে উন্মুক্ত হয়—বিদেশী পণ্যের ওপর শুল্ক যথেচ্ছভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়—বিভিন্নরকম ক্ষতিপূরণ আদায় ক'রে নেবার ব্যবস্থা থাকে। তাছাড়াও, আর একটা বিশেষ

চুক্তির ফলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ চীনাবন্দরে থাকবার সুবিধা পায় এবং বাড়ী ঘর দোর তৈরী করার জন্য ব্রিটিশ পক্ষ বেশ কিছুটা জমি আদায় করে নেয়। এর সাথে আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও অনুরূপ সুবিধা পেয়ে যায়। মোট কথা, ছুঁচের ভেতর দিয়ে হাতি গলাবার সমস্ত ব্যবস্থাই এতে থাকে। নানকিং চুক্তি চীনের ইতিহাসে একটি কলঙ্ক-মলিন অধ্যায়। জাতীয় অবসান, জাতীয় অধঃপতন, ক্ষয় ক্ষতি ধ্বংস এই চুক্তির ধারা বেয়ে ধীরে ধীরে চীনের হলুদ মৃত্তিকায় নেমে আসে। আগামী বহুদিনের ইতিহাস চীনের পক্ষে ঘোরতম লজ্জা ও বেদনার।

নানকিং চুক্তিতে কিন্তু বেআইনী আফিং ব্যবসাকে আইনসঙ্গত করা হয় নি। ব্রিটিশ কূটনীতির ধূর্তামি সে অভাব পূরণ করলো। Extra Territorial Right নামে এক অপূর্ব অধিকার তারা বিদেশীদের জন্যে আবিষ্কার করলেন। এই আইনের বলে, চীনা আইনের আমল থেকে বিদেশী স্বার্থবহরা বাদ পড়লেন। অর্থাৎ, এটা হ'লো অবৈধ আফিং ব্যবসায়ের পরিপূরক। আফিং ব্যবসাকে ফাঁকি দিলে আর চীনা আইনের আমলে পড়বার ভয় থাকলো না। সোনার পাহাড় তৈরী করবার পথ পরিষ্কার হলো।

আফিংএর মতই আর একটা অবৈধ কারবার পাশাপাশি সুরু হ'লো—সেটা মানুষের মাংস নিয়ে কারবার। পশ্চিমে দাস ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় একদল বেকার ব্যবসায়ী চীনের অরাজক মাটিতে হানা দিলো। তারা চীন থেকে ভুলিয়ে, জোর ক'রে, চুরি ক'রে জাহাজ-জাহাজ লোককে পশ্চিমে চালান দিতে থাকে। ১৮৫২ সালে আময়ে এর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হয়—এই অছিলায় ব্রিটিশ সৈন্য সেখানে নামে এবং এই অভিযোগে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা এরা আদায় করে নেন।

চীনের দুর্ভাগ্য সৃষ্টির ইতিহাসে বিদেশী মিশনারীর দানও কম নয়।

চীনের মাটিতে মিশনারীদের অপকীর্তি দেখে আজও যাঁরা মিশনারীদের অকপটতায় বিশ্বাস রাখেন তাঁদের ওপর মায়া হয়। বিদেশী মিশনারীদের সম্বন্ধে Edgar Snow 'Red Star Over China'য় সুন্দর একটা মন্তব্য করেছেন : "General Fang was in any case in bad repute among most of the foreign missionaries, so he could not have been a really bad fellow !--অর্থাৎ, অধিকাংশ মিশনারীদের মধ্যেই জেনারেল ফ্যাঙ্গএর বদনাম ছিলো—সেইজন্যে, সে নিশ্চয়ই খারাপ লোক হতে পারে না। এই একটা মন্তব্যের মধ্যেই মিশনারীদের স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

চীনের স্বার্থের বিরুদ্ধে এই বিদেশী মিশনারীরা অনবরত কাজ করে গেছেন। চীনে মিশনারী হত্যার রহস্য এইখানেই। আবার, এই মিশনারী হত্যার ওজর তুলেই লুণ্ঠনকারী বণিক নতুন নতুন লোভনীয় জায়গা পকেটস্থ করেছে। মিশনারীদের এই কীর্তি শুধু চীনে নয়—ভারত প্রভৃতি পরাধীন দেশে এই অভিনয়ই তারা করে এসেছে। তাই, মিশনারীদের জন্যে রাজভাণ্ডার থেকে মুক্তহস্তে মুদ্রা খরচ করা হয়। মিশনারীদের প্রাণ এতই দুর্মূল্য হয়ে ওঠে যে নতুন নতুন জায়গা জুড়ে (সাম্রাজ্যের সাথে) তার ক্ষতিপূরণ করা হয়। ব্যাপারটা ঠিক যেন এইরকম—একজনকে মারতে গেলে, সে প্রতিরোধ করতে চাইলে তার নাকটা কেটে নেওয়া। নাক কাটতে কাটতে শেষ পর্যন্ত নাকের গোড়ায় গিয়েই প্রায় পৌঁছোছিলো আঘাত।

সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ সর্বপ্রথম মূর্ত হয় তাইপিং বিদ্রোহের মধ্যে। যদিও ১৭৯০ সালে White Lotus Sect নামে এক সম্প্রদায়, রাশিয়ার Decembristদের মত এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে (Opium Warএর কথা বাদই

দিলাম—কেননা, এটা দুর্বল চীনা সরকারের সাথে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে চীনা গণশক্তির অংশ নেবার কোন সুযোগ শাসককুল রাখে নি); কিন্তু, ব্যাপকতায়, কার্যকারিতায়, লক্ষ্যে এবং আদর্শে সে বিদ্রোহ তাইপিং বিদ্রোহের কাছে নগণ্য। তাইপিং বিদ্রোহের নেতা Hung Hsiuch'uan, একজন খ্রীষ্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী চীনাযুবক, সরকারী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে দরিদ্র কৃষক জনসাধারণের মধ্যে নিজ নীতির প্রচার করতে থাকেন। তার নীতির মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্মমতই শুধু স্থান পায় নি—গণ অর্থনৈতিক দাবীও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে, দলে দলে জনসাধারণ তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। অনেকে এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন—বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ এটাকে নিছক ঘরোয়া বিবাদ মনে করে প্রথমটায় ঔদাসীন্য দেখিয়ে আসতে চেয়েছেন। কিন্তু বেআইনী আফিংএর ব্যবসা বন্ধ করার দাবীও বিদ্রোহীদের কার্যতালিকায় স্থান পেতে দেখে সর্বপ্রথম তাঁদের নেশা কাটে। কিন্তু ততদিনে বিদ্রোহীরা চীনের আঠারোটা প্রদেশের প্রত্যেকটিতেই নিজেদের ঘাঁটি গেড়েছে। এদের দখলীভূত এলাকায় এরা জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ করে। জমি চাষীদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। মেয়েদের পা-বেঁধে রাখার যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়। শিশু-দাসত্ব এবং বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করে। মেয়েদের একটা সৈন্যদল গড়ে তোলে—স্ত্রী-পুরুষের সমান-অধিকারবাদ প্রতিষ্ঠা করে। আদালতের নির্যাতন এবং গলদ রহিত করে। দুর্ভিক্ষের জন্য একটা সাধারণ শস্যাগার প্রতিষ্ঠা করে। বিদেশীদের ওপর তারা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো—বিশেষত বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি এদের ঔৎসুক্য দেখা যায়। বাইবেলের চীনা সংস্করণও এরা প্রকাশ করে। এদের কার্যতালিকা দেখে এটা স্পষ্টই দেখা যায় যে সেটা ধর্মগত নৈতিকতা

এবং আচার-বিচারের গণ্ডী পেরিয়েও বিপ্লবের পথে বহুদূর এগোতে পেরেছে। চীনা জনসাধারণের জমির ক্ষুধা আন্দাজ করতে পারলে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না, কেন কোটি কোটি লোক এর পেছনে জমায়েৎ হয়েছিলো। অন্তত একজন বিদেশী, অজানা ব্রিটিশ জাহাজের একজন mate, তাইপিংদের সদিচ্ছায় নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে গিয়ে একখানা বই প্রকাশ করেন—বইটার নাম History of the Ti-ping Revolution, By Anonymous, London, 1866.

তাইপিংরা প্রায় চোদ্দ বছর চীনের বহুস্থানে (নান্‌কিংএর মতো বড় বড় সহরও এদের হাতে আসে) নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে। এদের শাসনকালে বিদেশীদের সাথে কোন রকম অসম-চুক্তি এরা করেনি—এ থেকেই বোঝা যাবে এদের গণভিত্তি কত সুদৃঢ় ছিলো এবং এরই অভাবে শুধু চীন সরকারকে অত অসমান এবং অসম্মানজনক চুক্তির আঘাত সহ্য করতে হয়। তাইপিং বিদ্রোহ বিদেশীদের বিরুদ্ধে চীনা কৃষকের প্রথম সংঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়া—তার প্রমাণ নানকিং চুক্তির পরই ঠিক এটা ঘটে। সন্ত্রস্ত চীনা সামন্ত-জমিদার এবং তারই সাথে ততোধিক বিধ্বস্ত মাঞ্চু সম্রাট শেষ পর্যন্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। এই সর্বপ্রথম—যখন চীনা সরকার নিজ শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার আবেদন জানায়। এর পর থেকে প্রতি সঙ্কটের সময় চীন-সরকার গণশক্তির কাছে আবেদন না জানিয়ে বাইরের শত্রুর কাছেই আত্মরক্ষার নিবেদন জানিয়েছে। এতে আত্মরক্ষা তার হয়নি বরং চীনা সরকারের এই দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে বিদেশী বণিক একের পর এক দাবী আদায় করে নিয়েছে। চীনের ইতিহাসের এই দুর্বলতার স্থান সম্বন্ধে সচেতন থাকলে চীনের প্রতিটি জটিলতাপূর্ণ

ঘটনা বোঝার পক্ষে অনেক সহজ হবে। জাপবিরোধী প্রতিরোধের সাম্প্রতিক সঙ্কটও ঐ আলোকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। পরে এসম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

অসমান চুক্তি এবং অবৈধ আফিংএর কারবার সাম্রাজ্যবাদী অক্টোপাসের রক্ত-শোষণের ছুটি প্রধান বাহু। তাইপিংদের বিদ্রোহের আঘাত যখন তারও ওপর গিয়ে পড়লো তখন তাদের মাথায় টনক নড়ে। গর্ডনের অধীনে "Gordon's Ever Victorious Army নামে একটা সেনাদল তৈরী হলো। সম্রাটের সহযোগিতায় ক্রমে তাই-পিংদের ধ্বংস করা হয়। কিন্তু তাদের ঐতিহ্য ধ্বংস করা যায় নি—কেননা ঐতিহ্য অমর। তার স্থান মানুষের বুকে। সেই অদৃশ্যস্থান থেকেই যে আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে বহুদিন পর্যন্ত চীনা জনসাধারণ তা থেকে পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রায় চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তাইপিংদের ক্ষমতা অবাধ ছিলো। তারপরেও মানুষের স্মৃতিতে তারা বেঁচে ছিলো। এমনকি ১৮৯৮ সালেও একজন তাইপিং বিদ্রোহীর ভাই ক্যাণ্টনে এক অভ্যুত্থান ঘটাতে সমর্থ হয়। সানইয়াৎসেনের আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও কেউ কেউ তাইপিং ছিলেন। পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনে তাইপিং বিদ্রোহের প্রভাব বড় কম পড়েনি।

সাম্রাজ্যবাদী পৈশাচিকতার সবচেয়ে বড়ো জ্বলন্ত স্বাক্ষর রয়ে গেছে পিকিংএর মহামূল্য Imperial Summer Palace ধ্বংসের ভেতর। সাহিত্য ও কলার মহামূল্য সম্পদে ভর্তি ছিলো এই প্রাসাদ। রক্তের কণিকায় যাদের ধ্বংসের বিষ মেশানো রয়েছে, তারা সৃষ্টির মর্ম বুঝবে কোত্থেকে? সভ্যতার জারজ সন্তান সাম্রাজ্যবাদ পৈতৃক সুকৃতির মর্ম বোঝে নি—আপন সৃষ্টির বিকৃতিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজ জন্মদাতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন দেশে দেশে অভিশাপ ও আক্ষেপের মর্মদাহ

কুড়িয়ে বেড়িয়েছে সে। তাই, যেখানেই সে গিয়েছে সেখানেই সে তার মর্মান্তিক পরিচয় রেখে গেছে। লুণ্ঠন, শোষণ, শাসন ও ধ্বংস—তার বিষাক্ত নীলরক্তের এই বাণীই সে বয়েছে চিরকাল।

অপদার্থ মাঞ্চু সম্রাট চীনের মাথায় বেণীর বোঝা চাপিয়েই (চীনাদের দীর্ঘবেণীর প্রচলন এই মাঞ্চু আমলেই হয়) খালাস। সাম্রাজ্যবাদী অনাচার ও অপচয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি কোথা থেকে পাবেন তিনি ? আফিংএর ঝিমুনিতে আর পোলাও-কালিয়ার খোশবুতেই তাঁর দিন উজার। আফিংএর নেশায় আত্মহারা হয়ে ভাবতেই পারেন নি তিনি যে দুনিয়া আরও অনেকটা এগিয়েছে। বিদেশীদের মতলব বুঝবার মত চৈতন্য যখন তাঁর হলো তখন আরও একটা চৈতন্য তাঁর হয়েছিলো—তিনি বুঝলেন, চীনের সিংহাসনে বসে বাদশাহী চালই তাঁর পোষায়—বিদেশী কামানকে নীরব করা সে বাদশাহীর সাধ্যাতীত। বিদেশী বণিকরাও বুঝলো, একে দিয়ে তাদের কাজ বেশ হাঁসিল হবে—কিন্তু বুঝতে চাইলো না আর এক দল—তারা চীনের মাটিরই ছেলে।

তাইপিং বিদ্রোহের পর থেকে মাঞ্চু সম্রাটের পুরোপুরি বিদেশী বণিকদের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকলো না। এর আগে চীনের বিখ্যাত বন্দরগুলো একে একে বিদেশীদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়েছে—শুল্কের হার অসম্ভব রকম কমে গেছে। ভয়াবহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মাথায় চাপানো। তারপর চীনের মাটীতেই বিদেশী আইনের রাজত্ব সুরু হয়েছে—বেআইনী কারবারে কোনরকম খবরদারী চলবে না। তারপর, একটার পর একটা অছিলায় বিদেশী বণিকরা সবাই মিলে নিজেদের সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছে। চীন যেন এক অসহায় শিকার—জীবন্ত শরীর থেকে খাবলা খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিলেও প্রতিবাদ জানাবার উপায় নেই—প্রতিবাদ জানাতে গেলেও সেটা

একটা অছিলা সৃষ্টি করে—যাতে শরীরের আরও খানিকটা মাংস বিলিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু, অপোগণ্ড মাঞ্চু সম্রাট এই করুণ এবং অসহায় অবস্থার মধ্যে যারা সত্যি সত্যিই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে পারত তাদের সে চেষ্টার সুযোগ দিলেন না। বরং চীনের অবস্থা আরও করুণ, আরও শোচনীয় করে তুললেন। তাইপিং বিদ্রোহ দমন করবার জন্য তিনি বেপরোয়াভাবে সমগ্র সামুদ্রিক শুল্ক বিদেশী বণিকদের হাতে তুলে দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। চীনের দুরবস্থার ইতিহাসে আর এক অধ্যায় সংযুক্ত হলো।

চীনের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। বাইরের আয়ের পথ বন্ধ হওয়ায় ভিতরের আয়ের দিকে নজর দিতে হলো। ফলে, দরিদ্র জনসাধারণের ওপর কর ও খাজনার বোঝা পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলো। জনসাধারণের অবস্থা কি মর্মান্তিক হয়েছিলো তা একটা মাত্র খবর থেকেই বোঝা যাবে: ১৮৭৭-৭৮ সালের শীতে একমাত্র শেনসী প্রদেশেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা যায়।

কৃষিজীবী চীন, তার জীবনমরণের কাঠি প্রধানত সেচব্যবস্থা, সেই সেচব্যবস্থাও অর্থের অভাবে বালচাল হয়ে গেলো। চীনের এই নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয় এবং জাতীয় অবমাননার ফলে জমিদার-সামন্ত চটলো। একচেটিয়া বিদেশী কারবার থেকে বঞ্চিত দেশী বণিক রুষ্ট হলো—বিদেশীদের সাথে অসম এবং অবৈধ প্রতিযোগিতায় সে পরাজিত। সিভিল সার্ভিসে বেকার-সমস্যা সুরু হওয়ায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দল দ্বিধাবিভক্ত। আর, দেশব্যাপী এই অসন্তোষের আগুনের ফুল্‌কি যে শুক্‌নো খরের অপেক্ষায় থাকবে সে খর অনেক আগেই শুকিয়ে আগুনের অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রয়েছে—অর্থাৎ, সর্বস্বান্ত কৃষকজনসাধারণের মনে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে রয়েছে। এই সর্বব্যাপী

অসন্তোষের সমন্বয়েই সৃষ্টি হলো বক্‌সার বিদ্রোহ—১৮৯৯ সালে। এর নেতৃত্ব নেয় জমিদার—আমলা প্রভাবান্বিত গুপ্তসমিতি—The Society of Harmonious Fists. তাই, পূর্বের সমস্ত বিদ্রোহের মত এটাও ব্যর্থ হয়ে গেলো। যে নিজেই এক বোঝা, সে অন্যের বোঝা টানবে কি করে? উৎপীড়ন আর শোষণই যে জমিদার সামন্তের জীবননীতি সে মাঞ্চু সম্রাটের শোষণ থেকে মুক্তির পথ দেখাবে কি করে জনসাধারণকে! তাই, এই নেতৃত্বে কৃষক পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। ফলে, এ অভ্যুত্থানও বিফল হ'লো—কিন্তু একেবারে বিফল হয় নি। এই গণআলোড়নে মাঞ্চু সম্রাটের সিংহাসন যে ভাবে নাড়া খেয়েছে, তাতে আগামী বিপর্যয়ের দিনে তার পক্ষে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়েছিলো। এই বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ চীনের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়—তাছাড়া, চীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিদেশী সৈন্য মোতায়েন থাকার দাবীও মানতে বাধ্য করা হয়। অর্থাৎ, চীন প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই আধা উপনিবেশে পরিণত হ'লো। এর আগে জাপানের কাছে চীন প্রথম পরাজয় বরণ ক'রে ফরমোজা দ্বীপ হারিয়েছে—তারই সাথে আরও অনেক কিছু। চীনের বুকে জাপ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রথম পদক্ষেপ। এই প্রথম পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি যে কত দূরপ্রসারী সেদিনের চীন যদি সেটা বুঝতে পারত! কিন্তু, ইতিহাস আলেখ্য নয়। তাই, ভবিষ্যতের রক্তচ্ছবি ওতে প্রতিফলিত হয় নি। তবু ভাবী চীনের আভাস যে ওতে ছিলো সেটা নিশ্চিত।

পুরোণো চীনের অন্ত্যেষ্টি

মাঞ্চুরাজের পুরোণো চীনের আয়ু শেষ হয়ে গেছে বোঝা গেলো। ঝাঁকে ঝাঁকে গুপ্ত সমিতি গজিয়ে উঠলো। ইটালীর মত চীনেরও গুপ্ত সমিতি সৃষ্টির খ্যাতি আছে—যেমন এর নামের বৈচিত্র্য, তেমনি তার সংখ্যারও অনন্যতা। White Lily Society, Society of Divine Justice, White Feather Society, Heaven and Earth Society ইত্যাদি বহু Society পুরোণো পাঁকের মাথায় বুদ্বুদের মত ফুটে উঠলো। পাঁকের শরীর থেকে এদের জন্ম হ'লেও এরা চায় পচা-পাঁকের সংস্কার—তাই, বুদ্বুদের মতো দিকে দিকে এরা বিদ্রোহীরূপে মাথা তুলে দাঁড়ালো অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অবশ্য চীনের সমাজভূমির অনুকূল রসেই এই গুপ্ত সমিতির জন্ম লয়েছিল। উত্তুঙ্গ পাহাড়, জংলী নদী আর টাইফুন-ক্ষ্যাপা সাগরে মানুষের ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় সৃষ্টি সম্ভব। হয়েছিলোও তাই।

কনফুসিয়াসের একটা সাবধানবাণী তাদের এই সময়ে খুব কাজে লাগলো—Never have anything to do with those who pretend to have dealings with the supernatural. If you allow supernatural to get a foothold in your country, the result would be a dreadful calamity."

অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে কনফুসিয়াসের এই সাবধানবাণী পাশ্চাত্য শিক্ষিত চীনা যুবকরা কাজে পরিণত করতে আরম্ভ করলো। তাই, দৈবের হাতে নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা বন্ধক না রেখে তারা নিজেদের

সচেতন মত ও পথের ওপর সে দায়িত্ব টেনে নিল। পর্তুগীজ বন্দর ম্যাকাওএর আধুনিক শিক্ষিত চীনা ডাক্তার সান্‌-ইয়াৎ-সেন্‌ তাদের অন্যতম। অন্যান্য দেশপ্রেমিক চীনা যুবকের সাথে এই তরুণ বীর যুবক সান্‌ইয়াৎ 'China Revival Society'-তে যোগ দেন।

China Revival Societyর পেছনে অর্থ ছিলো চীনা বণিকদের, মস্তিষ্ক ছিলো বিদেশে শিক্ষিত দেশপ্রেমিক চীনা যুবক সম্প্রদায়ের, আর সহযোগিতা ছিলো তরুণ সামরিক কর্মচারীদের। সর্বপ্রথম হুনলুলুতে এই Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এর শাখা প্রশাখা ক্রমে সমগ্র চীনের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। এই Societyর নাম পরে হয় Revolutionary Alliance, সুপরিচিত Kuomintung নাম এরই ভবিষ্যৎ পরিণতি।

সর্বপ্রথম Canton সহরে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করার পরে এই Societyর উদ্যোক্তারা Anti-Chinese Immigration Legislation in Americaর বিরুদ্ধে আমেরিকা-জাত জিনিসপত্র বয়কট আন্দোলন গ'ড়ে তোলে। আমেরিকা নতি স্বীকার ক'রে চীনের অর্ধেক ক্ষতিপূরণ চীনের শিক্ষার জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯০৮ সালে ওই Societyর উদ্যোগেই অনুরূপ এক বয়কট আন্দোলন জাপানী পণ্য এবং জাহাজের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে ওঠে। এই সমস্ত আন্দোলন থেকেই China Revival Societyর বৈপ্লবিক শক্তি এবং সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

মাঞ্চু সম্রাটের কলঙ্কমলিন সন্ধির (বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথে) বিরুদ্ধে অনুযোগ ও অভিযোগ দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। অবসান-প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রসন্ন আলোকে সারা পৃথিবী জুড়ে যখন মুক্তির আলোড়ন চলেছে তখন সেই আলোকের এক টুক্‌রো স্ফুলিঙ্গ নেশাবিভোর চীনকেও তড়িতের আঘাত দিয়ে গেলো। ঘুমনো চীন জেগে ওঠে দেখলো দুনিয়ার সবটুকুই দর্শন নয়। আরও কিছু আছে। চীনের বুকে যা

জমেছে তাতে গৌরব নেই—আদৌ পুঞ্জীভূত আবর্জনা নিয়েই সে অহঙ্কার করেছে এতদিন, তার গায়ে বেঁধে বেয়নেটে খোঁচা, বিদেশী বারুদের মুখে তার তাসের দুর্গ ভেঙে পড়ে। এ দর্শন আপাতত বন্ধ রেখে নতুন দর্শনের সন্ধানে বেরোতে হবে। এই দর্শনই জন্ম দিলো কুয়োমিন্‌টাং দলের বা "The Peoples' Nationalist Partyর।

নতুন দর্শন চীনকে শেখালো, ভাবালু দৃষ্টি নিয়ে অতীতের পর্যবেক্ষণে প্রত্যক্ষ দুঃখের পরিমাণই বাড়ে—জোর করে আফিং খেতে হয়, জাতীয় আয় লুণ্ঠিত হয়ে অনাহার আর অনশনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়—তাছাড়া প্রত্যহের মর্মান্তিক এবং বিচিত্র লাঞ্ছনার কথা তো ছেড়েই দিলাম। যে দর্শনে মানুষের প্রত্যক্ষ যন্ত্রণার অবসান এনে দেয় সেই দর্শনই চীনা নরনারী ক্রমে বেশী করে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। স্বপ্ন-বিভোর চীন হয়ে উঠলো বস্তুনিষ্ঠ। অতীত সংস্কার থেকে মুক্তি পেয়ে যুবক চীন সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠলো—কিন্তু সৃষ্টির সে পথ রোধ করে রয়েছে একদিকে মাঞ্চু সম্রাট—ইতিহাসের অবাঞ্ছিত আবর্জনা। অন্যদিকে ছিলো বিদেশী বণিককুল—নতুন সমাজের পুরোনো ক্ষত। এই আবর্জনা আর ক্ষতর বেদনা সৃষ্টির পথে দুস্তর বাধা। জীবনের তাগিদে তার অবসান অনিবার্য হয়ে উঠলো।

ইয়াংসী উপত্যকায় বিপ্লবী চীনের জন্ম হলো। দেখতে দেখতে বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য আগুন মধ্য ও দক্ষিণ চীনের একটা বড় অংশে ছড়িয়ে পড়লো। যাদের অনালোক জীবনে আঁধির অন্ধতা ছিলো, বিপ্লবের লাল আগুনে তারা চিনে নিলো সম্মুখে এগিয়ে যাবার পথ—যা তারই পায়ের কাছে হুমরি খেয়ে অনাবিষ্কৃত পড়ে ছিলো যুগ যুগ।

মাঞ্চু সরকারের ভেতরও শাসন সংস্কারের দাবী প্রচণ্ড হয়ে উঠছিলো। বাইরে বিভিন্ন দল-সমন্বয়ে বৈপ্লবিক আলোড়নের ধাক্কায় মাঞ্চু শাসনের

ভিত্তি কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে এমন একটা বছর যায় নি যেবার মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান দেখা যায় নি। এরই পটভূমিকায় ১৯১১ সালে চীনের কয়েকজন নামজাদা ধনীর এক রেলওয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে মাঞ্চু সরকার অস্বীকার করেন। শুধু অস্বীকারই নয় সাথে সাথে সেই পরিকল্পনাটা এক বিদেশী ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেন। দিগন্তজোড়া বারুদের বুকে অগ্নিশিখা ফুঁসে উঠলো। মাঞ্চু সম্রাটের দিন শেষ হয়েছে। বিস্ময়ে-আনন্দে পৃথিবীর শোষণজর্জর নরনারী এক প্রসন্ন প্রভাতে শুনতে পেলো দুনিয়ার এক প্রকাণ্ড অংশ থেকে এক ঐতিহাসিক হেঁয়ালীর অবসান হয়েছে। চীনে রাজতন্ত্র নেই। বিপ্লবী প্রাচ্যের প্রথম অভিনন্দন চীনই লাভ করলো। তার বারুদ, তার Compass এর সাথে প্রাচ্যের প্রথম গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সম্মানও তারই পাওনা। মাঞ্চু সম্রাট মরা নদীর স্রোত বেয়ে ভঙ্গুর অতীতের দিকে ইতিহাসের পাল তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস অত পঙ্গু নয়—সে সমুদ্রের জোয়ারের মতই অনিবার্য গতিতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায়—মরা গাঙের নেশা তাকে আত্মভোলা করতে পারে না—ভরা গাঙের খরস্রোত বেয়েই সে এগিয়ে যায় সামনে—শুধুই সামনে। ঐতিহাসিক দেখলেন, "The logic of history is defeating and will defeat the logic of counter-Revolution."

এই বিপ্লবের পুরোধা সৈনিক সান্‌ইয়াৎসেন তখন জনসাধারণের চোখে এক অলৌকিক মানব বলে পরিচিত। জনসাধারণের সুখ দুঃখ নিয়ে যুগে যুগে যারা লড়াই করে এসেছে তারা জনসাধারণের চোখে এমনি অতীন্দ্রিয়, রহস্যময় জগতের লোক বলে গণ্য হয়। তাদের ঘিরে অতিমানবতার কুয়াসায় ছাওয়া পর্দা তৈরী হয়। সান্‌ ইয়াৎসেনও তার ব্যতিক্রম নন্‌। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীকে সাধারণ চাষী,

অনেক সময় শিক্ষিত ভদ্রলোকও, যে দেবত্ব আরোপ করে থাকেন— তাঁর ক্রিয়াকলাপের যে অলৌকিক বিবরণ সৃষ্টি করে থাকেন, দেশে দেশে মহান্ দেশনেতারা সবাই প্রায় সেই রকম ভাবেই গণ্য হয়ে এসেছেন। সান্ ইয়াৎসেন সম্বন্ধেও সেইরকম গল্পের অভাব নেই। শোনা যায়, সান্ ইয়াৎসেনের গ্রেপ্তারের জন্যে একবার চীন সরকার প্রচুর টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। সান্ ইয়াৎসেন তখন নৌকোয় চড়ে পালাচ্ছেন। কি ভাবে সন্ধান পেয়ে একজন পুলিশের চর সেই নৌকায় ওঠে। সান্ তাঁর কথাবার্তা ইত্যাদি দিয়ে এমনভাবে তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলেন যে সে সান্‌কে অভিবাদন জানিয়ে নৌকো থেকে নেমে চলে যায়।

দেবতার শক্তিতে যে মাঞ্চু সম্রাটের সিংহাসন সুরক্ষিত ব'লে সাধারণ চীনার ধারণা ছিলো দেখা গেলো সে সিংহাসন নিছকই এ জগতের সাধারণ ধাতুরই তৈরী। সামান্য আঘাতেও সে সিংহাসন ভেঙে পড়ে। ভেতর থেকে যার ক্ষয় ধরে বাইরের সামান্য আঘাতও সে সইতে পারেনা। বহুদিন ধরে বহু অত্যাচারে যে রাজবংশ কলঙ্কিত ছিলো, সঙ্কটের সময় দেখা গেলো তাকে রক্ষা করার মত বন্ধু নাই। এমনি ভাবেই একদিন ফ্রান্সের সিংহাসন থেকে লুইকে বিদায় নিতে হয়। সেদিনও রুশিয়ার জারকে রক্ষা করবার মত বন্ধু বিশেষ পাওয়া যায়' নি। অপ্রয়োজনীয় বোঝা বইতে সবাই নারাজ। চীনে একটা প্রবাদ আছে "বাঘের গর্জন নিয়ে যে আসে সাপের লেজের মতই সে (নিমেষে) পালায়।" মাঞ্চু রাজবংশের পক্ষে একথা খাটে। রাজকীয় ভঙ্গীতেই একদিন মাঞ্চু সম্রাট চীনে ঢুকেছিলেন—পালাবার সময় সাপের লেজের গতিকেও তিনি হার মানান্।

চীনাজাতির দীর্ঘ কুসংস্কারের ওপর এই প্রথম প্রচণ্ড আঘাত।

রাজা আর দেবতা ছাড়া দুনিয়া সে ভাবতে পারত না। কিন্তু যখন দেখা গেলো রাজা ছাড়াও রাজ্য ভাবা চলে এবং ভালো ক'রেই ভাবা চলে আগের চেয়ে, তখন বদ্ধ জলাশয়ের মত চীনা নরনারীর নিস্তরঙ্গ চিন্তা-স্রোতে প্রথম তরঙ্গভঙ্গের আওয়াজ শোনা গেলো। অভ্যস্ত সংস্কারের প্রথম ব্যতিক্রমে চিন্তার রাজ্যে গতির ঢেউ উঠে। জাতীয় জাগরণের সেই প্রথম সূত্রপাতের দিনে সান্ ইয়াৎসেন কোথায়? সান্ ইয়াৎসেন তখন লণ্ডনে। সেদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছেন—ফিরে আসার সময় হাসতে হাসতে ব'ললেন, চীনা জনসাধারণ আমাকে নতুন চীনা গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত ক'রেছে। মাত্র এই একটি কথায় বোঝা গেলো, মানবেতিহাসের এক অতি পুরোণো যুগের ওপর যবনিকা পড়ে গেছে, আর তারই স্থানে নতুন যুগ মানুষের অধিকারের নতুন দাবী নিয়ে এসে হাজির হ'য়েছে। পুরোণো চীন মরেছে, নতুন চীনের আভাস পাওয়া যায়। মাঞ্চু রাজবংশ পুরোণো যুগের বন্ধ্যা জীবনের বাণী নিয়ে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেলো। তার স্থানে যে যুগ এলো সে যুগের সামনে বহু প্রশ্ন ভীড় করে দাঁড়িয়ে, বহু সমস্যা মীমাংসার অপেক্ষায়। বন্ধ্যা জীবনের প্রশ্নের বালাই নেই। অতীতের পার থেকে জীবনের যে নির্দেশ সে নিয়ে এসেছে ঘুমন্ত মানুষের মত নির্বিকার ঔদাসীন্যে সে নির্দেশই পালন ক'রে যাওয়া তার কাজ। অস্তিত্বের গণিততত্ত্বেই তার সার্থকতা—সৃষ্টির জগতে সে প্রাণহীন এ্যাটম্।

নতুন চীনের উন্মেষ

এইবার নতুন চীনের পালা। পুরোহিত-কণ্টকিত, ধর্মশাসিত, পারলৌকিক চীন ইহলৌকিক সমস্যা মেটাবার দিকে মন দিলো—বিপ্লবের সাফল্যের পরে।

আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, প্যারী কমিউন্ মানব-সমস্যার যে সমাধানে ব্রতী হয়েছিলো—চীনের এই নতুন বিপ্লবও তারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু, চীনের সমস্যা ভৌগলিক এবং সামাজিক পরিবেশের বিশিষ্টতায় এক বিশেষ ধরণের রূপ নিয়েছিল।

প্রথমত, চীনের কৃষি সমস্যার কথাই ধরা যাক। বিদেশী বণিকের আসার আগে পর্যন্ত চীন কুটীরশিল্পে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ ব'লে গণ্য হতো। হাতে সুতো কেটে, তাঁতে কাপড় বুনে, হাতে কাগজ তৈরী করে চাষী কিছু বাড়তি আয় করতে পারত। জমিদারের শোষণের কিছুটা ভারসাম্য এইভাবে হ'তো। কিন্তু বিদেশী পণ্যের সস্তা প্রতি-যোগিতায় ভারতের মতই চীনের শিল্প নষ্ট হয়ে যায়—ফলে, শিল্পের ওপর নির্ভরশীল গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এমনি করে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। এই অসন্তোষই বক্সার বিদ্রোহের সাহায্য করে। বক্সার বিদ্রোহ বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণের এক সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিলো তারা ইতিহাসের অপ্রয়োজনীয় বোঝা—জনসাধারণকে শোষণ ও শাসন করাই ছিলো তাদের পেশা। তাই, যে বিশ্বাস ও আস্থার ফলে সমস্ত দেশবাসীকে একই পতাকার তলে জমায়েৎ

করা যায় এইসব নেতাদের মধ্যে তার একান্তই অভাব ছিলো—ফলে, প্রচুর রক্তপাতের মধ্য দিয়েই এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু, একে শুধু ব্যর্থ বললে অন্যায় হবে—কেননা, জনসাধারণের চেতনা বাড়াবার দিক দিয়ে এ বিদ্রোহের প্রয়োজন ছিলো। এটা তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা—পরবর্তী বিপ্লবের।

১৯১১ সালের বিপ্লব চীনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন ঘটনা। এর আগে বিদ্রোহ-বিপ্লব যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু সংঘবদ্ধ বিপ্লবের এমন সবল পরিণতি আর কোনদিন ঘটে নি। সেদিক দিয়ে বিপ্লবের আগের দিন পর্যন্ত হচ্ছে পুরোনো চীনের প্রান্তসীমা। নতুন চীনের সীমারেখা এই বিপ্লবের দিনটি থেকে। এক একটানা অভ্যস্ত চিন্তাধারার অবসানে নতুন ভাবনা, নতুন উদ্দীপনা, নতুন কর্মদ্যোতনা জাতীয় জীবনে জোয়ার আনলো। তেমন কর্মোত্তম চীনের ইতিহাসে কোনদিন দেখা যায় নি। বিপ্লবের ঘূর্ণিবায়ু মানুষের অন্তরকে নাড়া দিয়ে গেছে। বিপ্লবের গতিবেগ তার মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে—সম্রাট নাই, সাম্রাজ্য নাই, শোষন নাই, শাসন নাই—মানুষ এক নতুন দিনের কল্পনায় মেতে উঠলো। বিপ্লব তার সামনে নতুন নতুন প্রশ্ন, নতুনভাবে তার সমাধানের ইঙ্গিত তুলে ধরলো। আগামী চীন তারই মীমাংসার পথে ধাপে ধাপে এগিয়েছে।

চীনা ব্যাণ্ডিট

চীনের ব্যাণ্ডিট প্রশ্ন একটি জটিল প্রশ্ন। তার আধা-সামন্ত অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে জড়িত। যে ব্যাণ্ডিটদল চীনের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে ছিলো সেদিন পর্যন্তও, তার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

পুরোনো কুটীর-শিল্প চুরমার হয়ে গেলো অথচ নতুন কোন শিল্প তার স্থান গ্রহণ করলো না। এরই পরিণতি সৃষ্টি করলো অগুন্তি গ্রাম্য বেকারের। জীবনসংগ্রামের তিক্ত প্রয়োজনে, কাজের একান্ত অভাবে বেকারের মনে বিকার দেখা দেবার কথা। এই বিকারের ঘোরেই চীনের আনাচে কানাচে গ'ড়ে উঠলো Bandit দল। লুঠপাট করা হয়ে উঠলো তাদের পেশা। বিরাট দুর্গম দেশে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব অত্যন্ত শিথিল থাকায় এই সব Bandit দল আপন ইচ্ছা মত কায়েমী স্বার্থ গড়ে তুলেছিল। মোগল রাজত্বের ভাঙনের দিনে ভারতের জায়গীরদাররা যে অভিনয় করেছে চীনেও তারই পুনরাবৃত্তি চললো। বিদেশী বণিকদের আসার আগেও এদের অস্তিত্ব ছিলো। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার সারা চীনের উপর চিরকালই দুর্বল ছিলো। তারই সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী রাজা-মহারাজারা Bandit দলপতি হ'য়ে ইচ্ছামত লুঠপাট করে বেড়িয়েছে। জমিদারের শোষণে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও চীনে কম ছিলো না। এরাই সেই Banditএর দল ভারী করেছে। এই Banditry যে একটা ঘৃণ্য উপজীবিকা—এরকম কোন ধারণাই নাকি

তখনকার চীনে ছিলোনা। কৃষিকাজ, শিল্পকাজের মতই এটা সহজ ও সরল ছিলো। শোনা যায়, চীনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকরাও নাকি অনেকেই কখনও না কখনও এই Banditগিরি করেই কাটিয়েছেন। শ্রেণীচেতনা যেদিন আবার দানা বেঁধে ওঠে সেদিন আবার এই Bandit দলই দলের কায়েমী স্বত্বওয়ালাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরে।

যাক্, চীনের জমিসংকট বরাবরই বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করে এসেছে। এরই সফল সমাধানের উপর চীনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। চীনের প্রথম বিপ্লব ধূমায়িত হবার পেছনে প্রধানত তিনটি বিষয় কাজ করে—তার মধ্যে এই ভূমিসমস্যা একটি এবং এরই সাথে জড়িত বিদেশীর অবৈধ অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ। আর দুটো ছিলো, মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ এবং পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে রাজনৈতিক এবং শাসনসংস্কার।

এই তিনটে সমস্যার মধ্যে শুধু মাঞ্চু সম্রাটের উচ্ছেদের সমস্যারই মীমাংসা হয়—অন্য দুটো সমস্যার আজও পূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নি—তবে, বর্তমান যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চীন সে পথে বহুদূর এগিয়েছে এবং ভরসা আছে, তার পূর্ণ মুক্তিও এই যুদ্ধের ভেতর দিয়েই সম্ভব হবে।

বিপ্লব হ'লো বটে, কিন্তু তখনও জাতি হিসেবে চীনা জাতের সৃষ্টি হলো না। বিপ্লবী গবর্ণমেণ্ট ওই Bandit সমস্যার মীমাংসা করতে পারল না—তাই অন্তর্দুর্বলতার অবসাদে সে গবর্ণমেণ্ট ধুকতে থাকলো।

কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন কায়েম হলোনা। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টিকারীর দল অরাজকতাটাকেই দেশের বহু অংশে নিয়ম করে তুললো। নতুন নতুন Bandit দলও উৎসাহিত হয়ে লুঠতরাজ সৃষ্টি ক'রে চললো। দাবার ছকের মত সারা দেশটা নানা ভাগে টুকরো হয়ে রইলো। অবশ্য এই Banditদের কৃতিত্ব এইটুকু ছিলো যে তারা নিজ স্বার্থেই আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্যের সাহায্য

করেছে Mandarin ভাষা চলিত করে। Banditরা একে অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝতো না তাই বাধ্য হয়ে Mandarin ভাষা শিখতে হতো।

ধনতান্ত্রিক দেশের বেকার সমস্যার সাথে চীনের এই Bandit প্রথার (এটাকে প্রথাই বলবো) অনেকটা মিল আছে। ধনতান্ত্রিক নিয়মের অনিবার্য পরিণতি বেকার সমস্যা। রূপ ভিন্ন হলেও চীনের ধনবাদ এই Bandit প্রথার জন্ম দেয়। উন্নত শিল্পপ্রধান দেশে বেকারদের যেমন কিছু কিছু allowance দেওয়া হয়—চীনের local Government কেও বাধ্য হয়ে এই Banditএর বোঝা পুষতে হতো—জোড়াতালি-দেওয়া শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য। বেকারদের allowance দেবার মধ্যেও ধনতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রাখবার প্রয়াস রয়েছে। বিকারঘোরে বেকাররা যাতে বর্তমান সমাজব্যবস্থা বদলাবার বৈপ্লবিক প্রেরণায় মেতে না ওঠে তারই জন্যে ওই ঘুষের ব্যবস্থা। Banditদের সম্বন্ধেও ওই একই কথা বলা যায়। জীবিকার্জনের অন্য সব ভদ্র উপায় বন্ধ থাকাতে Banditগিরি করা ছাড়া সাধারণ লোকের কোন উপায় ছিলো না।

তবে পাশ্চাত্যের বেকারের সাথে প্রাচ্যের এই Banditদের একটা বিষয়ে পার্থক্য ছিলো। নিছক বেকার হওয়া কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান দেয় না, কিন্তু চীনে Banditগিরির মধ্যে Future Prospectএর সন্ধান ছিলো। Banditগিরি ক'রে ক'রে এক একজন প্রচুর ঐশ্বর্যের এবং তার সাথে অশেষ ক্ষমতার মালিক হয়েছে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব ছিলো না। তাই, সাহসী দুরাকাঙ্খী যুবকের সামনে ওই লজ্জাকর হীন বৃত্তিও আদর্শ হয়ে ওঠে। সভ্যতার নিরীখে ঘৃণ্য হলেও জীবনসংগ্রামের বিচারে পথহারা চীনা যুবকের কাছে ওই পথই শুধু খোলা ছিলো। এ নিয়ে অভিযোগ করে লাভ নেই। যে-সমাজ

তাকে জমির মালিকানা থেকে মুক্তি দিয়েছে, সভ্যভাবে বেঁচে থাকার পথ বাতলাতে পারে নি—শুধু জন কয়েকের উদরস্ফীতির ব্যবস্থা করেছে—অভিযোগ জেগেছিলো চীনা নরনারীর সেই ব্যবস্থারই ওপর—কিন্তু আরও পরে।

সংক্ষেপে বলা চলে, ব্যাণ্ডিটের সমস্যা মূলত জমির সমস্যা। জমির ক্ষুধাই এদের প্রকৃত ক্ষুধা। সে ক্ষুধা মিটাবার ক্ষমতা সর্বভুক জমিদার সামন্তের ছিলো না—তাই, ব্যাণ্ডিটের সমস্যার সেদিন সমাধান হয় নাই। সংঘবদ্ধ শ্রমিকই শুধু ও সমাধান আনতে পারত—কিন্তু সে তখনও ভ্রূণদশায়। তার পরিণতির দিনে সমস্যার অনেকটা মীমাংসা হবে।

সান্ ইয়াৎ সেনের সমস্যা

১৯০৫ সালে রুশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব হয় তার ঢেউ সারা প্রাচ্যের উপর দিয়ে বয়ে যায়। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার মত শক্তির পরাজয় এবং জাপানের মত ক্ষুদ্র শক্তির অদ্ভুত শৌর্য প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতির প্রাণে এক বিরাট আশার বাণী এনে দেয়। তারপর রুশ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সে আশা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। চীনের ১৯১১ সালের বিপ্লবে রুশ বিপ্লবের সেই অনুপ্রেরণারই সন্ধান পাওয়া যায়।

সংস্কারমূলক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সান্ ইয়াৎ সেন রুশ বিপ্লবের মধ্যেই তাঁর জাতির মুক্তির সন্ধান পান। অবশ্য, তাঁর রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক মতবাদ দানা বাঁধতে আরও সময় নিয়েছিল।

সান্ ইয়াৎ সেনের সামনে প্রধানত দুটি সমস্যা ছিলো। এক, বিদেশী অর্থনৈতিক দাসত্ব—দুই, প্রতিক্রিয়াশীল war lordদের হাত থেকে চীনের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। প্রথম বিপ্লবের বিজয় সে মুক্তি সম্ভব করলো না। ইউয়ান শিকাই, চ্যাংশোলিন প্রভৃতির মত প্রতিক্রিয়াশীল সমরনায়কের হাতেই চীনের অধিক সংখ্যক জায়গা রয়ে গেলো। ঐক্যের আঘাতে মাঞ্চু সম্রাটের উচ্ছেদ হলো সত্য, কিন্তু সেই ঐক্য বৃহত্তর অনৈক্যের রূপ নিয়ে দেখা দিলো। তাই, বাধ্য হয়েই তিনি চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। যে নীতি নিয়ে চীনকে তিনি গড়ে তুলবার সঙ্কল্প করলেন তাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'সান্ মিন্ চিউ' অর্থাৎ তিন নীতি, যা চীনের সুস্থ এবং সাবলীল বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। জাতীয়তা, গণতন্ত্র এবং জনগণের জীবিকা—এই তিন নীতির ওপর তিনি চীনকে গড়ে তোলবার সঙ্কল্প করলেন।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসনে চীনের অগ্রগতি থমকে ছিলো—চীন বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। তারই সুযোগ নিয়ে বিদেশী বণিকের অন্যায় শোষণ অবাধ হয়ে ওঠে। তাই জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু সামন্ততন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত অনিবার্য হয়ে পড়লো। সান্ ইয়াৎ সেন জানতেন, সামন্ততন্ত্রের এই জগদ্দল পাথর মাথায় নিয়ে বিদেশী শোষণের অবসান ঘটান যায় না। সামন্ত ব্যবস্থার উচ্ছেদের সাথে যে বলিষ্ঠ জাতীয়তা ও গণতন্ত্র দেখা দেবে তার শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবার স্পর্ধা বিদেশী স্বার্থবহের হবে না। তাই, জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ তুলে তিনি চীনের একচ্ছত্র সমরনায়কদের কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু ফল খুব বেশী কিছু হলো না।

এদিকে সানের কর্ম্মপন্থার মধ্যে "বড্ড বেশী বিপ্লবের" গন্ধ পেয়ে

একদিকে চীনের সামন্ত-জমিদাররা, অন্যদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সানকে নাকচ করে অর্থসামর্থ্য সব ইউয়ান শি ফাই নামে এক সামন্তের পেছনে ঢালতে লাগলেন। এঁর গুণ ইনি বিদেশীদের খুব অনুরক্ত। এঁর যোগ্যতা,—ইনি একজন সামন্ত জমিদার—তাই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ অথবা দেশী সামন্তবাদের আশঙ্কায় কোন কিছু ছিলো না—বরং, বিপ্লবের শুভ ফলকে এঁরাই আত্মসাৎ করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

ওদিকে বিপ্লবী শক্তিও বড় বেশী দানা বাঁধতে পারেনি তখনও। জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার কোন কার্যতালিকা উপস্থিত করা হয় নি। Kuomintung তখন জমিদার সামন্ত প্রভৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

নানা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চাপে পড়ে সান্ প্রেসিডেণ্ট পদটি ইউয়ান-সী কাইএর জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। প্রতিক্রিয়াশীলশক্তির সাময়িক জয় হলো। নতুন প্রেসিডেণ্ট ছিন্নমস্তার মত আপন রুধির আপনি পান করতে মত্ত। বেছে বেছে বিপ্লবী নেতাদের কতল করা হল। চীনের কেন্দ্রীয় অর্থনীতি তখন ভেঙ্গে পড়েছে। বিদেশী ঋণ উদাসী প্রেসিডেণ্টকে রক্ষা করলো—অবশ্য কিছুদিন মাত্র। তারই সাথে এলো নতুন নতুন সর্ত। চীনের ক্ষত-বিক্ষত গা থেকে আরও কয়েক টুকরো মাংস খসে পড়লো। অর্থসচিবের দপ্তরে একজন বিদেশী Auditorএর স্থান হলো। একজন British Political Adviser, একজন French Military Adviser, একজন French Controller of Post-office শাসনদপ্তর অলঙ্কৃত করলেন। খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে পাশ্চাত্যের নীল চাঁহনিওয়ালা রাজপুরুষের গম্‌গমে আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। বিপ্লবী চীন যেন বিপ্লবের একটুকরো উপহাস মাত্র হয়ে রইলো।

যতদিন বিদেশী টাকার মেয়াদ থাকলো ততদিন ইউয়ান সী কাই-

এর দিন কাটলো ভালই। কিন্তু বাঁধা টাকা আর কতদিন থাকে। আর্থিক সংস্থান কমে আসার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বেও শিথিলতা এলো। জেলা অথবা প্রদেশে স্থানীয় শাসনকর্তাদেরই একচেটিয়া রাজত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে তারা নিজেদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির দিকে মন দিলো। এই রকম এক অরাজক দিনে ইউয়ান মারা গেলেন। চীন war-lordদের শিকারক্ষেত্রে পরিণত হলো। বিপ্লবী চীন আবার বুঝি প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে ফিরে যায়! সাংহাইএর পার্কে সাইনবোর্ড ঝুলতে লাগলো "No Dogs or Chinese allowed".

এই সময় মানুষের সামনে পরিপূর্ণ মুক্তির বার্তা নিয়ে রুশ বিপ্লব সুরু হলো। ভিসার রেল ষ্টেশনে এসেই জীর্ণ জারতন্ত্রের রথ চিরদিনের জন্যে থেমে গেলো। অদৃশ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে মানবসমাজের স্থান ছিলো, ধূলো আর ধোঁয়ায় অমানুষ তারাই এসে ইতিহাসের হাতল তুলে ধরলো। অভ্যস্ত সংস্কারের বেড়ায় এই আর একটা বড় রকমের আঘাত। যুগে যুগে শ্রেণীর সাথে শ্রেণীর রক্তাক্ত সংগ্রামে সভ্যতার অধোগতি সম্ভব হয়েছে। প্যারি কমিউনে শ্রেণীসংঘর্ষের কালান্তক বোঝা নামিয়ে ফেলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা উঁকি মেরেই বিলীন হয়ে যায়—কিন্তু রুশবিপ্লব সেই সম্ভাবনাকে চিরন্তন ক'রে তুলবার দিকে মন দিলো। হাতে-কলমে প্রমাণিত হ'লো, মানুষ শুধু মানুষকে শোষণই করে না—মানুষই আবার শোষণের শেষগ্রন্থিকে নির্মম হস্তে খুলে ফেলে দেয়। সভ্যতার এই-ই অনিবার্য রূপ।

সান্‌ইয়াৎ সেন্ যখন দক্ষিণ চীনের এক অন্ধকার কোনে পথ হাতড়িয়ে মরছিলেন, তখন পশ্চিমের এক কোন্ থেকে উজ্জ্বল আলো এসে প'ড়ে তাঁর পথের সন্ধান দিয়ে গেলো। রুশ বিপ্লবই সান্‌ইয়াৎ সেনের

সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শিক্ষা। তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই তাঁর দৃঢ় স্বীকৃতি তিনি রেখে গেছেন। আত্মস্বাতন্ত্র্যের নীতি (জাতি সমূহের) বাস্তবে স্বীকার ক'রে নিয়ে যখন ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ডের দাবী রুশিয়া স্বীকার ক'রে নিলো, তুর্কীর ওপর জারের কুটিল মতলবের ষড়যন্ত্র ফাঁস ক'রে দিলো, চীনের ওপর সাম্রাজ্যবাদী রুশের সর্বপ্রকার অন্যায় অধিকার বিসর্জন দিলো, তখন সান্‌ইয়াৎ সেনের বুঝতে বাকী রইলো না, শোষণের কুৎসিৎ জগতে একমাত্র রুশিয়াই তার বন্ধু। বন্ধুত্বের এ মর্যাদা রুশিয়া আজও রেখেছে—স্বয়ং চিয়াং কাইসেকের স্বীকৃতিতেই তার সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু তারও আগে চীনের পক্ষে যে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেলো সেটায় আসা যাক্। এক জটিল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে নতুন চীনের উন্মেষ হচ্ছিলো—এমন সময় প্রথম মহাযুদ্ধের ছায়া পৃথিবীর ওপর ঘনিয়ে উঠলো। চীনের এমন সম্বল নেই—তা ছাড়া প্রত্যক্ষ স্বার্থও এমন নয় যা নিয়ে এবং যার জন্যে সে মহাযুদ্ধের মত একটা প্রলয়ঙ্করী সংঘর্ষের অংশীদার হয়। তবু কয়েকটা অপ্রত্যক্ষ স্বার্থের দায়ে শেষ পর্যন্ত চীনও মিত্রপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হয়। চীনের ওপর জাপানী অভিসন্ধির ইঙ্গিত দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠছিলো। কোরিয়া গেছে, ফরমোসা গেছে—মাঞ্চুরিয়ার দোলায়িত ভাগ্যে দুর্যোগের কালো তিলক ফুটে উঠছিলো ধীরে ধীরে। এরই পটভূমিকায় দুর্বল এবং বহুর স্বার্থে বিভক্ত চীন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের আশ্বাসবাণীতে মুক্তির আশা পেলো। সে ভেবেছিলো, মিত্রপক্ষে যোগ দিলে হয়তো জাপানী প্রভুত্ব ও আন্তর্জাতিক সংবদ্ধ চক্রান্ত ও শোষণের হাত থেকে সে রেহাই পাবে। Extra Teritorial Right-এর নামে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ চীনের বুকে নিজেদের সুখের

রাজত্ব ফেঁদে বসেছিলো—যেখানে চীনের আইনকানুনের নিম্নতম অধিকার ছিলো না। এই অধিকারের দোহাইয়ে বিদেশীরা চীনের মাটিতে বসেই চীনের মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করতো—চীনের পক্ষ থেকে কোন প্রতিকারের পথ খোলা ছিলো না। এই ফাঁকির আড়ালে চীনের বুকে এই গুপ্তহত্যার ব্যবসা চিরদিনই চাপা দেওয়া আগুনের মতই ধিকি ধিকি জ্বলেছে।

তারপর গায়ের জোরে Treaty Port খোলানও আর এক নৃশংসতা। সন্ধির নামে এর মধ্যে যে দুরভিসন্ধির বীজ লুকিয়ে ছিলো তাতে চীন জর্জর হ'য়ে উঠেছিলো। চীনের Custom Revenue তার প্রধান আয়,—অথচ, সন্ধির ফলে চীনকে সেই Revenueর শতকরা প্রায় সত্তর ভাগই হারাতে হয়।

জাপানী স্বার্থ ও বিদেশী স্বার্থের রোলারের চাপ থেকে বাঁচবার জন্যেই নিরুপায় হয়ে চীন শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু উইলসনী আশ্বাস যে ফাঁদে ফেলার মায়া মরীচিকা, এ জ্ঞান চীনের সেদিন হ'লো, যেদিন দেখা গেলো যুদ্ধান্তে চীনের জার্মাণ অংশের মালিকানা জাপান লাভ করেছে। তা ছাড়াও, যুদ্ধে যোগ দেবার পুরস্কারস্বরূপ জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েক হাজার দ্বীপের মালিক হয়ে শেকলের মত চীনকে ঘিরে ফেলার অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

অবশ্য, চীন সম্বন্ধে জাপানের ক্রিয়াকলাপ বেশ একটা সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিলো বহুদিন থেকে। ক্ষয়িষ্ণু জাপ-ধনতন্ত্র, জাপানী পীত সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতির একমাত্র সম্ভাবনাই ছিলো চীনে। জাপান জানত, চীন অনৈক্যের বেদনায় দুর্বল। বিভিন্ন স্বার্থের নখরাঘাতে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত—তাছাড়া যুদ্ধ বাধার ফলে মিত্রপক্ষ স্থানান্তরে ব্যস্ত। এই সুযোগ নিয়ে জাপান যুদ্ধ বাধার

কিছুদিন পরেই চীনের ওপর একুশ:দফা দাবীর এক লম্বা ফিরিস্তি জারী করলো। দুর্বল পিকিন্ গবর্ণমেণ্ট সে দাবী অগ্রাহ্য করবার সাহস পেলো না—কিন্তু, পিকিন্ গবর্ণমেণ্টের পেছনে দেশপ্রেমিক চীনাবাসীর সমর্থন ছিলো না। জাপানী দাবীর স্বীকৃতির অর্থ চীনের সম্পূর্ণ আত্ম-বিনাশ—তাই, সান্‌ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে সত্যিকার চীন সে দাবী অগ্রাহ্য করলো। পিকিনের রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শোভাযাত্রা ইউয়ান শিকাই'র মাথায় ধিক্কারের মত ভেঙে পড়লো। অনাগত গৌরবময় যুবক আন্দোলনের এই প্রথম সূত্রপাত। চীনের এই যুবক আন্দোলন দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী যুবক যুবতীর কাছে এক পরম শ্লাঘা ও বিস্ময়ের সম্পদ। এই যুবক আন্দোলনই চীনের বুকে এক অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ আনে। চীনের বিস্ময়কর গণচেতনার প্রথম অভ্যুদয়ের মুখে চীনা যুবকের নিঃস্বার্থ দান উল্লেখ না করলে চীনের জাতীয় ইতিহাসের ত্রুটী থেকে যায়। যুবকরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে জনসাধারণের দৈনন্দিন দুঃখ-বহন-সংগ্রামের অংশ নিয়ে গণ-আন্দোলনের বুকে যে শক্তি ও প্রেরণা জাগাতে পেরেছিলো তার তুলনা কম।

চীনের এই যুবক আন্দোলনের সূত্রপাত May 4th, 1919, থেকে। সেইজন্যে একে May 4th আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের পটভূমিকা বৃহত্তর—এর একদিক জাতীয় আর একদিক আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তখন Austria, Hungary, Germany, Turkey-র মত বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বসে গেছে। British এবং French সাম্রাজ্যবাদ আঘাতে আঘাতে দুর্বল। ওদিকে রুশ বিপ্লব সফল হয়েছে। অষ্ট্রীয়া, জার্মেণী, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ গণবিপ্লবে কম্পমান। বুর্জোয়া অথবা ধনিক অর্থনীতি, রাজনীতি—যা এক সময় মহাকালের মতই

অলঙ্ঘনীয় বলে প্রচার করা হ'তো, প্রচণ্ড আঘাতে সবই নীরব। সোভিয়েট বিপ্লব দুনিয়ার বুক জুড়ে বসেছে।

ওদিকে জাতীয় ক্ষেত্রে ইউয়ান্-শী-কাই'র চাপানো দুর্ভাগ্য বইতে বইতে চীন হাঁপিয়ে উঠেছে। তার সমস্ত গায়ে লাঞ্ছনা গঞ্জনার চিহ্ন। জাতির ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলছে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশ্রয়ী। অথচ, জনসাধারণের মনে বিপ্লবের আগুন জমে আছে। যে আগুন আত্মপ্রকাশ ক'রেছে বিপ্লবেরই মধ্যে। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের মনে যে এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোড়নের ঢেউ পৌছবে তাতে বিচিত্র কি? জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যখন কাপুরুষের মত জার্মাণ কবলিত চীনের অংশ বিশেষ এবং তারই সাথে আরও ডজন কয়েক দফা-দাবী উপস্থিত করলো তখন তরুণ চীনের নবোন্মেষিত বিপ্লবী মন সে অবমাননাকে আর নিঃশব্দে মেনে নিতে রাজী হলো না। হাজার হাজার ছাত্র পিকিনের রাস্তায় রাস্তায় এর প্রতিবাদ জানিয়ে বেড়ায়। চীনের ইতিহাসের আর এক অধ্যায় এবং পূর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় সুরু হলো। এর আগে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধ্বনি এত সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় নি। তবে এই ধ্বনির একটু দুর্বলতা ছিলো—শুধু জাপানী সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধেই বিশেষ করে এই ধ্বনি উত্থিত হয়। অবশ্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারই তখনকার ঘটনায় মুখ্য বলে মনে হওয়ায় এ দুর্বলতা থেকে যায়। পরে সেটা দূর হয়ে যায়।

চীনা তরুণের ভাবজগতে এই বিপ্লবের পেছনে ডাঃ পুশীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দান কম নয়। এর পেছনে সোভিয়েট বিপ্লবে অনুপ্রাণিত Communist Intelligentsiaও ছিলো। সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের পেছনেই একটা করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইতিহাস আছে। আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব সবার পেছনেই

একটা করে চিন্তাগত বিপ্লবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এর কারণও সুস্পষ্ট। বিশেষ এক ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো, তার ভাবজগতের রূপ। সামন্ত যুগ, বুর্জোয়া যুগ, ফ্যাসিস্ট যুগ সব যুগেই এর ধারাবাহিকতা আবিষ্কার করা যায়। সংস্কৃতি যেমন বিশেষ এক ধরণের অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি—তেমনি, সেই অর্থনীতিকে পুষ্ট করাও তার কাজ। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিপর্যয়ের দিনে যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভ্রূণ বুর্জোয়া কাঠামোর মধ্যেই জন্ম নিলো, তখন তারই সাথে অনিবার্যভাবে তারই ভাষা, তারই ভাব দানা বেঁধে উঠতে লাগলো এবং এদের সমন্বয়েই গড়ে উঠলো নতুন যুগের সংস্কৃতি। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় এবং জাতীয় ভূমিকায় যখন দেখা গেলো পুরোণো অর্থনীতির মেয়াদ ফুরিয়েছে—নতুন অর্থনীতি তারই জঠরে জন্ম নিচ্ছে, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত চীনা যুবকেরাই তার প্রথম সন্ধান পায়। এই হলো May 4th আন্দোলনের মূলকথা। পুরোণো চীনা সংস্কৃতি তার অর্থনীতির মতই জটিল, দুর্বোধ্য, অনিশ্চিত এবং ব্যক্তিসর্বস্ব।

ডাঃ পুশী উত্তর চীনের জনসাধারণের উপযোগী করে একরকম সহজ এবং অল্পায়তন বর্ণমালার সৃষ্টি করে প্রাচীন চীনের হাজার কয়েক বর্ণমালার দুর্বিষহ গ্রন্থিকে চূর্ণ করেন। চীনের সংস্কৃতির ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। গণতন্ত্রের বাহন লোকশিক্ষার পথ তৈরী হলো। গণতন্ত্রের লড়াইএ এই লোকশিক্ষার হাতিয়ার চীনা গণতন্ত্রীদের অগ্রগতির পথে প্রচুর সাহায্য করেছে। অবশ্য, এই লোকশিক্ষার আন্দোলনের ইতিহাসও চীনের এক কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস।

এই May 4th আন্দোলনের সব চাইতে বড় দুর্বলতা শ্রমিক শ্রেণীর

সংযোগহীনতা। এর সবলতার কারণ চীনা ধনিক শ্রেণীর সহযোগিতা, শ্রমিকশ্রেণীর সংযোগ সে শীঘ্রই পায়। কিন্তু, ধনিকশ্রেণী ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের বেগে আর ক্রমক্ষীয়মান আত্মশক্তির সচেতনতায় ধীরে ধীরে এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। স্রষ্টা আর সৃষ্টির ব্যবধান জগতের লোক অনেকবার দেখেছে। এটাও তার মধ্যে আর একটি।

জাপানী অভিসন্ধি বুঝতে চীনের দেশপ্রেমিকদের দেরী হয়নি। তারই প্রত্যুত্তরে চীনের যুদ্ধোত্তর প্রথম গণজাগরণ। এরই চাপে পড়ে এবং শেষে মিত্রশক্তির নিজস্ব স্বার্থ বিপন্ন হবার সম্ভাবনায় জাপানের উপরোক্ত দাবীতে চীন আপত্তি জানায়। শেষ পর্যন্ত জাপান তার সুর অনেকটা নরম করে বটে, কিন্তু যুদ্ধে যোগ দেবার ফলস্বরূপ চীনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অর্থাৎ জাপান চীনের জার্মাণ জমিদারীগুলোর খবরদারী করার ভার পেয়ে বসে আর চীন পূর্ণ স্বাধীনতার বিনিময়ে মালিক বিনিময়ের কটু আস্বাদ পায়। অবশ্য, নানা চাপে Washington Conferenceএ চীনের সার্বভৌমত্ব রক্ষার একটা মামুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় বটে—কিন্তু, সে প্রতিশ্রুতি League of Nationএর ফাঁকা প্রতিশ্রুতির মতই অর্থহীন এবং অবান্তর। চীন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হিসেবে সান্ ইয়াৎ সেনের ওপর এতগুলো দুরূহ দায়িত্বের বোঝা চেপেছিলো। সেই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন বলেই ১৯২৬-২৭ সালে চীনের দ্বিতীয় বিপ্লব সম্ভবপর হয়। এই দ্বিতীয় বিপ্লবই চীনকে গণতান্ত্রিক ঐক্যের পথে অনেকদূর এগোতে সাহায্য করে। এই বিপ্লবের ফলেই চীনের বিভিন্ন অংশের ক্ষমতাশালী war lordদের প্রভুত্ব চুরমার হয়ে খণ্ড বিখণ্ড চীনের ভৌগলিক অখণ্ডতা গড়বার দিকে অনেকটা সাহায্য হয়। দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যে সান্ ইয়াৎ সেনের স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি এবং সক্ষম নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিলো।

আগেই বলেছি সান্ ইয়াৎ সেন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, সোভিয়েটই প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিগুলির একমাত্র অকপট বন্ধু। তাই, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক সব দিক দিয়েই সোভিয়েটের সক্রিয় সাহায্য কামনা করেছেন। এবং সে সহযোগিতা থেকে তিনি কোনদিনই বঞ্চিত হননি।

প্রথমেই তিনি সোভিয়েট থেকে শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়ে আসেন। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। তারপর, সামরিক উপদেষ্টা নিয়ে এসে দুর্বল চীনা পণ্টনকে আধুনিক কায়দায় শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়ত, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গণভিত্তি ছাড়া কুয়োমিন্টাঙের ভবিষ্যৎ কর্তব্যের পথে এগোন অসম্ভব। জনসাধারণ যাতে কুয়োমিন-টাঙ্‌কে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে—তাদের আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল যাতে কুয়োমিনটাঙ্ হয়ে ওঠে—এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি রাশিয়া থেকে আর একজন রাজনৈতিক উপদেষ্টা নিয়ে আসেন। তিনিই বোরোডিন্, যিনি চীনের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এক বিখ্যাত অংশ অভিনয় করেছেন।

বোরোডিন্ এসে শ্রমিকদের নিজস্ব দাবী দাওয়ার সূত্রে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ানে সংঘবদ্ধ করেন—কৃষকদেরও বিশেষ বিশেষ দাবীর ভিত্তিতে কৃষকসমিতিতে জমায়েৎ করেন। এইভাবে কুয়োমিনটাঙ্‌এর পেছনে এক বিরাট গণশক্তির সমাবেশ সম্ভব হয়। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব ক'রে কুয়োমিন্টাঙ্ সত্যিকার গণ-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছিল—সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু না হলে হয়তো সে রূপান্তর সম্পূর্ণতা লাভ করতো। কিন্তু সেটা সম্ভব না হবার ইতিহাসে পরে আসছি।

গণসংহতির সৃষ্টির জন্যে কমিউনিষ্টদের সহযোগিতা যে একান্ত কাম্য

এটা বুঝেই সান্ কমিউনিষ্টদের সাথে এক সন্ধি করেন। জাতীয় একতার দিক দিয়ে এর চেয়ে মূল্যবান্ যে আর কিছু হ'তে পারত না চীনের ভবিষ্যৎ ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে। কমিউনিষ্টরা জানত, চীনের বর্তমান অবস্থায় কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প অবান্তর। শূণ্যে সৌধনির্মান কমিউনিজম নয়—ফাঁকা আকাশ সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান হ'তে পারে না। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা—এতুয়ের চাপে চীনের মৃত্তিকার স্বাধিকার ফিরিয়ে আনাই প্রধান সমস্যা। সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতেও মাটির প্রয়োজন—সেই মালিকানা যদি বিদেশীর হাতেই রইলো তবে সমাজতন্ত্রের জন্ম হবে কোথায়? তাই, কমিউনিষ্টরা বুঝেছিলো, গণতান্ত্রিক চীনের অভ্যুদয়ের জন্যে সান্ ইয়াৎ সনের Three Principlesই হ'চ্ছে প্রাথমিক সর্ত। চীনে সোভিয়েটের জন্ম সম্ভব হলেও আজ অবধি কমিউনিষ্ট পার্টি গণতান্ত্রিক চীনের জন্মের প্রতীক্ষায় সেই সান্মিন্ চিউ নীতিকেই আঁকড়িয়ে আছে, এবং কুয়োমিনটাঙ্ও যাতে সেই নীতির বাইরে পদক্ষেপ না করে সেদিকে তার পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

তাই, গণতান্ত্রিক ঐক্যের নিরীখে সান্ ইয়াৎ সেন্ আর কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতামূলক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। সান্ জানতেন চীনা গণতন্ত্রের পূর্ণতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অপরিহার্য ধাপ :—(১) প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদ, (২) জনগণের স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা (গণপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে), (৩) জনপ্রিয় নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু, এতগুলো ধাপ পাড়ি দিতে যে সময়ের প্রয়োজন সান্ ইয়াৎ সেনের হাতে অত সময় ছিলো না। গণতন্ত্রের তাগিদের চেয়ে মৃত্যুর কঠোর তাগিদে একদিন চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা অনস্তিত্বের অন্ধকার পথে

লীন হয়ে গেলেন। চীনের ইতিহাসে তাঁর অবদান স্মরণ করে আজও লোকে শ্রদ্ধায় আর্দ্র হয়ে উঠে। লেনিনের সমাধি যেমন শোষিত মানবসমাজের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, তেমনি সানের পবিত্র সমাধিও চীনের দেশপ্রেমিক নরনারীর অনির্বাণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করে থাকে। ইতিহাসের যে দায়িত্ব পালনের ভার নিয়ে সান্ চীনের মাটিতে এসেছিলেন, তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েই তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সরে গেছেন। কিন্তু তাঁর অশরীরী পবিত্র ও বলিষ্ঠ স্মৃতি আজও ছায়ার মত যুযুৎসু চীনের সাথে সাথে ফিরছে। স্থূল জীবনের পটভূমিকায় যে কীর্তি তিনি রেখে গেছেন, সূক্ষ্ম স্মৃতির আড়ালে তার মূল্য আজ আরও বেড়েছে—নইলে, সানের সেই San Min Chu অথবা Three Principles আজও চীনের পরম লক্ষ্য বলে নির্ধারিত হ'তো না। চীনের ভাঁড়ারে তিনি যে সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন তার অপব্যবহার হয়নি একথা বলা খুবই অন্যায় হবে। অপব্যবহার তার খুবই হয়েছে; এই ইতিহাস যখন নতুন করে লিখছি তখন খবর এসেছে এবং অনবরতই আসছে, সানএর সান মিন চিউকে অস্বীকার করবার জন্য শত্রু আজ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিনের ক্ষয় ও ক্ষতি তাকে কিছুমাত্র শিক্ষা দিতে পারেনি। এই নীতিকে রক্ষা করা আজ শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক নীতি। তাই, তার প্রায়শ্চিত্ত চীনকে করতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ চীনাবাসীর সাদা কঙ্কালের সমাধিতে। এ প্রায়শ্চিত্তের ইতিহাসই চীনের সব চাইতে বড় কলঙ্ক, অথচ সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা সেই কলঙ্কিত প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আজকের ঐক্যবদ্ধ চীনের দিকে তাকিয়ে তার সমর্থন পাওয়া যায় এবং একথাও বলা চলে—সানের প্রদর্শিত পথে, অথবা আরও ভাল করে বলা যায়, সামাজিক বিবর্তনের সঠিক প্রতিনিধি হিসেবে জনশক্তির যে রূপান্তর তিনি প্রতিফলিত করেছিলেন জাতীয়

কর্মধারার মধ্যে—সে পথের রেখা ধরে সেই কর্মধারার উদ্দিষ্ট পথেই নবীন চীনের মুক্তি-অভিসার চলেছে। মহামানবের মুক্তির পথের সাথে মহাচীনের নির্বিকল্প জীবনের পথ এক হয়ে মিলে গেছে। এ মহামুক্তির মাহেন্দ্রক্ষণে সানের প্রোজ্জল স্মৃতি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে।

চীনা ধনিকের ভূমিকা

চীনের জাতীয় আন্দোলনে চৈনিক ধনিক গোষ্ঠীর ভূমিকা কম বেশী দুর্বলতর। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ তার সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। চীনের সামন্ত-জমিদারদের বৈপ্লবিক ভূমিকা, অন্যান্য দেশের মতই, প্রায় শূণ্যের কোঠাতেই বলা চলে। কেননা, গণআন্দোলনের নিম্নতম দাবীও এদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য। সামন্তব্যবস্থার উচ্ছেদই গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক সর্ত। তাই, ১৯১১ সালের বিপ্লবের পরেও সান্ ইয়াৎ সেন বলেছিলেন, "The Revolution has yet to be fought out, comrades hold on". এই সর্তের বিরোধিতা করাই চীনা সামন্তের প্রধান কাজ। তাই, জাতীয় আন্দোলনকে বরাবরই সে তার মৃত্যুর দূত বলে মনে করে এসেছে। একমাত্র বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক যদি কোনদিন চীনের পরিপূর্ণ গ্রাসের সম্ভাবনা দেখা যায়, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই সে জাতীয় আন্দোলনের বিশেষ কর্মপদ্ধতির সাথে কিছুটা খাপ খাওয়াতে পারে। এর আগ পর্যন্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক স্বার্থসংঘাতে চীনের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির সম্ভাবনা থাকেনা; তাই, চীনা সামন্ত-জমিদারদের জাতীয়

আন্দোলনের সাথে হাত মেলানোর কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি—বিশেষত, তখন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ধ্বনি ছিলো সামন্ত ও জমিদার-ব্যবস্থার পূর্ণ উচ্ছেদ। জাপান কর্তৃক চীনের পরিপূর্ণ গ্রাসের সম্ভাবনার পর থেকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ এক কর্মপদ্ধতির স্তরে চীনা সামন্ত ও জমিদার ভাসা ভাসা ভাবে জাপ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনে সহযোগিতা করে; কিন্তু জাপানের জয়লাভের সম্ভাবনা পিছিয়ে যাবার সাথে সাথেই তার স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। চীনের জাতীয় প্রতিরোধের সাম্প্রতিক সঙ্কট এরই আলোকে বুঝতে সুবিধা হবে বলে মনে হয়।

সামন্ত-জমিদার বাদ দিলে চীনের ধনিক গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে চীনের বণিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর জন্ম সাধারণত বিদেশী মালের দালালি করেই,—এর স্বাধীন কোন সত্তা নেই—বিদেশী বণিকের স্বার্থের সাথেই এর স্বার্থ জড়িত। একে বলা হয় comprador. বিদেশী পণ্যের কাট্‌তি হওয়াতেই এর স্বার্থ। তাই চীনের জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করাই এর স্বার্থ। বিদেশী পণ্য বয়কট আন্দোলনের সময় বিদেশী স্বার্থের পাশে দাঁড়িয়েই এরা লড়েছে।

এখন বাকী থাকলো আর এক শ্রেণী—সে হচ্ছে চীনের National Bourgeoisie. নামে National হলেও কাজে Anti-national স্বার্থেরই পরিপোষকতা করেছে সে বেশী। কেন? তা বলছি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর কতকটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একদিকে সামন্ত-জমিদার, অন্যদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাথেও এর স্বার্থগত যোগাযোগ থেকে গেছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে নিজস্ব কারখানা, জমিদারী, মালিকানা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে তার টাকা খাটে। ফলে, কখনও

বিদেশী বণিকের স্বার্থ, কখনও জমিদারী স্বার্থ, কখনও জাতীয় ধনিক স্বার্থ তার নিজস্ব স্বার্থ হয়ে ওঠে। ফলে, তার নীতিও হয়ে উঠেছে দুমুখো। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে বড় বেশী ঘা পড়লে অথবা জমিদারী স্বার্থ উচ্ছন্নে যাবার সম্ভাবনা দেখা গেলে তার ক্রিয়াকলাপ হয়ে ওঠে জাতীয়তা বিরোধী। আবার নিজস্ব কলকারখানার স্বার্থও তার আছে এবং এই স্বার্থের দায়েই সে জাতীয় আন্দোলনের আনুকূল্য করতে বাধ্য হয়। তার দোদুল্যমান নীতির এই হলো মূল পরিচয়। এই পরিচয় চীনের জাতীয় ইতিহাসে সে রেখেছে। এই পরিচয় শুধু চীনের জাতীয় বুর্জোয়ার বৈশিষ্ট্য নয়—সমস্ত ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারই এটা স্বরূপ। কেননা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ কখনও জাতীয় বণিকের অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারে না,—সহযোগী ছোট অংশীদার হিসেবে সে জাতীয় বণিককে সহ্য করতে তবু রাজী আছে। অবশ্য, সেটুকুও নিজেরই স্বার্থে—জাতীয় আন্দোলনের কাটল হিসেবে। আর, ওকে ভয়ও তার আছে—কেননা, জাতীয় বৃক্ষের রসপুষ্ট ফুলই হচ্ছে জাতীয় বণিক।

চীনের জাতীয় বণিকের জন্ম প্রধানত মহাযুদ্ধের আবর্তে। যুদ্ধের বিপাকে পাশ্চাত্য বণিক যখন প্রাচ্যের বাজারে অসহায় বিক্রেতা, তখন তার সেই অসহায়তার সুযোগে জাতীয় বণিক মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠে। এই বণিক অর্থনীতির প্রকাশ হ'লো May 4th এর সংস্কৃতির আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। ক্রমে বণিকের সাথে সর্বহারা শ্রমিক এবং তারই সাথে তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হলো (১৯২১)। বণিকরূপের ভিতর দিয়ে বিশ্বরূপ প্রকাশ হলো চীনের জাতীয় জীবনে। জাতীয় আন্দোলন আরও খানিকটা জটিল হয়ে উঠলো। এর পর থেকে জাতীয় আন্দোলনের গতিশীলতাও যেমন বাড়ে, জটিলতাও তেমনি

বেড়ে চলে। সান্ এই বলিষ্ঠ সর্বহারাদের মুক্তির vanguard হিসেবে গ্রহণ করলেন। জাতীয় বণিকের ধনস্ফীত ললাটের এক প্রান্তে একটা আশঙ্কার কুঞ্চনরেখা জেগে উঠলো।

দুর্যোগের আবর্তে

সান্ ইয়াৎ সেনের মৃত্যু চীনের জাতীয় জীবনে এক চরম অভিশাপ। পরম মুক্তির পথে অরাজক অন্ধকারের যে স্তব্ধতা ঘনিয়ে উঠলো সানের মৃত্যুর ক্ষণে, তার চেয়ে হিংস্র ইতিহাস চীনের হলুদ মৃত্তিকা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেছে কিনা সন্দেহ। একে বিপ্লবী চীন অজ্ঞ ছিলো, বর্বর ছিলো—অনৈতিহাসিক দিনের অন্ধ মোহে জীবন তার স্তব্ধ বনানীর মত নিস্পন্দ ছিলো সত্য—কিন্তু গতির সজীব স্পর্শ পেয়েও তার জীবনে যখন সচেতন অচলতার কুটিল ইঙ্গিত ফুটে উঠলো, তখন তার চেয়ে করুণ, তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হ'তে পারে না।

সান্ ইয়াৎ সেনের মন্ত্রশিষ্য চিয়াংকাইশেক তাঁর রাজনৈতিক গুরুর সব সৃষ্টিকেই অগ্রাহ্য করতে চাইলেন। গণজীবন যখন সচলতার উচ্ছলতায় এগিয়ে যেতে উন্মুখ, তখন তিনি সেই এগিয়ে যাবার পথে চীনের আর একটা নতুন অদৃশ্য প্রাচীর খাড়া ক'রে তুললেন। সানের মৃত্যুর পরেও একবছর পর্যন্ত তিনি জাতীর ঐক্যকে বজায় রেখেছিলেন বটে—কিন্তু, ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে এবং চীনের মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের

চক্রান্তে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের সৃষ্ট পথ থেকে সরে গেলেন। অন্ধ গলিঘুঁজির পথই তথন তাঁর সহজ পথ হয়ে উঠলো—তাই, মুক্তিকামীর বুকে পথের বোঝাই ভারী হ'য়ে উঠলো। লক্ষ্য ছেড়ে পথের মাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কাজে চিয়াং উঠে পড়ে লাগলেন। এর আগের সৃষ্টির ইতিহাসটুকু না জানলে এ অনাসৃষ্টির সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে না।

সান্ ইয়াৎ সেনের সময় যে ঐক্যের জোয়ার এসেছিলো তারই শক্তিতে পুষ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট চীনের সর্বত্র নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েমী করার কাজে লাগেন। সোভিয়েট দূর প্রাচ্যের রহস্যময় সেনাপতি ব্লুচারের (Bluchar) কর্মকুশলতায় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ফৌজ তথন প্রশংসনীয় যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করেছে। তার সামনে দাঁড়াবার দুঃসাহস কোন war-lordএরই হলো না। একের পর এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশ অখণ্ড চীনের শাসন ক্ষমতা মাথা পেতে মেনে নিল। অবশ্য, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট-ফৌজের বিজয় অভিযান সহজ হবার অন্যান্য কারণও ছিল। সৈন্যদের আগেই থাকত রাজনৈতিক প্রচারকারীর দল—তারা আগে থেকেই অত্যাচারী মহাজন, জমিদার, war-lordদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জনসাধারণের চেতনা বাড়িয়ে তুলতো এবং তাদের পেছনে যে শোষিত জনসাধারণের মুক্তির জন্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ফৌজ আসছে একথা জানাতে তারা ভুলতো না। ফলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সৈন্যদের জয়লাভ করতে মোটেই বেগ পেতে হতো না।

মহাজন, জমিদার আর war-lordদের অত্যাচারে চীনা জনসাধারণ জর্জর হয়ে উঠেছিলো। উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই খাজনা আর ট্যাক্সের কল্যাণে নিঃশেষ হ'য়ে যেতো—কিন্তু তবু তার রেহাই ছিলো না। 'war-lord'দের যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য নিজেদের ছেলেদের কামানের থাবার হিসেবে পাঠাতে হত। এইভাবে কেউ কামানের

মুখে, কেউ দুর্ভিক্ষের গ্রাসে, জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার ইতিহাস রেখে যেত।

তাই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যখন সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ বাসায় আঘাত হেনে হেনে বেড়াতে লাগলো, তার বহু আগেই সেই সব বাসা জরাজীর্ণ হ'য়ে ঝ'রে যাবার প্রতীক্ষায় কোনরকমে খাড়া ছিলো। এইভাবে শক্তিশালী সামন্ত ও সমরনেতাদের ধ্বংসের সঙ্গে Hankowএ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। Borodin এই গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা ছিলেন।

কিন্তু এ সময় থেকেই সঙ্কট সুরু হয়। Kuomintang দলে তখন দুরকম মতবাদী লোক ছিলো—একদল ছিলো, এবং এদের প্রাধান্যই ছিলো বেশী, যারা আমেরিকার মত চীনের গণতন্ত্রের কাঠামো সৃষ্টি হোক্, চীনের বিদেশী শোষণের অবসান হোক এটা চাইতো—কিন্তু এরা বেশীর ভাগ জমিদার, মহাজন ইত্যাদি হবার ফলে ভূমিব্যবস্থা ইত্যাদির পরিবর্তন চাইতো না। কিন্তু অন্য আর একদল, যারা বামপন্থী বলে পরিচিত—এরা অধিকাংশই সাম্যবাদী দৃষ্টিসম্পন্ন। এরা চীনের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলো, চীনের প্রধান সমস্যাই কৃষি সমস্যা। কৃষি বিপ্লবের দ্বারা এ সমস্যার প্রতিকারের উপরই চীনের সামাজিক রূপান্তর নির্ভরশীল। চীনের বুকে যে আন্দোলনই জাগুক না কেন এর অগ্রগতি নিঃস্ব কৃষকের সমর্থন বা সহযোগিতা ছাড়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। এই সব নিঃস্ব কৃষকের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র জমিরই সমস্যা। জমির ক্ষুধাই এদের প্রধান ক্ষুধা। স্বাধীনতার ক্ষুধার সাথে এই ক্ষুধার সমন্বয়েই শুধু চীনের মহা-পরিণাম মহান্ এবং শুভ হতে পারে। তাই, এই বামপন্থীদল কৃষি-সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকতে পারে নি।

কুয়োমিনটাঙ্-এর মধ্যে এই মত-বৈষম্যই ক্রমে মন-বৈষম্যের রূপ

নিলো। কিন্তু, এই বৈষম্যের আগুন তখনও তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছিলো—আগুনের ইঙ্গিত ছিলো শুধু ধোঁয়ায়। তবু কাজ তাতে একেবারে অচল হয়নি। সাংহাইএর দখল সম্ভব হবার পরেই তুষের আগুন হঠাৎ বনের আগুনে পরিণত হয়।

চিয়াংকাইশেক সাংহাই দখল করেছিলেন বটে, কিন্তু সে কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে কমিউনিষ্টদেরই। কমিউনিষ্ট চাউ এন্ লাই আগে থেকে সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে এক অদ্ভুত সংগঠন গড়ে তোলেন ; এক ব্যাপক মজুর ধর্মঘট সাংহাইএর ভিত্তি নড়িয়ে দেয়। এমনি সময় চিয়াং সসৈন্যে এবং একরকম বিনা বাধায় সাংহাইয়ে প্রবেশ করেন। মনের দিক থেকে যে-দখল আগেই হয়েছিল—চিয়াংএর সৈন্য সে দখল বাস্তবে পরিণত করলো। অথচ, যাদের কৃতিত্বে এ সফলতা সম্ভব হলো, যাদের অক্লান্ত কর্মশক্তি এবং সুকঠোর সংগ্রাম কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কায়েমী করার দিক দিয়ে প্রধান সহায় হয়েছিলো, সাংহাই দখলের পর চিয়াং তাদের বিরুদ্ধেই তাঁর প্রধান সংগ্রাম সুরু করলেন। এ যেন পাহাড়ী নির্ঝরের জলের অস্তিত্বকে উপেক্ষা। আপন সৃষ্টির ইতিহাসকে চিয়াং রক্তের অক্ষরে ঢাকতে চাইলেন। যে সৃষ্টির বন্যা মহাচীনের বুকে পলিমাটির ফসলের ইঙ্গিত দিচ্ছিলো—সেই বন্যাই হঠাৎ যেন ধ্বংসের উদগ্র নেশায় মেতে উঠলো।

এ নেশা সখের নেশা নয়—এ অপরিকল্পিত নেশা নয়। এ নেশার পেছনে ছিলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা। গণজাগরণের আলোড়নে যখন চীনের মাটিতে কম্পন ধরেছে তখন সে কম্পনের প্রতিধ্বনি মুষ্টিমেয় ধনিকের বুকেও পৌঁছয়। রক্ষিত স্বার্থের আপন দুর্বলতা সম্বন্ধে এরা সজাগ ছিলো। শ্রমিক ধর্মঘট, কৃষক জাগরণ—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে তারা স্বাগতম্—কিন্তু যখনই সেই শ্রমিক এবং কৃষক তাদের

নিজস্ব পীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে তখনই মালিকের সামনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বিজয়ও অনাগতম্ হয়ে ওঠে। নদীর স্রোত যখন পলিমাটির বন্যা ঢেলে দিয়ে যায় তখন সে মঙ্গলেরই প্রতীক হয়ে ওঠে—কিন্তু সেই স্রোতের আবর্তে যখন শতাব্দীর জরাজীর্ণ হর্ম্য মর্মরিত হয়ে ওঠে তখন সেই হর্ম্যের মালিকের উৎকণ্ঠিত মর্মে ঘর্ম দেখা দেবার কথা।

রক্ষিত স্বার্থের কুটিল চক্রান্তের প্রতিনিধি হিসেবে চিয়াং বুঝেছিলেন, যে গণশক্তি তার সাংহাই, বিজয় সম্ভব করলো—সেই গণশক্তিই যখন সাংহাইএর মত ধর্মঘটে উন্মত্ত হয়ে উঠবে, তখন তাঁদেরই শ্রেণী-স্বার্থের পাঁজর তাতে চূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি জানতেন জনসাধারণ একবার যদি আপন শক্তির সন্ধান পায় তবে সেই শক্তির তাগিদে সে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে দৃকপাত করে না। গণক্রিয়ার উপসর্গের মধ্যে মালিক শ্রেণী এই আভাস পেয়েই চিয়াংকে বিপ্লব মূলতুবী রাখতে বাধ্য করায়। সাংহাইএর ধর্মঘটে তাদের সে অভিজ্ঞতা জন্মে। আরও একটা বড় ঘটনায় চীনা ধনিকশ্রেণীর এ আশঙ্কা দৃঢ় হয়ে ওঠে। সে ঘটনাই বলবো।

কমিউনিষ্টরা যখন ক্যান্টন কংগ্রেসে কুয়োমিনটাঙ্এ ঢোকা সাব্যস্ত করে তখন তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো Northern Militaristsদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রধান বিঘ্ন, গণতন্ত্রের প্রবল শত্রুর প্রতিরোধ বিচূর্ণ করা। গণতন্ত্রের প্রকৃত বনিয়াদ তৈরী করার উদ্দেশ্য নিয়েই কমিউনিষ্ট পার্টি কুয়োমিনটাঙ্এর সাথে United Front গড়ে তোলে। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি তখনও কৃষি বিপ্লবের দিকে তত নজর দেয় নি। এখানে মাও সে তুংএর সাথে Partyর মতপার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই, মাও এক জায়গায় বলছেন—I was very

dissatisfied with the party policy then, especially toward the peasant movement. I think today that the peasant movement had been more thoroughly organised and armed for a class-straggle against the landlords, the Soviets would have had an earlier and far more powerful development throughout the whole country."

কমিণ্টার্ণও তখন মাওএর নীতির বিরোধী ছিলো। তাই Hankowএর Wuhan Coalition Government ভেঙ্গে যাবার কোন কারণই তখন ঘটে নি। কিন্তু মানবেন্দ্র রায়ের অপরিণামদর্শিতায় যে ভাঙ্গন অনিবার্য ছিলো, অথচ যাকে আরও কিছুদিন রোধ করা চলতো, সে ভাঙ্গন চকিতে ঘটে গেলো। Edgar Snow এক জায়গায় বলেছেন, "...But in the end it was Roy who forced the break with the Kuomintang. The Comintern sent a message to Borodin, ordering the party to begin confiscation of the landlord's land. Roy got hold of a copy of it and promptly showed it to Wang-Ching-Wei, the the chairman of the Wuhan Government."

অবশ্য ওয়াং চিং ওয়েই বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন নাকি রায়ের, তাই এই রকম ভয়ানক অবিশ্বস্ততার কাজ তিনি করে বসেন যা পরিশেষে একটা দেশের ইতিহাসই পাল্‌টে দিল কিছুদিনের জন্য। মাওয়ের ধারণা অনুযায়ী,···"Objectively, Roy had been a fool, Borodin a blunderer and Chen an unconscions traitor"—বাস্তবের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে রায় ছিলেন নির্বোধ, বোরোডিন ভ্রান্ত আর চেন ছিলেন অচেতন বিশ্বাসঘাতক।

রায়ের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব খবর খালাস হয়েছে তার সাথে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ গ্রন্থকার Edgar Snowর পরিমার্জিত ভাষা আর একটু যোগ করলে রায়ের প্রতি অবিচার করা হবে বলে আশঙ্কা হয় না।

Snow সাহেব লিখছেন (ধারণাটা অবশ্য মাওএর)—"Roy the Indian delegate of the Comintern stood a little to the left of both Chen and Borodin, but he only stood. He could talk and he talked too much without any method of realisation."—

যাক্—রায়ের এই বেফাঁস কাজের ধাক্কা সামলাতে চীনের কত বছর কেটেছিলো সেটা পরে আমরা আলোচনা করব। আপাতত দেখা গেলো এই telegraph প্রকাশ হবার পর থেকে বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ গভীরতর হয়ে উঠল।

রক্ত আর আগুনের অধ্যায়

পারস্পরিক যোগসূত্র ভেঙে যাবার পর নানকিংএ চিয়াং পরিচালিত দক্ষিণপন্থী গবর্ণমেণ্ট খুঁটি গাড়লো। অপ্রস্তুত কমিউনিষ্ট দল নানকিং-বিরোধী জনাংশকে নিয়ে দক্ষিণে কিয়াংসি প্রদেশে গিয়ে রক্তরাঙা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী হতে লাগলো। সৈন্যদলের অফিসাররা চিরকালই কায়েমী স্বার্থের ভক্ত ; তাই, ভক্তির উচ্ছ্বাসে তারা চিয়াংএর সেবাইৎ হয়েই রইলো। আর সাধারণ সৈন্যের (যারা ছোট বড় নানা

নির্যাতনের জন্যে অফিসারদের ওপর রুষ্ট থাকে এবং যাদের নাড়ীর সংযোগ সাধারণত চাষী-মজুরের সাথে) অনেকেই কমিউনিষ্টদের পক্ষে থেকে গেলো।

এইভাবে ক্রম-অগ্রগতির পথে গণতন্ত্র ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেলো। এক ভাগ বিকৃত হয়ে নাৎসী জার্মানীর মত সামরিক একনায়কত্বের (বুর্জোয়া পরিচালিত) রূপ নিলো আর এক দল গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্যে শক্তির সাধনায় মেতে উঠলো। এই দুই পরস্পর-বিরোধী পথের সংঘর্ষে চীনের জীবন আর একবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। হত্যা আর জিঘাংসাই আগামী দিনের পরিচয় হয়ে উঠলো শুধু। কিন্তু, এই পরিচয়কে ছাপিয়েও সত্যিকার গণতন্ত্রের যে ভ্রূণ অলক্ষ্যে সৃষ্টি হলো বারুদ আর হত্যার গন্ধের ভেতর দিয়ে, সেই ভ্রূণই আজকের অপরাজেয় গণতান্ত্রিক চৈনিক যুবকের রূপান্তরিত অবয়ব। দীর্ঘদিনের দুর্যোগ তার লৌহপেশীর উপর অপরাজয়ের নিশানা রেখে গেছে। আগামী দিনের চীনের ইতিহাস একদিকে লালচীনের দুঃসাহসী বিজয়বার্তায় গৌরবময়; আর একদিকে, চেম্বারলিনী ছাঁচে চিয়াংকাইশেকী চীনের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং জাপ ফ্যাসিষ্টবাদের গোলামীর কলঙ্কে পূর্ণ।

গৃহযুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে চিয়াংএর জীবন একটানা কমিউনিষ্ট আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। একদিকে শ্রেণীস্বার্থের দুর্বলতায় অন্যদিকে বিদেশী বণিকের অন্ধ চক্রান্তে বিশুদ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি তাঁর ম্লান হ'য়ে পড়েছিলো। তাই, অরাজক আবেগের অন্ধ তাড়নায় তিনি তাঁর অগ্রগতির পথে ধ্বংস আর হত্যার স্বাক্ষর রেখে গেছেন—পেছনে হটবার সময়ও ধোঁয়া আর ধূলোয় নিজ অপকৃতি প্রচ্ছন্ন করে গেছেন। তাঁর নিষ্ঠুরতা কত উদগ্র হ'তে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। এক Hsu বংশের ছিষট্টিজন লোককে তিনি অমানুষিকভাবে হত্যা করেন। যে

সমস্ত মেয়ের বব্ করা চুল এবং স্বাভাবিক পা থাকতো (পুরাতনপন্থী চৈনিক পরিবারে মেয়েদের পা কাঠের জুতোয় পুরে রাখা হ'তো যাতে বাড়তে না পারে—কেননা ছোট পাই নাকি সেখানে সৌন্দর্যের আকর) তাদেরই কমিউনিষ্ট বলে গুলি করে মারা হ'তো। কমিউনিষ্ট অপবাদে যে কত ঘৃণিত জঘন্য কাজ চীনের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। চিয়াংএর ধ্বংসের অভিযান এমন চরমে পৌছয় যে কুকুরগুলো পর্যন্ত প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কমিউনিষ্টরা শত্রুসৈন্যের সন্ধান পাবার ভালো এক নিশানা বের করেছিলো। যেখানেই দেখা যাবে আকাশের মাথায় ধোঁয়া, বোঝা যাবে সেখানেই শত্রু সৈন্য উপস্থিত হয়েছে। এ ধোঁয়া আর কিছুই নয়—চিয়াংএর প্রতিহিংসার আগুনে বিধ্বস্ত গ্রাম আর সহরের ধ্বংসের চিহ্নই জ্বলন্ত সহর বা গ্রামের মাথার আকাশে ধোঁয়ারূপে ছেয়ে থাকত। কমিউনিজ্মের সাথে কোন সম্পর্ক নাই এমন সব নিরপরাধ-নিরীহ নরনারীও চিয়াংএর ঝক্ঝকে ইস্পাতের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তাদের সংখ্যা শত সহস্র নয়—তারা লক্ষ লক্ষ।

কমিউনিষ্টদের "Intellectual Bandid" বা বুদ্ধিজীবী দস্যু বলা হ'তো। বিষাক্ত গ্যাস সভ্যতার নিরীখে নৃশংস সমরবিলাসীদের হাতেও আজ অচল হয়ে আছে—অথচ, চিয়াং সেদিন এই নিরস্ত্র দেশপ্রেমিক 'Bandit' (?) দের উপর এর নির্বিচার প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। লাল আতঙ্কের হাত থেকে সভ্যতাকে বিপন্মুক্ত করবার এরকম অসভ্য উপায় বহুদিন থেকে শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিরা বহু জায়গায়ই প্রয়োগ করে এসেছেন—কিন্তু, কমিউনিষ্টরা যখনই সভ্য উপায়ে তার প্রতিরোধ করতে গেছে তখনই সেসব হয়ে উঠেছে জগতের মধ্যে জঘন্যতম বর্বরতা—যাকে লাল বর্বরতা বলেই বলা হয়ে থাকে। এই

লাল বর্বরতার আতঙ্ক তুলে ব্রিটেনের শাসকগোষ্ঠী 'Zinoviev letter' নামে একখানা জাল চিঠি ছেড়ে নির্বাচনে জিতেছিলেন। শ্রমিক মন্ত্রীসভা সে নির্লজ্জ মিথ্যার সামনে টিকতে পারে নি—সেকথা সবাই জানে—কিন্তু, এই জাল চিঠি ছাড়ার প্রয়োজন কেন হয়েছিলো জেনেও হয়তো অনেকেই সেকথা না জানার ভান করেন।

যাই হোক, একদিন চেম্বারলীন যে আতঙ্ক তুলে ধরে জার্মাণীকে কাছে টেনেছিল, তেমনি জাপানও সেই একই কথায় চিয়াংকে কাবু করেছিল। তাই, মাঞ্চুরিয়ার তেল, কয়লা, তুলো, লোহা, শয়াবীন্ দুই হাতে লুঠতে লুঠতে জাপানী ধনিককুল ফ্যাসিষ্ট জাপানের কমিউনিষ্ট আতঙ্কের আওয়াজের তারিফ করেছে যেমন, দ্বিধাগ্রস্থ চিয়াংএর আচ্ছন্নতাকেও তেমনি বাহ্যিক অভিনন্দন জানাতে ভোলে নি তারা। উৎসাহের আধিক্যে চিয়াং নিজের হৃদপিণ্ডে চাকু চালাতেও দ্বিধা করেন নি সেদিন। তাই, অকথ্য অত্যাচার আর নিপীড়নের মধ্য দিয়ে তিনি দেশকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন—অথচ, দেশ আজও পরম বিশ্বাসে তাঁর রক্তাক্ত হাতে চীনের পরিচালনার ভার তুলে দিতে দ্বিধা বোধ করে নি। অতীতের কোন গ্লানিই ভবিষ্যৎ মহাসৃষ্টির সম্ভাবনাকে নাকচ করবার মত আবিলতা জাতীয় মনে সৃষ্টি করতে পারে নি। রক্তের মধ্য দিয়েই যে নতুন দিনের সূর্যোদয় হয় এ শিক্ষা এই মহাজাতির ছিলই।

নানকিং গবর্ণমেণ্ট ও ঘরোয়া লড়াই

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদই চিয়াং-পরিচালিত নানকিং গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মতালিকা হ'য়ে উঠলো। কুয়োমিনটাং বিপ্লবের অনুপ্রেরণা প্রধানত ছিলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের মধ্যে। চীনা জনসাধারণের এই মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্যই নানকিং গবর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের আস্থা গড়ে ওঠে। এই আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত নানকিং গবর্ণমেণ্ট যখন চীনাজাতির আসল লক্ষ্যের দিকে না এগিয়ে জন-সাধারণের ঐক্যের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী হাতিয়ার কমিউনিষ্টদলের ধ্বংসের প্রেরণায় মেতে উঠলো—তখন সমস্ত দেশ চকচকিয়ে গেলো। মহান্ বিপ্লবের উত্তরাধিকার যে এমন উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, চীনের গৌরবময় জাতীয় সংগ্রাম যে এমন ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে কেউ ভাবতে পারে নি। এক অখণ্ড চীনাজাতির সৃষ্টির শিখর দেশে পৌঁছে হঠাৎ এই পদস্খলনের অর্থ কি, সদ্য-জাগা চীনাজাতির চোখে সেটা ধাঁধাঁর মতই ঘোরালো মনে হ'য়েছিল। কিন্তু, আরও একটু তলিয়ে বুঝলে তারা বুঝতো, এ পদস্খলন হঠাৎ হয় নি—পরিকল্পিত ব্যবস্থার এ এক নিখুঁত অভিনয় মাত্র। দেশে দেশে এ অভিনয়ের অভাব নেই।

ওদিকে জাপানী দৌরাত্ম্যের কালো মেঘ নিদারুণ প্লাবনের আশঙ্কা নিয়ে মাথার ওপর ঝুলছে, পাশ্চাত্য স্বেচ্ছাচার হিমাদ্রির মত অটল হয়ে রয়েছে, এদিকে নানকিং গবর্ণমেণ্টের শাণিত ছুরি দেশের মর্মের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঝড়ো হাওয়ায় পথ চলবার শক্তি তখন প্রলাপের বিকৃতিতে রূপান্তরিত। তাই, জাতীয় নিশ্চিহ্নতার আশঙ্কা সৃষ্টি করেও

জাপান বন্ধুর মতই ব্যবহার পেল ; দেশের জন্য এক ব্যাপক অনশন আর অর্দ্ধাশন সৃষ্টি করেও পশ্চিমী স্বার্থবহের রাজকীয় সম্বর্ধনার অভাব হয় নি। অনেকে বলবেন, ও চিয়াংএর একটা চাতুরী—দুষ্ট বন্ধুদের থামিয়ে রাখার একটা উপায় মাত্র। কমিউনিষ্টদের সাথে তিনি লড়েছেন ঠিকই, হত্যার অভিযোগও তাঁর ওপর চাপানো চলতে পারে, কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্যই ছিলো প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সম্মিলিত শোষণের পথ বন্ধ করার জন্য শক্তি সংগ্রহ করা। চিয়াংকাইশেকের নতুন শিক্ষিত সৈন্যরা এইভাবেই তাদের হাত পাকিয়ে তাদের নতুন শিক্ষার পরীক্ষা করেছে। কিন্তু, রক্ত ঝরে পড়া যে শক্তিবৃদ্ধির উপায়, এ ধারণা পৌরাণিক কাহিনীর মতই আজগুবি। জনসাধারণের মাথায় দুঃসহ খাজনা আর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যের যারা সেরা সৈনিক তাদের উচ্ছেদ ক'রে, বিদেশী শাসন ও শোষণের সামনে মাথা একটু একটু ক'রে পেতে দিয়ে যে শক্তি বৃদ্ধি হয় সামরিক শাস্ত্রের এ এক নতুন অবিষ্কার হয়তো। কিন্তু, বেসামরিক মহল (যারা অবধারিতভাবে আজকের যুদ্ধজয়ের প্রধান মশ্‌লা) এ আবিষ্কারকে চাতুরী বলেই ধিক্কার দেবে। আসলে, জাপানী পুঁজিবাদী ও পাশ্চাত্য ধনিকবাদী গোষ্ঠীর সাথে চিয়াং-পরিচালিত মুষ্টিমেয় বর্ধমান চৈনিক ধনিকের নাড়ীর যোগাযোগের ক্ষেত্র এক জায়গায় ঠিকই মিলেছিল—সেটা হচ্ছে তাদের পবিত্র সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে। চৈনিক ধনিককুল জানতেন, বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে জনগণই একমাত্র হাতিয়ার—কিন্তু সে হাতিয়ারের আঘাত এতই তীব্র যে তার কম্পনের প্রত্যাঘাতেও কাছের দালানে ফাটল ধরে। যে সৌধ তাঁরা এত পরিশ্রম ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন পরগাছা তুলতে গিয়ে যদি সে সৌধই তুলতে হয় তবে সৌধ গড়ে সত্যই লাভ কি! এই পরগাছা-ছাওয়া দালান টিকিয়ে রাখবার জেদেই প্রকৃত দালানের

সংস্কার হলো না। চীনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পরগাছা আর দালালের দ্বন্দ্বই চলছিলো। আপন দুর্বলতার ইতিহাস জানতেন বলেই চিয়াং বাইরের শত্রুর সাথে লড়াইএর ভরসা পান নি। জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের সোস্যাল ডিমোক্র্যাট নেতারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে কৃতি (অথবা দুষ্কৃতি) রেখেছেন চীনের ঘরোয়া লড়াইয়েও তারই পুনরভিনয় চলেছে মাত্র।

এ সত্ত্বেও নানকিং গবর্ণমেণ্টকে কুয়োমিন্‌টাংএর প্রগতিশীল অংশের চাপে এবং জনসাধারণকে কমিউনিষ্ট প্রভাবের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সংস্কারের কাজ করতে হয়। প্রথমেই চিয়াং তাঁর ক্ষমতালাভের প্রধান সহায় সৈন্যবাহিনীকে উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ও শিক্ষার সাহায্যে গড়ে তোলবার দিকে মন দেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার দল এবং অসংখ্য চুনোপুঁটি war lord—যারা চীনের শাসনক্ষমতাকে লক্ষ লক্ষ ভাগে টুকরো করে রেখেছিল—তারা যখন বুঝলো কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শক্তির সামনে টিকে থাকা যাবে না, তখন তারা একে একে নতি স্বীকার করে নিল। তাদের সৈন্যদল ভেঙ্গে দিতেও তারা রাজী হলো। কিন্তু, প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক এইভাবে বেকার হয়ে পড়ে শান্তিপ্রিয় জীবিকার সুযোগ না পেলে তারা আবার দস্যুবৃত্তি করতেই আরম্ভ করবে। এই সমস্যার মীমাংসার জন্যে চিয়াংএর বহু অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি বিরাট এক করভারের ফর্দ তৈরী করলেন। কিন্তু এই কর তুলে চিয়াং বেকার সৈন্যদের সমস্যার মীমাংসার দিকেই গেলেন না। তিনি ঐ টাকার অধিকাংশই তাঁর পরিকল্পিত সৈন্যবাহিনীর জন্যে খরচ তুললেন—যারা কমিউনিষ্টদের সুনিপুণ হাতে ধ্বংস করতে পারবে।

হিসেব করে দেখা দেছে যে প্রতি কমিউনিষ্ট হত্যার জন্য চিয়াংকে প্রায় দু'লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়েছে।

এইভাবে আট কোটি ডলালের অধিকাংশই শুধু বারুদের ধোঁয়ায় নিঃশেষ হয়ে গেলো। চৈনিক ডলার যখন দেশপ্রেমিকের হত্যার রক্তে রূপান্তরিত হয়ে উঠতো তখন চৈনিক ধনিক শ্রেণী ভাবতো ডলারের ওর চেয়ে মহান সুপরিণতি হয়তো আর কিছুতেই সম্ভব হতে পারত না—এমন কি, তাঁদের ইস্পাতের সিন্ধুকে জমা হলেও নয়।

কিন্তু যুগের মুখ্য দাবীতে চিয়াং জাতির শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রগতিশীল অন্যান্য দিকে ছিঁটে ফোঁটা হলেও নজর দিতে বাধ্য হন। সমস্যা বিরাট হলেও কুয়োমিনটাং দল এবং তারই সাথে Banker, Industria-lists, জমিদার, মহাজন, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি অনেকের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ায় সমস্যা খানিকটা সহজ হয়।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শক্তি বৃদ্ধি এদের সবারই প্রায় কাম্য। দেশে অশান্তি এবং অরাজকতা লেগে থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব নয়—তাই, বণিক শ্রেণী, কলকারখানার মালিক এবং তাদের ওপরেই নির্ভরশীল নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, Bankerদল সবারই স্বার্থ এক ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করা। তাছাড়া সৈন্য-দলের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থাকার জন্য, লড়াইএর উন্নত সরঞ্জামের অধিকারে অর্থের প্রভুত্ব থাকায় ছোট ছোট উপসর্গের মত চীনের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে-থাকা war-lord-উপগ্রহের দলের ক্ষমতা আঁকড়িয়ে থাকবার মোহ ভেঙ্গে যায়। জরাজীর্ণ পুরোণো ব্যবস্থার আবর্জনাস্তূপের সাধ্য কি নতুন ব্যবস্থার মুখে টিকে থাকে। পুরোণো ব্যবস্থার মধ্য থেকেই নতুন ব্যবস্থা পাথেয় সংগ্রহ ক'রে তাকে ধ্বংস ক'রে এগিয়ে গেছে। এইভাবেই হয়েছে সমাজের পরিবর্তন, জাতির পরিবর্তন, দেশের

পরিবর্তন, কালের পরিবর্তন। পরিবর্তনের প্রচণ্ড ঘূর্ণীর সামনে কিছুই স্থির থাকতে পারে নি—এই ঘূর্ণীর বেগকে স্বীকার না করে কারও উপায় নেই। এই ঘূর্ণীর মুখেই চীনের লক্ষ প্রাচীরের আড়ালে পুরণো স্থবির জীবনপদ্ধতি দেউলিয়া হয়ে গেছে। যন্ত্রের শক্তির মুখে মান্ধাতার দিনের লাঙ্গলের ফাল এইভাবেই পরাস্ত হয়েছে। অর্থনীতিক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আগে হয়ে গেছে, তাকেই অনুসরণ করেছে সমাজের সমষ্টিগত পরিবর্তন। পরিবেশের বাধ্যবাধকতায় এ পরিবর্তন কখনও ধীর হতে পারে, কখনও তীব্র হতে পারে—কিন্তু এর শুদ্ধ হবার মত কোন সম্ভাবনাই নৈসর্গিক নিয়মে নেই।

এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক অনিবার্যতাই চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শক্তি বাড়িয়েছিলো আর এই অনিবার্যতারই মৌমাছির চাকের মত স্বয়ংসম্পূর্ণতার বেষ্টনী ভেঙ্গে গিয়ে প্রায় সমগ্র চীন এক অখণ্ড সামান্তের আওতায় এসে পড়লো। শেষ পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়ার দুর্ধর্ষ শাসনকর্তা চ্যাং-সো-লিন যখন নানকিং গবর্ণমেণ্টের চাপে পিকিং ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো তখন উত্তর দিকের চীনের অখণ্ডতা সৃষ্টির সব বড় বাধাই শেষ হয়ে গেলো।

কুয়োমিনটাংএর শক্তিবৃদ্ধিতে জাপান কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠছিলো। অনেক আগে থেকেই জাপান মাঞ্চুরিয়াকে নিজের তাঁবেদার বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। পিকিংএর দিকে নানকিং গবর্ণমেণ্টের অগ্রগতিতে সশঙ্কিত জাপানী মন্ত্রী Baron Tanaka একদিন হঠাৎ ঘোষণা করলেন—"If distarbances developed further in the direction of Peking and Tientsin, Japan may possibly be constrained to take appropriate and *effective steps* for the maintenance of peace and order in Manchuria."

মোটামুটি অর্থ হচ্ছে এই যে, পিকিংএর দিকে যদি গোলযোগ আরও বেড়ে ওঠে তবে জাপান উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। এই "effective steps" অথবা উপযুক্ত ব্যবস্থার সাথে ভারতের আমরা খুবই পরিচিত—জালিয়ানওয়ালাবাগে, পেশোয়ারে এবং বহু জায়গায়ই এর স্মৃতি রয়ে গেছে!

উপরোক্ত Baron Tanakaই Tanaka Memorial তৈরী করেন, যার উল্লেখ আজ খুবই পাওয়া যায়। জাপানী বিশ্ববিজয়ের প্রথম স্বপ্ন ওই memorial এই রূপায়িত হয়ে ওঠে—হিটলারের 'মাইন কাম্ফ' যেমন জার্মান বিশ্ববিজয়ের অগ্রচিত্র। যাক—বৃদ্ধ চ্যাং-সো-লিন পিকিন ছেড়ে যাবার পরদিনই ট্রেন ধ্বংস হয়ে মারা যান। সুবিন্যস্ত ঘটনার আলোকে কারও বুঝতে বাকী থাকলো না এই ট্রেন-দুর্ঘটনা শুধু দুর্ঘটনাই নয়, এক আগামী ঘটনার আভাস মাত্র। পীত সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তির জঘন্যতম বলি হলো বৃদ্ধ মাঞ্চুসর্দার। বৃদ্ধের হাবভাবে জাপানী সমরকর্তারা বিশেষ ভরসা পাচ্ছিলেন না। তাঁদের কেমন সন্দেহ হচ্ছিলো, বৃদ্ধ সর্দার হয়তো শেষ পর্যন্ত নানকিং গবর্ণমেণ্টের সাথে সন্ধি করে ফেলবে। তাই, গুজবের মূলোচ্ছেদ করার মত আশঙ্কার শিরশ্ছেদ করেই একেবারে তারা নিশ্চিন্ত হলো। অবশ্য সামন্তদের ভূমিদাসের স্বাধীনতার মতই মাঞ্চুরিয়ার এক হাস্যকর স্বাধীনতার আব্রুটুকুই শুধু জাপানীরা বজায় রেখেছিল। পরে সেটুকুও সরিয়ে নেয়।

কিন্তু, জাপানীরা যে মতলবে চ্যাং সো লিনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলো, সে মতলব বিশেষ হাসিল করতে দিলনা মৃত সর্দারের প্রতিহিংসা-পাগল পুত্র চ্যাং-সিউ-লিয়াং। সে বাপের হত্যার পরে নির্বিবাদে নানকিং গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে এক সন্ধি করলো।

বাপের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিহিংসার জন্যই তার সমগ্র ভবিষ্যৎ-জীবন পাগল হয়ে রইলো। মাঞ্চুরিয়ার পরাধীনতার জ্বালা সে কোনদিনই ভুলতে পারেনি তাই, নির্বাসিত মাঞ্চুসৈন্যের সাথে সে অধীর প্রতীক্ষায় চিয়াংকাইশেকের পাশে থেকেছে। সে জানত একমাত্র চিয়াংএর আশ্রয়েই সে তার নির্বাসিত দেশের মুক্তি ফিরে পেতে পারবে। মাঞ্চুরিয়ার মুক্তির জন্য তার নিজের এবং মাঞ্চু সৈন্যদের অসীম চঞ্চলতাই চীনের বুকে কি রূপান্তর এনেছে তা আমরা দেখব। আপাতত আমাদের জেনে রাখা দরকার যে আফিংসেবী, উচ্ছৃঙ্খল, বেহিসেবী চ্যাং সিউ লিয়াং স্বদেশের স্বাধীনতার লড়াইএর প্রস্তুতির জন্য হঠাৎ মিতাচারী, সংযত এবং তারই সাথে কর্তব্যনিষ্ঠ দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লো। ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হ'লেও আগামী কালের বিরাট চীনের সৃষ্টি তারই পটভূমিকায়—একথা ভুললে চলবে না।

যাক্, এইভাবে নানকিং গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে ঘনপল্লবিত গাছের মতই নতুন নতুন বিরাট এবং সমৃদ্ধ অংশ নিয়ে আয়তনে সমৃদ্ধিতে বেড়ে উঠতে লাগলো। দেশের বিরাট বিস্তৃতি চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছে চিরদিনই এক গুরুতর সমস্যা। এ সমস্যার প্রতিকারের ওপরই মহাচীনের স্পষ্ট বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যানবাহনের শোচনীয় অভাবের জন্যেই চীনের অখণ্ড ঐক্য গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নাই। চিয়াং জানতেন এই সমস্যাই ভবিষ্যৎ চীনের উপরও গুরুতর ভাবে প্রতিফলিত হবে। যতটুকু অখণ্ডতা আজ সম্ভব হয়েছে সেটাও স্থায়ী হবে না যদি চীনের ভেতরে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি না করা যায়। এরই অভাবের জন্যে চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব অত শিথিল ছিলো। Bandit-সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণও ওই। আমেরিক', সোভিয়েট রুশিয়া, চীন, ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের উন্নতি এবং শক্তি উন্নত ধরণের

যাতায়াতের ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। রেলওয়ে ব্যবস্থার সাহায্যে সোভিয়েট-আমেরিকা এর অনেকটা সমাধান করেছে; তাই ওদেরকে বলা হয় Railway States—যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বলা হয় Steamship Empire. এই Railway State এ পরিণত না হতে পারলে চীনেরও মঙ্গল নেই এ জ্ঞান চিয়াংকাইসেকের ছিল। নতুন নতুন সংস্কার দ্রুত সম্ভব করতে হলে, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে অথবা দেশের শিল্পব্যবস্থার সুসমন্বিত বিকাশ সম্ভবপর করতে হলে যে প্রথমেই দেশের প্রধান প্রধান স্থান রেল লাইন দিয়ে ছেয়ে ফেলা দরকার এটা চিয়াং বুঝেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাকে সম্ভবপর করে তুলতে হলে যে টাকা দরকার, যে শিল্পকুশলতা থাকা প্রয়োজন তার সব থাকতেও কমিউনিষ্ট-দলনের জন্য সে সব উপেক্ষিতই থেকে যায়। এরই মধ্যে যেটুকু গ'ড়ে তোলা হয় সে সামান্যই। বর্তমান যুদ্ধের গোড়ার দিকে বরং কাজ এদিকে কিছু কিছু এগিয়েছে। কাজের সময় দেখা গেছে চীনা এঞ্জিনিয়াররা কোন অংশেই অন্য দেশের এঞ্জিনিয়ারদের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। চীনা মজুরদের পরিশ্রমের খ্যাতি সর্বত্রই আছে। এদেরই সাহায্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবার ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয় নতুন নতুন রেল লাইন খোলার ফলে। কিন্তু, পূব থেকে পশ্চিমে যাবার রাস্তা একমাত্র নদীপথ ছাড়া আর ছিলো না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চীনের অধিকাংশ নদীই পূব-পশ্চিম-মুখী। তাই, এই পথই এ অঞ্চলের একমাত্র যাতায়াতের পথ।

যাতায়াতের যেটুকু উন্নতি হয় সে একমাত্র রাজপথেরই। এর প্রধান লক্ষ্য ছিলো অবশ্য সামরিক। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে এক একবার অভিযান চালানো হ'য়েছে আর তারই সাথে বহু সামরিক রাস্তা তৈরী হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিকে লক্ষ্য রেখে

রাজপথ তৈরী না হওয়ায় লাভের চেয়ে লোকসানই হ'য়েছিলো বেশী। যে-রাজপথ হ'য়ে উঠবে শিল্প সৃষ্টির বাহন, শান্তি-শৃঙ্খলার বাহন, সেই রাজপথ দেশের লোকের রক্তে ক'রলো অবগাহন ; শান্তি-শৃঙ্খলার বদলে আনলো অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। এই রাজপথ সৃষ্টির ইতিহাসও উৎপীড়ন ও উৎসাদনের এক নির্মম ইতিহাস। বাধ্যকৃত শ্রম অথবা 'forced labour' (একে 'corree system' বলা হয়)—এর দ্বারা এই রাস্তা তৈরী হয়। জমি জোর করে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে সেখান দিয়ে রাস্তা তৈরী হ'য়েছে। তার জন্যে কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিলো না। সে ক্ষতি পুষিয়ে নেবার মত কোন উন্নত আদর্শও তাদের সামনে তুলে ধরা হয় নি। সে পথে রক্তাক্ত সৈনিকের পায়ের ছাপ এঁকে গেছে শুধু। সে রক্তও জুগিয়েছে নিরীহ-নিরপরাধ শ্রমিক-মজুর। তাই, বিকৃত পথে রাস্তা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে চিয়াং-কাইশেক দেশের লোকের অসন্তোষ কুড়িয়েছেন এবং সেই অসন্তোষ যখন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছে দেশের স্থানে স্থানে, তখন বুক চাপড়িয়ে বলেছেন—গেলো, গেলো, সব কমিউনিষ্ট হ'য়ে গেলো। ফলে কমিউনিষ্ট সন্দেহে অথবা কমিউনিষ্টদের সাহায্যের অভিযোগে তিনি নির্বিচারে গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান করেছেন। এইভাবে যারা প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে এক একটা অটল স্তম্ভ হতে পারত, যাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আজ চিয়াংএর প্রচ্ছন্ন বিস্ময় ও গর্বের বস্তু, তাদের নির্বিচারে এবং নিঃশেষে ধ্বংস করে চিয়াংকাইশেক দেশের শক্তিকে অনেকটা ক্ষীণ করে ফেলেছিলেন। আজকে তিনি তার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই বিশ্বাস। কিন্তু, নানা উপদলীয় চক্রান্তে আজও তিনি সে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন নি—বরং, সে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা আজ আবার উদ্যত।

এইভাবে পথ ঘাট অনেক তৈরী হলেও দেশের পক্ষে সাময়িক ভাবে অভিশাপের কাজই করেছে সে সব। চীনাদের দুর্জয় সংকল্প ও দুঃসাহসিক শিল্পকুশলতার জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে দুটো রাজপথ আজও চীনের বুকে বিরাট অজগরের মত দুলছে। চীনা মজুররা যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ রেখেছে তারা এই দুটো পথ তৈরী করে। তার একটা গিয়েছে ব্রহ্মের লাসিও পর্য্যন্ত, যাকে আমরা সাধারণত Burma Road ব'লেই জানি। আর একটা পথ তৈরী হয়েছে উত্তর পশ্চিম চীনের মধ্য দিয়ে। এই পথে রুসিয়া থেকে প্রচুর রসদ, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি চীন আমদানী ক'রতে পেরেছে। দুর্গম পাহাড় বিদীর্ণ করে, উচ্ছৃঙ্খল নদী পাড়ি দিয়ে, বিজন বন মথিত করে শত শত মাইল এই রাজপথ এঁকে বেঁকে চলে গিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং দুনিয়ার এক বিস্ময়কর অবদান সৃষ্টি করেছে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে এর অধিকাংশ পরিশ্রমই এসেছে চীনা মেয়েদের তরফ থেকে—যাদের চিয়াংকাইশেক একসময় কচু কাটা করেছেন, সন্দেহ এবং সংশয় ছাড়া যাদের অন্য কোন দৃষ্টিতে ভাবতে পারেন নি, প্রকৃতির অনাসৃষ্টি ব'লে যাদের অবজ্ঞায় আড়ালে ফেলে রেখেছিলেন, নতুন জাগরণের দিনে তারাই চিয়াংএর দুর্জয় হাতিয়ার, তারাই মহাচীনের মহাবিস্ময়।

বিমানপথই চীনের ভৌগলিক ব্যবধান দূর করবার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হ'তে পারে—কিন্তু, নানকিং গবর্ণমেণ্ট সেদিন নানাকারণে এর দিকে বিশেষ মন দিতে পারেন নি। সামান্য সামান্য যেটুকু ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছিল তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় ব'লেই অনুল্লেখ রাখা গেলো। তবে, বর্তমান যুদ্ধের ভেতর দিয়ে চীনা বৈমানিকরা প্রমাণ করেছে, দেশপ্রেমের মতই তাদের বিমান কৃতিত্বও অতুলনীয়—অথবা, এও হতে পারে যে দেশপ্রেমের প্রেরণাই তাদের সে কৃতিত্ব সম্ভব করেছে। যাই

হোক্ না কেন—চীনের নতুন লৌহদৃঢ় যুবকসম্প্রদায় ভবিষ্যৎ চীনের বিমানপথের এক দুর্জয় এবং বলিষ্ঠ উপাদান এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এই যুদ্ধের শেষে বিমানপথই চীনের অখণ্ডতা সৃষ্টির ইতিহাসে এক মহা শক্তিশালী হাতিয়ারের কাজ করবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু, নানকিং সরকার আত্মদুর্বলতার ত্রুটীতে সে পথে বিশেষ এগোতে পারেন নি সেদিন।

তারপরে আসুক অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা। নানকিং গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সত্যিকার প্রতিনিধি ছিলো না ব'লেই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রাখার প্রয়োজন বোধ করে নি। ফলে, "It had rejected any drastic policy of land-reform because its supportes, the gentry and the sons of the gentry, were dependent on land-rentals for their income"—অর্থাৎ, নানকিং গবর্ণমেণ্টের সমর্থক জমিদার ইত্যাদির স্বার্থ জমির আয়ের সাথে জড়িত থাকায় ভূমিসংস্কারের কোন যুগান্তকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

ভূমিসংস্কার তো হয় নি বরং এই সমস্ত জমির পোষ্যপুত্রদের জমির পাওনাগণ্ডা আদায়ের পথের বাধা-সংস্কারেই নানকিং গবর্ণমেণ্ট বেশী মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাই, করের বোঝা, খাজনার ভার ক্রমশই বেড়ে ওঠে। নতুন তৈরী পথের জন্য, আধুনিক ফৌজের সজ্জা যোগাবার জন্য করভারে জর্জরিত কৃষক নিঃস্ব ও দেউলিয়া হয়ে যায়। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইএর পথ সৃষ্টি করতে গিয়ে যে শত্রুসৃষ্টির অজস্র উপকরণ পেছনে রেখে যাচ্ছেন উত্তেজনার মাথায় চিয়াং সেকথা ভুলেই গিয়েছিলেন হয়তো। কল্পিত শত্রুর সন্ধানে তিনি বাদশাহী অভিযানে বেরিয়েছেন সত্য, কিন্তু শত্রু যে রক্ত মাংসের জীবন্ত সজ্জায় তাঁরই শিয়রে গজিয়ে উঠছে

আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেটা ধরা পড়তে পারে না। তার পরিণতিস্বরূপ এরাই কমিউনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে, তাদের আশ্রয় দিয়েছে, তাদের সাথে নাড়ীর সংযোগ গড়ে তুলেছে। তাই, কমিউনিজ্ম্এর আতঙ্ক সৃষ্টি করেই কমিউনিষ্টদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না—কমিউনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ জেনে তার প্রতিকারে মন দিতে হয়—যা নানকিং গবর্ণমেণ্টের কায়েমী স্তম্ভদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো।

নানকিং সরকারের ভূমি সংস্কারের (?) প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভূমিহীন কৃষকের এক বিপুল সমাবেশ সৃষ্টি হ'লো চীনের বুকে। যাদের সামান্য জমি ছিলো, কৃষিপণ্যের দাম অসম্ভব কমে যাওয়ায় তারাও দেউলিয়ার পথে এগিয়ে চললো। এইভাবে ঘরে-বাইরে প্রচুর শত্রু সৃষ্টি ক'রে সান্‌ইয়াৎ সেনের বিপ্লব বিপ্লব-বিরোধী তরঙ্গে রূপান্তরিত হ'লো। ভঙ্গুর সমাজ নতুন সমাজের অঙ্কুরকে নিষ্পেষিত ক'রতে চাইলো।

অবশ্য আরও কতকগুলো দিকে সংস্কারে মন দেন নানকিং গবর্ণমেণ্ট—যেমন, গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন, ক্রেডিট সোসাইটি, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদি। কিন্তু, আমাদের দেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে যাঁর পরিচয় আছে,—এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে এসম্বন্ধে প্রায় সবারই কিছু না কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে নিজ নিজ ক্ষেত্রে—তিনিই জানেন কাগজে কলমে সুন্দর শিরোনামা দিলেই যেমন ভালো প্রবন্ধ হয় না তেমনি শুধু রাশীকৃত plan খাড়া করলেই দেশের সংস্কার হয় না। প্রকৃত দেশসংস্কার হবে কিনা সেটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর—যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়মিত হয় আবার শ্রেণীস্বার্থ ইত্যাদি দ্বারা।

সামরিক গবর্ণমেণ্ট সবই মিলিটারী কায়দায় সমাধান চায়। জনসাধারণের সাথে সহযোগিতার বালাই তার নেই, জনসাধারণের

কাছে জবাবদিহির প্রক্রিয়া নেই, উচ্ছৃঙ্খল শাসকবিশেষকে স্থানচ্যুত করবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের হাতে নেই—শুধু ওপর থেকে বোঝার মত আদেশের খবরদারি চাপিয়ে যাওয়া—সে আদেশের তলে মানুষ পিষ্ট হ'লো কিনা, মানসিক অবস্থার বিকাশ হ'লো কিনা, সে খোঁজ খবরের কোন দরকার নেই।

পুরাতন চীনের গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা নতুনভাবে সংস্কার ক'রে তাকে কাজে লাগাবার বেলায় নানকিং গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত সামরিক কায়দার আশ্রয় নিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় পাও-চিয়া। প্রতি দশ ঘর অথবা একশো ঘর গৃহস্থ নিয়ে এরকম এক একটা স্বায়ত্তশাসন-মণ্ডলী সৃষ্টি হতো। গৃহস্থরাই গ্রামের শাসন এবং বিচারকাজ চালাবার জন্মে কয়েকজন নেতাকে (আমাদের দেশের পঞ্চায়েৎদের মত) নির্বাচিত করতো। এই পাও-চিয়া ব্যবস্থাকেই নানকিং গবর্ণমেণ্ট নূতন ক'রে সাজালেন। কিন্তু, আমাদের দেশের ইউনিয়ান বোর্ডকে দিয়ে যেমন গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক গুপ্তচরের কাজই প্রধানত করিয়ে নেওয়া হয়—এই পাও-চিয়াও তেমনি গণআন্দোলনের খবরাখবরের পুলিশী ব্যবস্থায় পরিণত হ'লো। একে ভিত্তি করে যে চীনা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক শিক্ষা খুব চমৎকার করে গড়ে তোলা যায় সেকথা গৌণ হয়েই রইলো। ফলে, পাও-চিয়া ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত গবর্ণমেণ্টের পদ সেবা করায় এক প্রধান যন্ত্রে পরিণত হ'লো।

অবশ্য, Co-operative আন্দোলনের দিক দিয়েই খানিকটা সাফল্য নানকিং গবর্ণমেণ্ট দেখিয়েছেন। কৃষক চীনের প্রধান সমস্যাই কৃষিগত। চাষবাসের জন্ম সস্তায় ঋণ পাওয়াটাই ছিলো চীনের এক দুরূহ সমস্যা। Co-operative Credit Society'ই শুধু সে সমস্যার অনেকটা মীমাংসা করতে পারত। দেখতে দেখতে তিন বছরের মধ্যে পাঁচহাজার থেকে

পনেরোহাজার Co-operative Society গ'ড়ে উঠলো—তার মধ্যে অর্ধেকের বেশী হ'লো Credit Society. কিন্তু, সংখ্যার গণিততত্ত্বই গুণতত্ত্বের প্রধান পরিচয় নয়। হলোও তাই। আমাদের দেশের মতই Co-operative Societyর অস্তিত্ব গ্রাম্য জমিদার আর মহাজনের অক্টোপাসী বাহুর মধ্যে পড়ে জর্জর হয়ে উঠলো। যে-গবর্ণমেণ্ট জমিদার-মহাজনের স্বার্থের প্রতিভূ, তার আঁওতায় সেই স্বার্থই যে একমাত্র অর্থ হয়ে উঠবে এটা না লিখলেও চলতো। অবশ্য, জাপানের সাথে যুদ্ধ বাধার পর (বর্তমান যুদ্ধ) গবর্ণমেণ্টের চেহারার অনেক বদল হয়েছে—তাই, তারই সাথে Co-operative Movement এর বেয়াড়াপনার ভাবও অনেক পরিমাণে বদলেছে। বর্তমান যুদ্ধরত চীনে Co-operative আন্দোলন যে কি এক শক্তিশালী ভূমিকায় অভিনয় করছে চীনের শক্তির সন্ধান করতে গেলে তার পরিচয় সকলের আগে দরকার। সে পরিচয় পরে দেব।

চীনের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব করে তোলবার জন্য অবশ্য নানকিং গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত চীনা যুবক এবং League of Nations প্রেরিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিষদ গড়ে তোলেন—কিন্তু, আমাদের দেশের ব্যবস্থা-পরিষদের মতই সেটাও শুধু মাত্র তল্পিদারী অসহায় ব্যবস্থায় পরিণত হয়। যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে পারত গৃহযুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের পেছনেই সে স্বচ্ছলতা তারই উচ্ছলতা হারিয়ে বসে।

চীনের সমস্যাও এক আধটুকু নয়। প্রতি বছর সেখানে ক্ষিপ্ত নদীর উন্মাদনায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়—কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হ'য়ে যায়—তার পরিমাণ আমেরিকার যুদ্ধ বাজেটের মতই বিস্ময়কর। চীনের সংস্কারে মন দেবার সময় নদীর এই

বন্যা একটা প্রধান স্থান পায়—কেননা, প্রতি বছর জীবন ও সম্পদে চীনের যা লোকসান হয় তাকে রোধ না করতে পারলে চীনকে গড়ার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নই। কিন্তু, এতে অজস্র অর্থের প্রয়োজন। ফৌজের পেছনে অর্থ ঢালার পর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের হাতে এত অর্থ তুলে দেবার ক্ষমতা ইচ্ছা থাকলেও কোথা থেকে আসবে? তাই, প্রধান সমস্যা এইভাবে উপেক্ষিতই থেকে গেলো। আমাদের দেশের রাশভারী গবর্ণমেণ্টই তার সদুত্তর। অথচ, বন্য নদীকে বশে এনে তার বাড়তি এবং বিধ্বংসী জলকে দেশের ভেতরে নানা নালা-খাল কেটে নিয়ে গিয়ে যে-দেশের উর্বরতা কি অভূতপূর্ব বৃদ্ধি করা যায় সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নীপার নদীর বাঁধ দিয়েই তা প্রমাণ করেছেন। এইভাবে চিরস্থায়ী জাতীয় আয় বৃদ্ধির একটা ভিত্তিও এই নদীর বাঁধ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ, নানকিং গবর্ণমেণ্টের সংগঠনী দুর্বলতা সেটাকে সম্ভব করে তুলতে পারল না। তাই, বন্যা ও তারই সাথে জড়িত দুর্ভিক্ষে চীনের মানুষ এক অমানুষিক বিপর্যয়ের মধ্যেই বছরের পর বছর তার মানুষী সত্ত্বাকে পিষ্ট হ'তে দেখলো। যা হতে পারত জীবনের সুধা, তা-ই হ'য়ে রইলো মৃত্যুর ক্ষুধা মেটাবার এক নৃশংস বিষ।

কৃষির উন্নতি বিষয়েও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কাজকর্ম অনেকটা ধর্মোপদেশের মতই এক আনুষ্ঠানিক প্রাণহীন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে উঠলো। আমাদের দেশের সরকারী কৃষি ফার্মগুলো কৃষকের ব্যয়ে পুষ্ট হয়ে লম্বা-চৌড়া বাগান ফেঁদে বলছেন, হ্যানো করো, ত্যানো করো—উন্নত ধরণের বীজ লাগাও, সার দাও, নতুন নতুন যন্ত্র ব্যবহার করো, নেপিয়ার ঘাস লাগাও ইত্যাদি ইত্যাদি; অথচ কৃষকের সমস্যা কোথায় তলিয়ে দেখেন না—চীনের অর্থনৈতিক পরিষদের কাজের ধারাও অনেকটা ওই রকমই হ'য়েছিলো আর কি। তাতে

ফল যা হয় তাই হ'লো। চীনের গরীব চাষীর ভিঁটেয় যেমন ঘুঘু চরছিলো—অর্থনৈতিক পরিষদের সৃষ্টির পরেও সেই ঘুঘু ঠিক তেমনি করেই চড়তে লাগলো—বরং পালে তারা আরও বেড়ে গেল। কেননা, বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা সৈন্যদের দৌলতে তখন আরও বেশী করে চেপে বসেছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি জাতীয় পুনর্গঠন বিভাগগুলোও ওই একই কারণে ঝিঁটকে মেরে রইলো—বাড়বার অবকাশ পেলো না। অবশ্য, জাতীয় অর্থনীতির দিক দিয়ে চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ টি. ভি. সুংএর (সুং বংশই চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বংশ—ম্যাডাম্ চিয়াংকাইশেক এই বংশেরই মেয়ে) খানিকটা কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নতুন আইন প্রণয়ন করে ইনি জাতীয় আয় অনেক পরিমাণে বাড়াতে সমর্থ হন। এইভাবে custom revenue তিন গুণ বেড়ে যায় এবং salt tax থেকেও আয় বেড়ে যায় দ্বিগুণ—চীনের প্রধানতম আয়ের মধ্যে এই দুটির স্থান সবারই ওপরে। এরই জোরে অন্য কতকগুলো পুরোণো ট্যাক্স, যা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলো, তা উঠিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে।

জাতীয় জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যর্থতায় চিয়াং চৈনিক নরনারীর মানসিক অবস্থাকে উঁচু রাখবার জন্য অন্য ধরণের নিঃখরচী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তাঁর New Life Movement এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আধ্যাত্মিক মৃতসঞ্জীবনী সুধা-মাফিক এক রঙীন পানীয়ের মত চীনা জনসাধারণের কাছে এ এক মুক্তির রহস্যময় বাণী নিয়ে হাজির হলো। কতকগুলো নৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে ব্যক্তি-জীবনকে উন্নত করা হয়ে উঠলো এর প্রত্যক্ষ লক্ষ্য—কিন্তু, অপ্রত্যক্ষভাবে এটা হলো কমিউনিষ্টদের নতুন

আন্দোলনের এক প্রত্যুত্তরের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থার সনাতনী ধারা অব্যাহত রেখে, শোষণের গলিত অব্যবস্থাকে পোষণ ক'রে, ন্যায় ও নীতির কতকগুলো বাষ্পীয় নীতি যে নতুন আন্দোলনের প্রাণরস জোগাতে পারে না, বরঞ্চ নতুন শব্দসমন্বয়ে এ যে পুরাতনেরই জয়গান—এ ফাঁকি বেশি দিন ঢাকা থাকতে পারেনা, বা গণমনকে ওই গলিত নীতি আকৃষ্ট করতে পারে না—তা অল্পদিনেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। তাই, দিন দিন কমিউনিষ্টদের নতুন আন্দোলনের শক্তি যেমন দুর্বার হয়ে উঠতে লাগলো, ন্যায়, নীতি, সততা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ধ্বনির ওপর চিয়াং কাইশেকের 'নব-জীবন-আন্দোলন' পুরাতন জীবনের দিকেই বিলীন হয়ে যেতে লাগলো। বহু দেশে বহুবার প্রগতিশীল অথবা বৈপ্লবিক আন্দোলনের মুখে সংস্কারমুখী প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা এইভাবে শীতের ঝরাপাতার মতই দিশেহারা হয়ে উড়ে গেছে—কেউ তাকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি।

চীন-সোভিয়েট ও গণজাগরণ

Hankow এর কোয়ালিশানী গবর্ণমেণ্ট ভেঙ্গে যাবার পর নানকিং গবর্ণমেণ্টের বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় আপাতত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত ভূমিকা পেছনে ফেলে রেখেই কমিউনিষ্ট দল তাদের ফৌজ সহ দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি প্রদেশে গিয়ে নিজেদের কর্মকেন্দ্র গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। হুনান সীমান্তে চালিনেই চীনের প্রথম সোভিয়েট জন্ম নিল—সেটা ১৯২৭ এর নভেম্বর মাস।

কিন্তু নানকিং গবর্ণমেণ্টের সাথে বিচ্ছেদ যে অনিবার্য হয়ে উঠবে কমিউনিষ্টরা তা জানতো ; তবে সেটা যে এত অপ্রত্যাশিতভাবে শীঘ্র হয়ে উঠবে সেটা তাদের প্রত্যাশার বাইরে ছিল। তাই, কৃষিবিপ্লবের দিকে তারা ঠিকমত নজর দেবার সময় পেয়ে ওঠে নি। মাও সে তুং অবশ্য, যতদূর জানা যায় তাতে, অনেক আগেই কৃষকদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দেবার আওয়াজ তোলেন এবং সেইজন্যে পার্টির সাথে তাঁর মতান্তরও চলছিলো। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত জমি বিলি করবার সিদ্ধান্ত যখন সত্যিই করা হলো, তখন সেটাকে কাজে পরিণত করার মত সময় পাওয়া গেল না। আগে জমি বিলি করা সুরু করতে পারলে কমিউনিষ্ট পার্টি সুবিপুল কৃষক জনসংখ্যার মধ্যে একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরী করতে পারত। তাতে কিয়াংসি থেকে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে বিদায় নিতে হতো না।

অবশ্য, এর বিপক্ষে আরও এক মত আছে, যারা মনে করে, এর আগে থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করা সুরু করলে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এগোতেই পারত না। ফলে, চীনের যতটা অখণ্ডতা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিলো তাও হতো কিনা সন্দেহ। এতে কমিউনিষ্টদের উদ্দিষ্ট পথের ওপর অহেতুক বাধারই সৃষ্টি হতো মাত্র। তারও উত্তরে বলা চলে যে চীনের বণিকগোষ্ঠী তখনও এত শক্তিশালী হয়নি (সাংহাই বিজয়ের আগ পর্যন্ত) যে জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগতির পথে তারা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। প্রথমত গণতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌঁছা তাদেরও উদ্দেশ্য ছিলো—কেননা সামন্ত জমিদার মহাজনের ক্ষমতা বাড়িয়ে অথবা শক্তি অব্যাহত রেখে পুঁজিপতির স্বার্থ জোরদার হয় না। সামন্তব্যবস্থা থেকে মুক্ত কৃষকই ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে—এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাই পুঁজিবাদের শ্রীবৃদ্ধির

অনুকূল সর্ত্ত। তাই, সাংহাই বিজয়ের আগে কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ সুরু করতে পারলে চীনা কমিউনিষ্টদের শক্তি-সামর্থ্য অভূতপূর্ব রূপে বাড়তে পারত এবং এই জাগ্রত গণশক্তির চাপেই হয়তো চিয়াংকে বাধ্য হয়ে প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইএর নীতিতে টিকে থেকেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সুষ্ঠু অগ্রগতি সম্ভব করে তুলতে হতো। প্রায় এক যুগ ধরে কৃষি বিপ্লবের কর্মধারায় লেগে থেকেই কমিউনিষ্টরা চীনের মধ্যে এক বিরাট গণআলোড়নের তরঙ্গ তুলতে সমর্থ হয়—যার চাপে পড়ে চিয়াংকে শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম বন্ধ রাখতে এবং জাপবিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়। তাই কৃষিবিপ্লব প্রথম দিকে স্থগিত রেখে ভালো হয়েছে, কি খারাপ হয়েছে, চীনের ইতিহাসে এ এক অমীমাংসিত সমস্যা হয়েই রইলো।

চীনা সোভিয়েটের জন্ম, বিকাশ, পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বপ্রথম Edgar Snowই প্রামাণিক সাক্ষ্য পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেন। তার আগে চীনা সোভিয়েট সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কারও ছিলো বলে মনে হয় না। এক নাটকীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে Snow সাহেব প্রথম চীনা সোভিয়েটের সংস্পর্শে আসেন। চীনের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ইয়েনান্ প্রদেশ তখন চীনা সোভিয়েটের কেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে। চিয়াংএর উৎপাতে কিয়াংসিতে টিকে থাকা নানাকারণে যখন অসম্ভব হয়ে উঠলো, তখন এক দুঃসাহসিক অভিযানের ভেতর দিয়ে কিয়াংসি সোভিয়েট একেবারে মূল সমেত হাজার হাজার মাইল দুর্গম পথ পেরিয়ে এখানে চলে আসে। একেই বলা হয় লং মার্চ—চীনের ইতিহাসে, শুধু চীনের কেন, পৃথিবীর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে এ এক অলৌকিক কাহিনীর মতই। এর সুবিস্তৃত বিবরণ পরে দেব।

Shensi প্রদেশ তখন রাজনৈতিক উত্তাপে প্রখর হ'য়ে উঠেছে। চিয়াংএর সৈন্যেরা বাহির থেকে প্রদেশটাকে অবরোধ ক'রে র'য়েছে। সেই অবরোধ ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওদিকে লালফৌজের সাথে লড়াইএ নানকিং গবর্ণমেণ্টের সৈন্যেরা প্রায়ই হারছে এবং বন্দী হচ্ছে। কমিউনিষ্টদের প্রচারে তাংপেই সৈন্যদের (মাঞ্চুসৈন্যদের তাংপেই বলা হ'তো) মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত। তাংপেই সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রেরণায় নানকিং গবর্ণমেণ্টের সাথে যোগ দিয়েছিলো যে তারা শীগগিরই জাপানের হাত থেকে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিয়ে তাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু যখন তারা দেখলো, জাপানের হাত থেকে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নেবার কোন উদ্যোগেই নানকিং সরকার দেখাচ্ছেন না—বরং যারা জাপানা রাজ্যলিপ্সার উচ্ছেদ করতে চাইছে সেই কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধেই তাদের দিয়ে লড়াই করানো হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক প্রচারের পদ্ধতি এবং শত্রুসৈন্যদের সাথে তাদের আচরণেই মাঞ্চুসৈন্যদের চেতনা বেড়ে ওঠে। এখানে বলে রাখা দরকার যে কমিউনিষ্টরা ১৯৩২ সালেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই থেকে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলবার জন্য দেশের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে। সেই আন্দোলনেরই ফল হিসেবে তাংপেই সৈন্যদের মধ্যে এই চাঞ্চল্য অনিবার্য প্রতিক্রিয়া রূপে দেখা দেয়।

তাই, Sonw সাহেব যখন সিয়ান্ পৌঁছান তখন সেখানে এই অসন্তোষের লক্ষণ চারিদিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সিয়ান্ অথবা সিয়ান্ফু হলো Shensi প্রদেশের রাজধানী। সিয়ানে বসে তিনি ভাবছেন, কিভাবে সোভিয়েট রাজ্যে প্রবেশ করা যায়। প্রবেশ করতে

না পারলে তাঁর এত পরিশ্রম, এত আশা, এত উদ্বেগ সব পণ্ড হয়ে যায়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর এক সুযোগ জুটে গেল। যে চীনা যুবকটি তাঁকে লালরাজ্যে পৌঁছে দেবার ভরসা দেয় তার এক সর্ত ছিলো। সে সর্ত অনুযায়ী Snow সাহেব ঢুকবার সুযোগ পাবেন বটে কিন্তু বেরিয়ে আসার দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাঁর। এই সর্তে রাজী হয়ে একদিন তিনি অচেনা-রহস্যময় এক অভিনব জগতের যাত্রী হয়ে বসলেন। পেছনে পড়ে রইলো সভ্য জগতের শেষ সীমান্ত—যেখানে, তাঁর নিজের ধারণায়, আইন-কানুনের শৃঙ্খলা রয়েছে, জীবন নিরাপদ, বৈজ্ঞানিক জগতের বলিষ্ঠ ভরসায় মন স্বচ্ছন্দ—সেই সীমান্ত যখন বাসের হলুদ ধূলোয় ঝাপসা হয়ে উঠলো, তখন এক ঝাপ্‌সা ভবিষ্যতেরই মুখোমুখি তিনি দাঁড়িয়ে। মন একটু চঞ্চল হয়েছিলো বৈকি তাঁর ?

তাঁর পাশে বসেছিলো কালো চশমা আঁটা এক যুবক—তাঁর ক্ষণিক গাইড্‌। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাস্‌ 'No man's land'এ এসে দাঁড়ালো। পাশের যুবক হাসতে হাসতে তাঁকে সঙ্গে করে নেমে পড়লো। বাস্‌ চলে যাবার পর হঠাৎ চশমা জোড়া খুলে সে বললো—চিনতে পারেন আমাকে ? মুখ দেখে মনে হচ্ছে, না। আমার মাথার ওপর কয়েক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঝুলছে—আমি নানকিং গবর্ণমেণ্টের একজন Red Bandit ! Red Bandit ? নানকিং গবর্ণমেণ্টের লক্ষ লক্ষ ডলার যাদের জন্য ঝুলছে, সামনের প্রফুল্ল চীনা যুবকটি সেই Red Bandit দেরই একজন ! Snow সাহেবের সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। যুবকের ভদ্র চেহারায় তিনি নিরাশ হচ্ছিলেন।

আবশ্যকীয় চিঠিপত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি ক্রমে লালরাজ্যে ঢুকলেন। প্রথমেই যে গ্রাম তাঁর চোখে পড়লো সেই গ্রামের এক বাড়ীতে তিনি উঠলেন। পরে জানা গেলো, সেই গৃহস্থ গ্রামের Sovietএর Chairman.

Snow সাহেব অবাক হয়ে শুনলেন যে তাঁর আসার খবর আগেই এসে পৌঁছে গেছে—বোঝা গেলো spying sytem ওদের বেশ উন্নত। খুব সাদাসিধে ধরণের খাবার তাঁকে দেওয়া হলো। এখান থেকে তিনি মাও-সে-তুং এর বাসস্থানের সঠিক সন্ধান নিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। পথে এক জায়গায় দেখেন, পাহাড়ের ওপার কতকগুলো লোক মিলে বিকট আওয়াজ করছে। প্রথমটা তিনি ঘাবড়েই গেলেন—ভাবলেন, এইবার হয়তো Red Banditএর সত্যিকার উপদ্রবের পাল্লায় তাঁকে পড়তে হলো। কিন্তু, নিরাপদেই তাঁর পথটা কেটে গেলো। পরে শুনেছিলেন, গেরিলা সৈন্যদের ওটা লড়াইএরই একটা অঙ্গ। ওই আওয়াজের ফলে শত্রু অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

যাক্, তারপর Edar Snow মাও সে তুং যেখানে থাকতেন এবং যেখানে চীন সোভিয়েটের head quarter গড়ে উঠেছিলো সেখানে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে বহু দিন বহু রাত্রি তাঁর মাও এর সাথে কাটে। আস্তে আস্তে চীনে সোভিয়েটের জন্মের ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে প্রচণ্ড অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে তার আত্মবিকাশের কাহিনী পর্যন্ত সব মাওএর কাছ থেকে শোনেন এবং তাঁর 'Red Start Over China'য় মাওএর সংশোধিত সেই সব বিবরণ জগতের সামনে প্রকাশ করেন। মনে রাখতে হবে, ইনিই প্রথম ইউরোপীয়ান, যিনি এই সৌভাগ্য লাভ করেছেন। প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে এই অভিজ্ঞতা চয়ন করতে হয়েছে,—বিশেষত, চীনা সোভিয়েটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশাবাদী না হলেও তিনি ওকে সহানুভূতি দিয়েই বিচার করছেন, এবং বলেছেন, যে গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জন্য লক্ষ লক্ষ যুবক জীবন বিসর্জন দিয়েছে, এবং তাদের পেছনের যে-শক্তি তাদের পরিচালিত করেছে তা কখনও নষ্ট হতে পারে না—সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে বা কখনও।

Kiangsi Soviet গড়ে ওঠার আগে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে শেষ পর্যন্ত Communistদের Kiangsiতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না। প্রসিদ্ধ চীনা কমিউনিষ্ট নেতা Chou-en-lai সাংহাইয়ে গিয়ে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে তোলেন। তারই ফলে যে Chiang-kai-sheik এর ক্ষমতা দখলের সুবিধা হয় একথা আগেই বলা হয়েছে। তারপর, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ সুরু হবার পরেই Chou পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। পথে Kiangsiর রাজধানী Nanchangএ এক গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলেন। এই অভ্যুত্থানই চীনের 'Red Army' সৃষ্টি করে। চীনা সোভিয়েটের ইতিহাসে এটা Nanchang Uprising নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। প্রসিদ্ধ সমর নেতা Holeung, Yeh-Ting, Chu-Teh প্রভৃতির সহযোগিতার এই অভ্যুত্থান গড়ে ওঠে।

এর পরে, Chou-en-lai Swatow বন্দরে যান। Swatow ছিলো একটা treaty port—অর্থাৎ, বৈদেশিক বণিকের হাতে লাঞ্ছনার এক নীরব সাক্ষী। এই portএর Custom Revenue চীনারা পেতনা এবং বিদেশী মাল সম্পূর্ণ বিনা শুল্কে আসবার সুবিধা ভোগ করতো। বন্দরের শ্রমিকদের ওপরও নির্যাতনের বিরাম ছিল না। ফলে, মজুররা বিদ্রোহী হ'য়ে বন্দরটিকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। দশ দিন ধরে একরকম নিরস্ত্র অবস্থায় বৈদেশিক Gunboat এবং স্বদেশী সমরনায়কদের বিরুদ্ধে তারা দুঃসাহসিক ভাবে এই port টাকে রক্ষা ক'রে চীনের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় যোগ করে। Swatow পতনের পর Chou-en-lai Cantonএ গিয়েও এক অসম সাহসিক মজুর অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেন—ইতিহাসে তা Canton Commune নামেই বিখ্যাত হয়ে থাকবে। Paris Communeএর অনুকরণে নামাঙ্কিত এই গণঅভ্যুত্থান তার নামের সার্থকতা রেখেছিল কয়েকদিন। Canton

Commune জনগণের এক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ব'লে সংঘবদ্ধ অতগুলো বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নিজের অপরিণত শক্তি নিয়ে তার টিকে থাকাটা অসম্ভবই। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অন্তত যে কয়েকদিন তারা তাদের স্বাধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল এটাও তাদের শ্লাঘারই বস্তু। শুধু গণপ্রতিরোধের বলেই তাদের এই অচিন্তিত সাফল্য সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু, সময় ও পরিবেশের প্রতিকূলতা বীরত্বের সে ফলাফলকে অক্ষয় করতে দিল না। তাই, আষাঢ়ী মেঘের বিদ্যুৎ-চমকের মতই সেই ইতিহাস ক্ষণস্থায়ী হ'য়ে রইলো।

শেষ পর্য্যন্ত Kiangsi প্রদেশে এসে খানিকটা স্থায়ী এবং প্রত্যক্ষ সফলতা লাভ করা গেলো। Chou-en-lai এবং Chu-Tehর নেতৃত্বে এখানেই সর্বপ্রথম চীনা সোভিয়েটের জন্ম হ'লো। এই কিয়াংসিতেই বহু বাধা-বিঘ্নও বিপদ-আপদ সহ্য করে চিয়াংকাইশেকের বহু সুসংগঠিত আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে চীনা কমিউনিষ্টরা তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদের বাস্তব পরীক্ষা চালাতে পেরেছিল। এখানেই তাদের বহুবিখ্যাত লাল পল্টনের সামরিক কায়দা কানুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—লাল পল্টন অদম্য শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে চীনের সোভিয়েট প্রস্তুতিকে আগলিয়ে রাখে।

এখন এই লাল পল্টন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্। লাল পল্টনের শক্তির প্রধান উৎস জনসাধারণ। জনসাধারণের সাথে অহর্নিশ সহযোগিতা একে অপরাজিত করে রেখেছে। Snow সাহেবের বিবরণ অনুযায়ী লাল-পল্টনের শতকরা আটত্রিশজন কৃষিমজুর অথবা শিল্পমজুর। শতকরা বায়ান্নজন কৃষক এবং শতকরা চারজন মাত্র মধ্যবিত্ত। এ থেকে এর গণভিত্তি কত সুদৃঢ় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। জনসাধারণ লাল পল্টনকে সম্পূর্ণ আপন বলেই মনে করে থাকে। তাই এদের সামাজিক উৎসব-

অনুষ্ঠানে সাধারণ লোকের ভীড় লেগে যায়। লাল পল্টন লড়াইএ গেলে সাধারণ লোকেরা সবাই মিলে তার জমি চাষ করে দেয়। এদের স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সমাজের গৌরবের সামগ্রী—আপদে-বিপদে সমাজ তাদের রক্ষা করে। তাই, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবেই এরা লড়াই করতে পারে। এদের সামনে শোষনহীণ এক মহাজীবনের আদর্শ—তাই, এদের লড়বার ক্ষমতাও অপরিসীম। এদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ষাট-সত্তর জন। সৈন্যরা শিক্ষিত—আমাদের কাছে এটা সোনার পাথরবাটীর মতই আজগুবি এবং হেঁয়ালী। Edgard Snow নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এটা পরখ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও লাল পল্টনের সাথে প্রেস চলে—পত্রিকা ছাপা হয়। নিজেরাই তাতে প্রবন্ধ লেখে, ছবি আঁকে, দুরূহ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে চুল-চেরা তর্ক করে। আগামী দিনের লড়াইএর—নেহাৎ সামরিক গোপনীয়তা যেটুকু না রাখলে নয় সেটুকু বাদে—অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিজেদের করণীয় বিষয় সম্বন্ধে সবাইএর মতামত নেওয়া হয়। জরুরী সময়ে এরা নিজ উদ্যোগেই এবং নিজ বুদ্ধিমত লড়বার অধিকারী। এতে দায়িত্ব বাড়ে, যোগ্যতা বাড়ে—ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষমতা জন্মায় —ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সাফল্য নিঃসন্দেহ হ'য়ে ওঠে। ভাড়াটে সৈন্যের মত এরা বাঁধাধরা কোন মাইনে পায় না। তবে এদের জন্যে বিশেষ জমির ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণের একান্ত আপনার জন বলে গণ্য হওয়ায় খাবার এদের বিশেষ অভাব হয় না।

সামরিক কায়দা কানুন ইত্যাদি শেখাবার জন্য মাটির সমস্ত Model আছে—তাই দিয়ে এদের সামরিক জ্ঞান বাড়ান হয়। এদের নিজস্ব প্রাচীর পত্র আছে—তাতে ব্যক্তিগত ক্রটী, কৃতিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা চলে। Snow সাহেব একদিন Shensiতে থাকবার

সময় এদের একখানা প্রাচীর পত্র দেখেছিলেন। তাতে এই সমস্ত আলোচনা এবং সমালোচনা ছিল ঃ একজন সৈন্য তার বন্দুক পরিষ্কার রাখে নি—একজনের পড়ায় শিথিলতা দেখা দিয়েছিলো। একজন dutyর সময় ধূমপান করেছিল। কারও রাজনৈতিক চেতনার ত্রুটী ছিলো। কারও চরিত্রগত প্রতিক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। লালপন্টনের সাথে যে সমস্ত পাচক থাকে এ সমালোচনার হাত থেকে তাদেরও রেহাই নেই। একখানা প্রাচীর পত্রে হয়তো দেখা গেলো,—খাবার ভালো সিদ্ধ হয় নি। আবার, পাচকরাও সৈন্যদের চরিত্রগত দোষ-ত্রুটী আলোচনার অধিকারী। সেটা বোঝা গেলো যখন দেখা গেলো একখানা প্রাচীর পত্রে একজন পাচক অভিযোগ করছে এই বলে যে, কোন কোন সৈন্যের অনবরত অভিযোগ আর নালিশ লেগেই আছে ইত্যাদি। আত্মশুদ্ধির এমন চমৎকার ব্যবস্থা আমাদের পক্ষে কল্পনাতীতই।

এদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াবার জন্যে নিয়মিত ক্লাশ নেওয়া হয়। লড়াইএ যাবার সময়ও সময় পেলেই এই ক্লাশ করা হয়। এতে এদের দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত এবং উদার হয়—একটা বৃহত্তর পটভূমিকায় এদের জীবন-বোধ গড়ে ওঠে। লালফৌজের কম্যাণ্ডাররা খাঁটি মার্ক্সবাদী। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এরা চলে। সমাজতন্ত্রবাদের জন্যে এরা লড়ে এবং এরা মনে করে যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসেবেই তাদের এই লড়াই একই উদ্দেশ্যের মুখে এগিয়ে চলেছে। এই থেকে তাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার খোলস থেকে মুক্তি পেয়ে এদের এই সংগ্রাম এক মহান এবং উদাররূপে উন্নীত হয়েছে। এরা নিজেদের সৈন্য বলে পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করে থাকে। কেননা, এরা মনে করে যে সৈন্য নামের পেছনে এক নিষ্ঠুর লুণ্ঠন ও পররাজ্য-

গ্রাসের ইতিহাস রয়ে গেছে। শোষণ, শাসন ও ধর্ষণ ছাড়া সৈন্যদের সম্বন্ধে অন্য কোনোরকম ধারণাই আনা যায় না। এটা যেন একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছে বলা চলে। এই সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই, ওই ঘৃণিত বিশেষণের সাথে নিজেদের জড়িত করে ফেলবার অনিচ্ছায় এরা নিজেদের বলে থাকে লড়াকু অথবা যোদ্ধা। ন্যায় ও উন্নত নীতির জন্যে সংগ্রামই এই যোদ্ধাদের জীবননীতি। তাই, যোদ্ধা নামের সাথে এক উন্নত সংস্কারের ব্যাজ জুড়ে দেওয়াটাই এরা পছন্দ করেছে।

লালফৌজের কম্যাণ্ডারদের মধ্যে—অন্যান্য দেশের তুলনায়—হতাহতের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। লালফৌজের কম্যাণ্ডাররা অন্যান্য দেশের রাশভারী কম্যাণ্ডারদের মত লড়াইএর পেছন থেকে মন্ত্রণা দেবার পাণ্ডিত্যে মগ্ন থাকে না—সাধারণ সৈন্যদের মৃত্যুর মুখে টেনে দিয়ে নিজেদের নিরাপদ দুরত্বে রাখা তারা নীতিগত এবং লড়াইগত সফলতা—কোনদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় মনে করে না। অন্যান্য দেশের অফিসারদের সাথে তাদের সাধারণ সৈন্যদের সম্পর্ক প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক—তাই, ভৃত্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়াটা তারা আত্মসম্মানহানিকর অথবা লড়াইএর দুর্বলতা বা ক্ষতিকর বলে মনে করে না। তাই, অগুণতি সৈন্য যখন মরে তখন দূরত্বের আড়ালে থেকে কম্যাণ্ডাররা তাদের স্থান পূর্ণ করবার জন্য অফুরন্ত রিজার্ভ সৈন্য চেলে দিয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ করে। তাই, সাধারণ সৈন্যদের ভেতর মৃত্যুর হার যত বেশী তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার তত কম। তাই, ধনিক শাসিত দেশে একজন কম্যাণ্ডার মারা পড়লে সোরগোল পড়ে যায়।

লালফৌজের অফিসারদের আচরণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের। তারা সাধারণ সৈন্যদের কমরেড ব'লেই মনে করে থাকে—His Excellencyর

ব্যবধান এখানে নেই। লড়াইএর সময় খানিকটা কড়াকড়ি নিয়ম আছে বটে—শোনা যায় আজকাল আরও একটু কঠোর হ'য়েছে নিয়মকানুন—তবে, অবসর সময়ে সবাই মিলে আনন্দ, স্ফূর্তি, রসিকতা ক'রে থাকে। তাহলেও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা মহত্ত্ব হারাবার মত কোন প্রগল্‌ভ আচরণ তারা করে না। এই সমদৃষ্টিবোধই সাধারণ সৈন্যদের সাথে তাদের অবস্থার পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। সৈন্যদের সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই সেনাপতির ব্যক্তিত্ব এবং পারদর্শিতার প্রধান উৎস। নিরাপদ দূরত্ব থেকে শুধু হুকুম পালন করালে সে শ্রদ্ধা-ভালবাসা ক্ষুণ্ণ হয়। তাতে সেনানায়কের শক্তির অপলাপই ঘটে থাকে শুধু। ফলে, তার হুকুম তামিল করবার জন্য যে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারত তাতে শিথিলতা এবং জড়তা দেখা দেয়। মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার যে প্রেরণা—সে-প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র নেতার জ্বলন্ত আত্মত্যাগ।

লালফৌজের সেনানায়কদের অভ্যস্ত order হচ্ছে এইরকম : "Come on boys"—লক্ষ্য রাখতে হবে "Go on boys" নয়। "Come on boys"—"চ'লে এসো সৈন্যরা," বলতে গেলে সৈন্যদের আগেই নিজেদের থাকতে হয়। তাদের পরিচালনা করবার জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়—কিন্তু, "Go on boys"—"এগিয়ে যাও সৈন্যদল",—ব'লতে পেছনে থাকার আভাসই পাওয়া যায় শুধু। এই দুটো orderএর মধ্যেই দুরকম সেনানীর কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। লালফৌজের সেনানায়কেরা প্রথমোক্ত কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মারা পড়েছেন। তাই, অন্যদেশের তুলনায় এঁদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। এ থেকেই এদের গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

লালফৌজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বা তার কৃতিত্বকে সুনিশ্চিত করবার জন্য কতকগুলো নিয়মকানুন আছে। এদের সে সব মেনে চলতে হয়। নিয়মগুলি এই :—১। কোন বাড়ীতে ঢুকবার আগে মালিকের অনুমতি নিতে হবে। সে বাড়ী ছেড়ে যাবার আগে দেখতে হবে যেন সব জিনিসপত্র ঠিক ঠাক থাকে। আর, সবসময়ই বাড়ীর লোকজনকে ধন্যবাদ দেবে (কথাবার্তা বলার সময়)। ২। বাড়ীটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। ৩। জনসাধারণের কাছে শিষ্টতা দেখাবে এবং তাদেরকে সব রকমে সাহায্য করবে। ৪। ধার-নেওয়া জিনিসগুলো সব ফিরিয়ে দেবে। জনসাধারণের কাছ থেকে কোন জিনিসই কেড়েকুড়ে নেবে না। ৫। ক্ষতিগ্রস্থ জিনিসগুলো সব বদলিয়ে দেবে। ৬। সততা রাখবে; যে জিনিসই কেন না কেন তার বাজার দরে দাম দেবে। ৭। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ক'রে চলবে। জনসাধারণের বাড়ী থেকে বেশ কিছু দূরে পায়খানা বানাবে। ৮। বন্দীদের হত্যা করবে না, বা তাদের কাছ থেকে কোন কিছু-জোর ক'রে কেড়ে নেবে না।

এই নিয়মগুলো দেখে আমাদের তাজ্জবই লাগবার কথা। আমরা যে ধরণের সৈন্য দেখতে বা যাদের গল্প শুনতে অভ্যস্ত তাদের আচরণ থেকে এ একেবারেই আলাদা। আমরা জানি সৈন্য হ'লেই তাকে অশিক্ষিত, বর্বর, অমানুষ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, লুণ্ঠনবিলাসী হতে হবে। সমাজের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। মা-বোনের ইজ্জত রাখতে জানবে না। তাই, তাদের নাম শুনলেই আমরা আগে মা-বোনদের সরাতে ব্যস্ত থাকি। আমরা যে সৈন্যদের কথা শুনি তারা স্বভাবগত দুর্নীতিতে যে বেড়ে ওঠে তা নয়। তারা একদিন সমাজেরই জীব ছিলো হয়তো—কিন্তু, সৈনিকবৃত্তি নিয়েই তারা ওরকম হ'য়ে ওঠে। তাদের প্রতিবেশই তাদের ওরকম ক'রে তোলে। সমাজ থেকে তাদের ইচ্ছে

করেই আলাদা রাখা হয়—যাতে সমাজের সুখদুঃখের গতিধারায় সে চঞ্চল না হ'য়ে ওঠে। পরের সম্পত্তি কাড়ার জন্যই তাদের সৃষ্টি—তাই, লুণ্ঠনবৃত্তির প্রেরণাই পেয়ে থাকে তারা। সমাজ-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থেকে তারা মানবীয় গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই, অমানুষ-পশুর মত উগ্র-কদর্য ব্যবহার তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অফিসারের জুতো আর লাথি, কদর্য ভাষা, অশ্লীল গালাগালি শুনেই এক চরম দারিদ্র্য ও আত্মাবমাননার মধ্যেই তার দিন কাটে—তাই, মন আর অবচেতন মনে তার শুধু বিষাক্ত ইচ্ছা আর কামনার দানা সঞ্চিত হয়ে থাকলে তাকে দোষ দেব কি বলে! অভিযোগই বা আনব কী তার বিরুদ্ধে! সাম্রাজ্যবাদের অবৈধ স্বার্থ রক্ষা করেই যার দিন কাটে, পরের বুকে ছুরি মেরেই যে নিজ অভিশপ্ত দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলতে চেয়েছে—সাধ্য কি তার কোন আদর্শকে আঁকড়িয়ে থাকে!

তাই, জনস্বার্থের প্রতিকূলতা ক'রেই যখন সাম্রাজ্যবাদী পল্টনের স্বার্থ সিদ্ধ হয় তখন স্বার্থকে একান্ত ক'রে মেনে নিয়েই লালফৌজের শক্তি সার্থক হ'য়ে ওঠে। "We are the fist of the people"—আমরা জনগণের বজ্রমুষ্টি—একথার স্বার্থকতাও ওইখানে। ফলে, জনসাধারণ লালফৌজকে নিজের স্বার্থরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ সারথী মনে ক'রে তাকে খাবার দেয়, বিপদে-আপদে সাহায্য করে, আহত হ'লে নিজের জীবন বিপন্ন করেও সেবা করে—শত্রুর চলাচলের মূল্যবান্ খবর দিয়ে জয়ে সহযোগিতা করে। প্রয়োজন হ'লে হাতিয়ার নিয়ে লড়েও।

চীনা লালফৌজের পরিচয় তার অষ্টম রুট আর্মি এবং নতুন চতুর্থ আর্মি—শোনা যায় আরও একটা আর্মি নাকি এর মধ্যে গড়ে উঠেছে। এই আর্মির প্রধান লড়াইএর কায়দা গেরিলাসুলভ হ'লেও Regular Armyর মতই এটা অনেকটা কাজ করে থাকে। এতে ভর্তি হওয়াটা

বাধ্যতামূলক কোনদিনই ছিলো না, আজও নয়—ভলান্টিয়াররাই এতে এসে যোগ দেয়। এইসব সংগঠনে খুব সাহায্য পাওয়া যায় লালফৌজের জার্মাণ উপদেষ্টা Li-tehর কাছ থেকে। ইনিই একমাত্র বিদেশী যিনি চীনা লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। গত যুদ্ধের সময় Li-teh জার্মাণ সৈন্যদলে খ্যাতি লাভ করেন। পরে, তিনি রুশিয়ায় লালফৌজের Division Commander হন। অতীতের উজ্জ্বল অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইনি চীনা লালফৌজকে শক্তিশালী ক'রে তোলেন।

গেরিলা যুদ্ধই চীনের মাটিতে সবচেয়ে কার্যকরী যুদ্ধ। প্রথমত চীনের গ্রামগুলো একেবারেই নিঃস্ব—ফলে, চাষীরা যে কোন রকম পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ, এবং সেই পরিবর্তনকে সম্ভব করে তুলবার জন্য তারা লড়াই করতেও রাজী। দ্বিতীয়ত, ভৌগালিক দুর্গমতাও এই লড়াইএর অনুকূল। রাস্তা-ঘাট, রেললাইনের অভাবে যন্ত্রযুদ্ধ অচল —ফলে গেরিলাদের অবাধ রাজত্ব। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী ঘাঁটিগুলোর বিস্তৃত ব্যবধান—ফলে, সেই সব মুক্ত জায়গায় আপন ইচ্ছামত সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে গেরিলা দল। চতুর্থত, সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের মুখে সমস্ত বিপ্লবীকেই প্রায় দেশের ভেতরে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো—ফলে, সেই সমস্ত বিপ্লবীই গেরিলা বাহিনী পুষ্ট করে তোলে। গেরিলা লড়াই প্রাচীন হলেও আধুনিক যন্ত্রশক্তির সাহায্যে এর কার্যকারিতাও আগের চেয়ে বেশী বেড়েছে। এদের গতিই এদের প্রাণশক্তি। রসদের জন্যে এদের মোটেই ভাবতে হয় না—শত্রুসৈন্যই এদের চলন্ত রসদের কাজ করে। খাবারের ভাবনাও নেই। খবরা-খবরের জন্যে ভাড়াটে গুপ্তচর দরকার হয়না। বিশ্বস্ত গ্রামবাসী তার চেয়ে সুদক্ষ কাজ করে থাকে। পথ ঘাট তাদের নখদর্পণে। হালকা সরঞ্জাম, হালকা জীবন, দুঃসাহসিক প্রাণ, মহান আদর্শ নিয়ে এরা

বাঘের মত অপ্রস্তুত শত্রুর ওপর লাফিয়ে পড়ে—বাঘের মতই শিকার আয়ত্তে এনে তবে ছাড়ে। নীচের এই নিয়মগুলো পালন করে চলে বলেই এদের অসাফল্য বিশেষ দেখা যায় না। (১) হারবার মত কোন যুদ্ধ এরা করে না। (২) আক্রমণ করে অতর্কিতে—আক্রমণের ক্ষিপ্রতা এদের প্রধান অস্ত্র। অন্য অস্ত্র (৩) আক্রমণের সযত্ন এবং সুবিস্তৃত পরিকল্পনা। (৪) রীতিমত লড়াইএ এদের শক্তির আধিক্য। (৫) চরম স্থিতিস্থাপকতা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার গুণ এদের অপরিহার্য। (৬) শত্রুকে অন্যমনস্ক করা। (৭) শত্রুর প্রধান শক্তির সঙ্গে লড়াই এড়িয়ে চলা। (৮) প্রধান গেরিলা সৈন্য-দলের সন্ধান না দেবার সবরকম ব্যবস্থা করা।

এই নীতির ফলেই গেরিলা সৈন্য অজেয়। তাদের সফলতা নিরঙ্কুশ। বরফের দেশে শ্বেতহস্তী বা শীল মাছকে খুঁজে বের করা যেমন মুস্কিল—গেরিলাদেরও জনসাধারণ থেকে আলাদা করে খুঁজে বের করা তেমনি মুস্কিল। প্রতিবেশের সাথে তারা এমন ভাবেই এক হয়ে মিশে থাকে। জনসাধারণ তাদের এমনি সহজ প্রতিবেশ।

কর্মচঞ্চল চীনা সোভিয়েট

কিয়াংসির মাটিতেই কমিউনিষ্টরা সর্বপ্রথম তাদের মার্ক্সীয় নীতির বাস্তব প্রয়োগের সুবিধা পায়। কিন্তু, তাই বলে যদি কেউ মনে করেন যে কমিউনিষ্টরা তাদের বাঁধাধরা সাম্যবাদী ফরমুলা কতকগুলো এখানে

কাজে খাটাতে সুরু করলেন তবে মস্ত বড় ভুল করা হবে। গোড়া থেকেই মনে রাখা ভালো যে সাম্যবাদ ওষুধের বিজ্ঞাপন পত্রের মতো কতকগুলো বাঁধাধরা বুলি নয় যে প্রাচীরের গায়ে, গাছের গুঁড়িতে ইলেক্‌ট্রিক পোষ্টে মেরে গেলেই হলো। অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে ওঠে—পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না থাকলে হাজার চেষ্টায়ও সাম্যবাদী সমাজকে টেনে আনা যায় না। সমাজের পটভূমিতেই এর সৃষ্টির মশলা তৈরী হয়। এই মশলা তৈরী হবারও সময় আছে। ইচ্ছে করলে যখন তখন তাকে তৈরী করা যায় না। তবে, সময়ের ফেরে তৈরী করাটা কখনও কখনও সহজ হয়ে থাকে বটে। যেমন, রুশিয়ায় শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বই লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এষ্টোনিয়া প্রভৃতি দেশে নিরক্ত সোভিয়েট বিপ্লব সম্ভব করেছিলো এবং সহজ করেছিলো।

কিয়াংসিতে যখন সোভিয়েট গড়ে উঠলো তখনও সেখানে সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ পুরোদমে বজায় রয়েছে। বুর্জোয়াবিপ্লবের কোন অস্তিত্বই নেই। কিন্তু বুর্জোয়াবিপ্লব হ'লেই যে বুর্জোয়ার হাতেই তার নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে হ'বে এই মেনশিভিকী যুক্তিও আবার বুর্জোয়াসুবিধাবাদী নীতি। ১৯০৫ সালে লণ্ডনে যখন সোস্যাল্ ডিমোক্রাটিক পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস হয়, সেখানে এই বিষয় নিয়েই মেনশিভকদের সাথে লেনিনের দলের গণ্ডগোল লেগে যায়—ফলে, দুটো দলের দুটো আলাদা কংগ্রেস হয়। এখানে বলশেভিক কংগ্রেস সর্বহারার ওপরই বুর্জোয়াবিপ্লবের সম্পূর্ণতার দায়িত্ব দিয়েছিলো। 'Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution' আলোচনায় লেনিন্ ব'লেছেন—"Proletariat can and must be the Leader of the Bourgeois-

Democratic Revolution "—অর্থাৎ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা সর্বহারা হ'তে পারে এবং তাকে হ'তেই হবে। অবশ্য, তিনি স্বীকার ক'রেছিলেন—"It is incapable of directly overlapping the bounds of a mere Democratic Revolution"—অর্থাৎ, সোজাসুজি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া এর (সর্বহারার) পক্ষে অসম্ভব।

তাই, চীনের কিয়াংসি প্রদেশে, সামন্ততন্ত্রের জীর্ণতার জন্য এবং বুর্জোয়াদের অক্ষমতার জন্য সমাজতন্ত্রের বাণী নিয়ে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হ'লো বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্র তখনও বহু দূর। কেননা চীনের এ অঞ্চলে তখনও গণতান্ত্রিক বিপ্লব একরকম সুরু হয় নাই বলা চলে। সমাজ-তান্ত্রিক সম্বন্ধের বন্ধনদশায় জনসাধারণের জীবন জর্জর। কৃষকশ্রেণী তখনও একরকম সামন্তের ভূমিদাসে পরিণত হ'য়ে আছে। অথচ, যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করবে তারই সৃষ্টি হয়নি তখনও। শুধু মার্ক্সবাদে সচেতন কয়েকজন শক্তিশালী সেনানায়ক শ্রেণী-সচেতন কয়েকদল ফৌজের সাহায্যে সোভিয়েটের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব এড়িয়ে তাঁরা সোজাসুজি সমাজতন্ত্রে পৌঁছবেন কোন্ রাস্তায়! খিড়কির পথ বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদের পথ নয়। এ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের কল্পনা-সৃষ্ট সমাজতন্ত্র নয় যে কিছু টাকা খরচ ক'রেই রাতারাতি সমাজতন্ত্রবাদের কাঠামো তৈরী করা যাবে। যে মশলায় সমাজতন্ত্রবাদ তৈরী হ'তে পারে সে মশলাই তখন তৈরী হয়নি'। আর, সে মশলার উপযুক্ত ক্ষেত্রও কিয়াংসি নয় বা কিয়াংসি হ'তে পারে না। সাংহাই বা ক্যাণ্টন তার প্রসূতি হ'তে পারত। হ্যাঙ্কৌ বা পিকিং-এ তার অস্তিত্ব কল্পনা করা চ'লতো—কিন্তু, কিয়াংসির অনুর্বর ক্ষেত্রে তার সৃষ্টির আবাহনী সঙ্গীতই

শুধু গাওয়া চ'লতে পারে। কমিউনিষ্টরা তাই করেছিলো। তাদের আগাগোড়া উদ্দেশ্য ছিলো "to build a military and political base for the extention of the Revolution on a wider and deeper scale, rather than to try out Communism in China".—কমিউনিজম্ এর পরীক্ষা না চালিয়ে ব্যাপক এবং গভীর ভাবে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দেবার জন্য একটা সামরিক এবং রাজনৈতিক ঘাঁটি তৈরী করতে চেয়েছিলী তারা। কিয়াংসি থেকেই তাদের সে উদ্দেশ্য দানা বাঁধতে থাকে।

চীন রুশিয়ার মত প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ ব'লেই রুশবিপ্লবের মত কৃষকদের সহযোগিতা (বিপ্লবে) অপরিহার্য ছিলো। রুশবিপ্লবের সাফল্যের একটা প্রধান কারণ শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগিতা। প্রতিক্রিয়াশীল মেনশেভিকরা বরাবরই কৃষকদের সাথে শ্রমিকদের সহযোগিতার প্রতিকূলতা ক'রে এসেছে। বলেছে, কৃষকরা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের রিজার্ভ হিসেবেই কাজ ক'রে থাকে। লেনিনের অদ্ভুত প্রতিভাই শুধু সর্বহারা বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী সর্ত হিসেবে কৃষকের সহযোগিতাকে (বিশেষত কৃষিপ্রধান দেশে) একটা প্রধান স্থান দেয়। এই সহযোগিতা সর্বহারা দলের বাস্তব কার্যপদ্ধতির ভেতর দিয়ে না হ'য়ে উঠলে—হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, জার্মাণী প্রভৃতি দেশের বিপ্লবের মতই রুশবিপ্লবও মাঝপথেই ঝরে যেতো। লেনিনের দূরদৃষ্টিই শুধু সর্বহারা বিপ্লবে কৃষকের অবদানকে তার তুল্য মর্যাদা দিয়ে স্বীকার ক'রে নেয়। তাই, বিপ্লব এবং ঘরোয়া যুদ্ধের অভূতপূর্ব দুর্যোগের মধ্যেও সোভিয়েট-বিপ্লব ভেঙ্গে পড়েনি। তবু রুশিয়াতে ধনতন্ত্রের বিপুল প্রসারের জন্য এক শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ এবং বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বহারার

অস্তিত্ব ছিল। তাহ'লে চীনের বিপ্লবে কৃষকের অংশ কত গুরুত্বপূর্ণ তার মোটামুটি একটা আভাস এ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

চীনের সর্বহারা নানা মালিকানার চাপে বিচ্ছিন্ন। চীনের শিল্পোন্নত এলাকা ব'লতে একমাত্র তার সাংহাইকেই বোঝায়। এই সাংহাইয়েই চীনের শতকরা সত্তর ভাগ কল-কারখানা কেন্দ্রিত হ'য়েছে। নানা বিদেশী স্বার্থের অন্তর্গত হ'য়ে সেসব কল-কারখানা যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সৃষ্টি ক'রেছিলো, একের সাথে আর একজনের সংযোগ নাই। ফলে, শ্রমিকশ্রেণী দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। যদিও Chou-en-Lai অল্পদিনের চেষ্টায় সেখানে শ্রমিকদের এক সংগঠন গড়ে তোলেন এবং তাঁরই সাহায্যে চিয়াংকাইশেক সহজেই ক্ষমতা হাত ক'রে ফেলেন। তারপর থেকে নেতাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এবং নিজেদের অনিবার্য দুর্বলতায় (পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার জন্য) সাংহাই-এর সর্বহারা জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ কোন শক্তিশালী ভূমিকার অভিনয় করতে পারেনি।

তারপর, প্রধানত কৃষিজীবী হওয়ায় এবং সামন্ততন্ত্রের আওতায় থাকতে বাধ্য হওয়ায় কৃষিসমস্যার উপরই চীনের [illegible]তীয় আন্[illegible] সব [illegible]ম্ভাবনা নির্ভরশীল হ'য়ে উঠছিল [illegible] [illegible], চীনা কৃষক [illegible] কাঙাল। মহা[illegible]নের খপ্পরে এবং সামন্ত জমিদারের [illegible] হ'য়ে কৃষক চীন নিঃস্ব হ'য়ে যায়। জমির [illegible] মীমাংসা করা ছাড়া জাতীয় আন্দোলনে চীনা কৃষকের ভূমিকা [illegible]। তাই, কিয়াংসিতে এসে চীনারা এই পতিত [illegible]থচ [illegible] সঙ্কল্প করে।

প্রথমেই তারা বড় বড় জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত [illegible] নিয়ে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দিতে আরম্ভ করে। মহা[illegible] তাড়িয়ে

দিয়ে আজন্ম-ঋণের দাসত্বের হাত থেকে কৃষকদের মুক্ত করে। এই ভাবে পুরুষানুক্রমিক ঋণ-দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে—উপরন্তু জমির মালিক হ'য়ে—চীনা কৃষক এই সর্বপ্রথম জীবনকে নতুন ভাবে ভাবতে আরম্ভ করলো। বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত হাজার হাজার বছরের থমকানো জীবনস্রোত হঠাৎ ফুলে, ফেঁপে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে দেশের মাটিতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করলো। যে মাটি ছিলো ধূসর, অনুর্বরতায় হলুদ—দেখতে দেখতে তাতে কচি পাতার শ্যামলতা সজীব রং মাখিয়ে দিল। কমিউনিষ্টদল নতুন যুগের এই দায়িত্ব পালন করায় জনসাধারণের চোখে কমিউনিজ্‌ম্ শুধু দল আর তার নীতি হিসেবেই দেখা দিলো না—কমিউনিজ্‌ম্ হ'য়ে উঠলো এক নতুন জীবনের মূর্ত প্রতীক। কৃষিবিপ্লবের জোয়ার বেয়ে সোভিয়েটসভ্যতা এমনি এগিয়ে চ'ললো।

কমিউনিষ্টরা জনসাধারণের হাতে শুধু জমিই তুলে দিল না—প্রথম প্রথম সে জমি থেকে খাজনাও রেহাই দেওয়া হ'লো। কয়েকবছর পর থেকে অবশ্য সামান্য পরিমাণে কিছু খাজানা আদায় করা হ'তো। কিন্তু, খাজনা ও ট্যাক্সে দুর্বিষহ জীবন চীনা কৃষকদের কাছে সেটা অবাধ ভোগেরই সামিল। কিন্তু জমি যখন হাতে এলো তখন তাকে রক্ষার দায়িত্বও হাতে আনা চাই। পলাতক জমিদার মহাজনরা মিন্-টু-আন্ (Min-tu-an) নামে এক বাহিনী সৃষ্টি করে তাদের হারানো জমির পুনরুদ্ধারে মন দিল। জারের আমলের Black Hundred দলের মত এরা নৃশংস তৎপরতায় কায়েমী স্বার্থকে টিকিয়ে রাখবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। নতুন অধিকারকে রক্ষা করবার অধীর উন্মাদনায় চীনা কৃষকের প্রয়োজন হ'য়ে উঠলো অস্ত্রের, প্রয়োজন হ'য়ে উঠলো দল বাঁধার। সে অস্ত্র নিঃশঙ্কচিত্তে

কমিউনিষ্টরা তাদের হাতে তুলে দিলো। ফলে, লালফৌজের সাথে গেরিলাদলের শক্তি অভূতপূর্বভাবে বেড়ে উঠলো। "Struggle for bread is a struggle for Socialism"—অর্থাৎ, রুটির লড়াই-ই সমাজতন্ত্রের লড়াই—লেনিনের একথা সার্থক হ'য়ে উঠলো। চীনের বর্তমান অবস্থায় এই-ই হ'য়ে উঠলো সমাজতন্ত্রের লড়াই। এ থেকেই বোঝা যায় সমাজতন্ত্র বোঝার মত একটা চাপান' জিনিস নয়—সমাজতন্ত্র জীবন সংগ্রামের সহজ এবং অনিবার্য পরিণতি। চলার প্রয়োজনে নদী যেটুকু ভাঙ্গার ভাঙ্গে, যেটুকু গড়ার গড়ে। একটুও বাহুল্য নেই তাতে। জীবনধারার পথেও ওই ভাঙ্গন কখনও প্রয়োজন হয়, ওই গড়াও কখনও অনিবার্য হ'য়ে ওঠে (নদীর তাগিদের মত জীবনেরই তাগিদে তা হয়। জোর করে তাকে অন্য পথে যদি বা নেওয়া যায় তা স্থায়ী হয় না)। তাই, সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক সর্ত যে মুক্ত জমি, এইভাবে তা পাওয়া গেল এবং এই পাওয়ানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব শুধু পালন করলো কমিউনিষ্টরা। এইভাবে চীনের রূপান্তরের দিক দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি একটা শক্তিশালী অংশ হ'য়ে উঠতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। কমিউনিজ্‌মে সম্পূর্ণ সায় না থাকলেও Pringle, Gunther, Edgar Snow প্রভৃতি ঐতিহাসিক সবাই একথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

কমিউনিষ্ট ও চীনের নতুন শিক্ষাপদ্ধতি

"Revolution is the locomotive of History"—বিপ্লব ইতিহাসের গতিবেগ—এই কথা সঠিক হয়ে উঠতে লাগলো চীনে। শতাব্দীর আবর্জনায় চীনের ইতিহাসের গতি বোবা হয়ে উঠেছিলো—এই কৃষিবিপ্লবের ফলে সেই বোবা ইতিহাসে মুখরতা দেখা দিলো। কমিউনিষ্টরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানত, দেহের প্রধান অভাবগুলো বজায় রেখে শিক্ষা-সংস্কৃতির সূক্ষ্ম চিন্তালোকে বিচরণ সম্ভব নয়। তাই, তারা প্রথমেই চীনা কৃষকদের দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার দিকেই প্রথম নজর দেয়। কৃষকদের ভিতর প্রয়োজনমত জমি বিলিয়ে দিয়ে তাদের মহাজনের শোষণ এবং আরও বহুরকম নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে সংস্কৃতির প্রথম বনিয়াদ তৈরী করলো। অভাবের চিন্তা থেকে ওদের জীবনকে একটু হালকা করার সাথে সাথেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে কমিউনিষ্টরা মন দিলো। চীনা বর্ণমালার ওই গুরুগম্ভীর আকৃতিকে কাটছাঁট দিয়ে ওরা অনেক হাল্কা করে নিল। যেখানে কয়েক হাজার চীনা বর্ণমালা ছিলো, সেখানে শোনা যায়, মাত্র আঠাশটা অক্ষরেই এরা কাজ সেরে নিল। ফলে, শিক্ষা অনেক সহজ এবং হাল্কা হ'য়ে গেলো। অশিক্ষিত-অজ্ঞ জনসাধারণ দেখতে দেখতে শিক্ষার আলোয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করলো। প্রয়োজনের তাগিদেই নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়। জনসাধারণের প্রয়োজনেই এইভাবে শিক্ষায়ও নতুন ধারার সৃষ্টি হলো। গণশিক্ষা শুধু বর্ণমালার সাহায্যেই দেওয়া হয় না বা চলে না। গান, নাচ, নাটক ইত্যাদির ভেতর দিয়ে শিক্ষার পরিমাণ বাড়ে এবং সময় সংক্ষেপ হয়। এই সমস্ত গাননাচের ভেতর দিয়েই নতুন জীবনের

ইঙ্গিত তুলে ধরা হ'লো—পুরোনো জীবনের রীতিনীতির ভেতর দিয়েই। এতদিন সংস্কৃতির ধারা ছিলো জনসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য—তাই, তাতে শিক্ষণীয় অনেক কিছু থাকলেও জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু, এই গণসংস্কৃতি গণজীবনের বিশিষ্ট ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠায় তা যেমন সুবোধ্য তেমনি আনন্দদায়ক ও আকৃষ্টকর হ'য়ে উঠলো। আনন্দ ও উৎসাহের ভেতর দিয়ে শিক্ষালাভ সহজ ও অনাড়ম্বর হয়ে পড়লো। এইভাবে জীবনের সাথে আবার শিক্ষার সংযোগ ঘটে গেলো।

চীনা সংস্কৃতির ইতিহাসে ডাক্তার Hu-shir দান অসামান্য। শোনা যায়, তিনি এমন পণ্ডিত ছিলেন যে তাঁকে যখন আমেরিকায় চীনা দূত করে পাঠান হয়, তখন কূটনীতির ক্ষেত্রে তাঁকে এঁটে ওঠার জন্যই চারজন জাপানী দূতকে আমেরিকায় মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ডাক্তার Hu-shi চীনের নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করেন। কমিউনিষ্টদের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এঁর নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনেক সাহায্য করেছিলো বলেই মনে হয়।

এইভাবে শতকরা আশিজন নিরক্ষর চীনা নরনারী নতুন শিক্ষার সংস্পর্শে এসে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেলো। অবশ্য, কমিউনিষ্টদের শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রচার বলে কেউ কেউ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন—শিক্ষার নামে ওরা রাজনৈতিক বুলি কতকগুলো মুখস্থ করায়। যেমন, একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—Edgard Snow এক জায়গায় (Shensi প্রদেশে) ছোট ছেলেদের শিক্ষাপদ্ধতি দেখতে গিয়ে দেখেন তাদের শেখান হচ্ছে—

প্রঃ—What is this ? (এটা কি ?)

উঃ—This is the Red flag (এটা লালপতাকা)।

প্রঃ—(What is this)? (এ কে?)—This is a poor man (এ একজন গরীব)।

প্রঃ—What is the Red flag? (লাল পতাকা কি?)

উঃ—The Red flag is the flag of the Red Army (লাল-ফৌজের পতাকা হচ্ছে লালপতাকা।)

প্রঃ—What is the Red Army? (লালফৌজ কি?)

উঃ—The Red Army is the Army of the poor man (লালফৌজ হচ্ছে গরীবের ফৌজ)।

এই ধরণের শিক্ষা শুধু মৌলিক নয়—তাদের বইতেও এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতি ছাপান হয়েছে।

এই সমালোচনার উত্তরে বলা চলতে পারে—শ্রেণীসংগ্রাম যখন দানা বেঁধে ওঠে সেই উত্তেজনা ও আলোড়নের দিনে খানিকটা প্রচার সব কিছুর মধ্যেই মিশে যায়। এটা সকলের কাম্য না হলেও জীবন-সংগ্রামের একটা স্তরের অনিবার্য পরিণতি। অবশ্য, প্রচার বলতে বোঝায় এমন কিছু যা বাস্তবে অনেকটাই অসত্য, কিন্তু চীনা ছাত্রের জীবনের সামনে যে সমস্যা এসেছিলো উপরের শিক্ষার বিষয়গুলো তা থেকে মোটেই পৃথক নয়। শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য যদি জীবন-জিজ্ঞাসার মীমাংসা হয় তবে চীনা ছাত্রের কাছে এর ফলাফল ব্যর্থ হয় নি—কেননা, বিপ্লবের যুগে লালফৌজ, লালপতাকা শুধু তাদের জীবনের সব চাইতে বড় প্রশ্নের মীমাংসার জন্যেই সংগ্রাম করছিলো তাই নয়—সেই সংগ্রামের সৈনিক হিসেবে তাদেরও কঠোর অংশ নিতে হয়েছিলো। তাই, বাস্তবে যেটা ঘটছিলো শিক্ষাব্যবস্থায় তার স্বীকৃতিতে সেটা অস্বাভাবিক বা প্রচারসুলভ কিছু হয় নি, বরং বাস্তবের মুখ্য প্রশ্নকে স্থান দিয়ে শিক্ষার কদরই বাড়িয়েছিল। অবশ্য, তার মানে

এই নয় যে শুধু তোতাপাখীর মতো এগুলো আওড়ে যাওয়াই তাদের শিক্ষার সার্থকতা। বরং Snow সাহেব নিজেই লিখেছেন—নানারকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছাত্রদের জন্য করা হয়েছিলো। "Science is the hand-maid of Communism" বিজ্ঞান সাম্যবাদের পরিচারিকা—এই একটা কথার মধ্যেই কমিউনিষ্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ নয় তাই, অসীম পরিধি নিয়েই বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদকে লালন করবে এই আশাই স্বাভাবিক। এই শিক্ষাপদ্ধতির ফলে জনসাধারণের মনে এই প্রথম জানবার, শেখবার, বুঝবার কৌতূহল জেগে উঠলো। এই কৌতূহলী মনে মীমাংসার সন্ধান দেওয়াই শিক্ষার চরম সার্থকতা।

প্রথমে ছোটদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হলো। উৎপাদন-ব্যবস্থা দুর্বল ছিলো বলে নানারকম অসুবিধা ঘটতে লাগলো শিক্ষার উপকরণের দিক দিয়ে। বই নেই, পেন্সিল নেই, কালি নেই, কলম নেই—এমনকি স্কুল ঘরের পর্যন্ত অভাব। বাধ্য হয়ে অন্যান্য স্কুল-উপকরণের সাহায্যে এসব অভাব দূর করা হতে লাগলো অনেকটা—যেমন, তেঁতুলের বীচি দিয়ে গোনা শেখানো হতো আমাদের দেশে আগে। বেঞ্চের অভাবে ইঁট বা ছালা পেতে কাজ চালানো হতো। স্কুল ঘরের অভাবে গাছতলা অথবা খোলা মাঠ—পরে, পাহাড়ের গুহায় সে কাজ চালিয়ে নেওয়া হতো। শিক্ষাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে বাইরের এই সব সরঞ্জাম খুব অসুবিধা সৃষ্টি করলেও, কাজ বন্ধ করতে পারল না। ছেলেদের প্রথমে লেখাপড়া শেখান চলে—পরে তারাই আবার গিয়ে তাদের বাপমার মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে তুলতে লাগলো। মাথার ওপরকার শোষণ, শাসন ও ভ্রূকুটি ঝেড়ে ফেলে ভারমুক্ত হয়ে বড়রাও এইভাবে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে বাঁচলো।

যুগ-যুগান্তের অচলায়তনে এগিয়ে যাওয়ার ছন্দের দোলা লাগলো। ভঙ্গুর সংস্কারের জমাট প্রতিরোধের প্রাচীরে ফাটল ধরলো। অন্ধ ঈর্ষায় অতীত যাদের পেছনে টেনে রাখতে চেয়েছিলো, তাদের কানে এসে ঢুকলো আগামী দিনের সঙ্গীত। সে সঙ্গীতে ছিলো মুক্তি ও সৃষ্টির বাণী।

Electrification plus liquidation of illiteracy—বিদ্যুতাভরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ এই তো কমিউনিজম—লেনিন বলেছিলেন। শেষোক্তটির দিকে এক পা এগিয়ে কমিউনিষ্টরা সে কথাকে আংশিক সত্য করে তুললো। কিন্তু শিল্প গড়ে তোলার বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা—আজও সেটা সম্ভাবনাই রয়ে গেছে। সে দায়িত্ব আরও কঠোর, কিন্তু সে দায়িত্বই মৌলিক। সে মৌলিক দায়িত্ব পালনের ইতিহাসই কমিউনিষ্টদের আসছে-দিনের ইতিহাস।

সাংস্কৃতিক জীবনের মূল ধাপ হচ্ছে এইগুলো,—অশিক্ষা দূর করা, কাজ করতে শেখা, কলকব্জার জ্ঞান আয়ত্ত করতে শেখা এবং শাসনকাজে পারদর্শিতা লাভ করা। কিন্তু এই ধাপগুলো যাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় উন্নত শিল্পব্যবস্থা। কলকারখানা বৈদ্যুতিক শক্তির ওপরই উন্নত সমাজের প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ভর করে। আবিসিনিয়ার অরণ্যভূমিতে, মরক্কোর বালুময় প্রান্তরে অথবা তিব্বতের পাহাড়ী আবেষ্টনীতে উন্নত সমাজের অন্বেষণে ছোটা বৃথা। যাযাবরদের সাংস্কৃতিক জীবনে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিলো সোভিয়েট রুশিয়ার ভারী কল-কারখানা গড়ে তোলার, বিদ্যুতের বড় বড় আগার সৃষ্টির। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতার সাথে যেমন যেমন অজস্র নতুন কলকারখানা তৈরী হয়েছিলো রুশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনও ততই উন্নত হয়েছিলো। একটা কথা আছে—"Machine is the

great emancipator of masses from primitive poverty and the idiocy of village life"—অর্থাৎ আদিম দারিদ্র্য এবং গ্রাম্য-জীবনের মূঢ়তা থেকে জনসাধারণের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতা হচ্ছে যন্ত্র।

প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যের মাপকাঠিতেই সংস্কৃতির বিচার হয়। তাই, সোভিয়েট চীনে শোষণহীন এক উন্নত সমাজ জীবনের ভিত্তি তৈরী হলেও সে সংস্কৃতি মানুষের পূর্ণ বিকাশের সাথে তাল রাখতে পারল না। কেননা, সোভিয়েট চীনে যে সংস্কৃতির গোড়া-পত্তন হলো তার পটভূমিকায় রইলো কৃষিজীবন যা মানুষের অনগ্রসরতার চিহ্ন। চেষ্টা করলেও কলকারখানা গড়া সম্ভব হচ্ছিলো না সোভিয়েট চীনে—প্রথমত, নানকিং গবর্ণমেণ্টের অবরোধ, দ্বিতীয়ত, মূলধনের অভাব। কিছুটা কিছুটা যা কল কারখানা তৈরী হলো তাকে সন্তোষজনক বলা যায় না। ফলে, উন্নত সংস্কৃতির প্রচুর সম্ভাবনা নিয়েও সোভিয়েট চীনের সংস্কৃতির স্তর অনেক নীচেই রইলো। তবে, মুক্ত জীবনের পটভূমিতে মানসজীবনের কিছু উন্নত রূপায়ণ হ'লো বৈকি। যন্ত্রের অভাব খানিকটা এইভাবে দূর হয়েছিলো। তাই, হাজার হাজার বছরের অন্ধ কুসংস্কার কৃষকের কাছে ক্রমে অস্পৃশ্য হ'য়ে উঠছিলো।

যৌন সমস্যা

"Women are human, but lower than men. It is the law of nature that woman should not be allowed any will of her own"—Confucius.—অর্থাৎ "মেয়েরা মানুষ বটে কিন্তু পুরুষের চেয়ে নীচুতে তাদের স্থান। মেয়েদের যে কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারবে না এটা প্রকৃতির নিয়ম।" এই হ'লো প্রাচীন চীনের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের (যাঁকে অতিমানুষ ব'লেই মনে করা হ'তো এবং এখনও কিছু কিছু মনে করা হয়) বাণী। অশেষ শ্রদ্ধার সাথেই চীন যে সে বাণী অনুসরণ ক'রে এসেছে সেটা বলা বাহুল্য। লাঙ্গল নিয়ে চাষ করার প্রথা আবিষ্কার হবার সাথে সাথে যখন মাতৃকর্তৃত্বশীল সমাজের অবসান হয় দেশে দেশে (বিভিন্ন সময়ে), তখন থেকেই সমাজের বুকে মেয়েদের অধিকার শিথিল হয়ে পড়ে। মেয়েদের স্থান সমাজে তখন থেকেই নীচে নেমে যায়। চীনেও তার অন্যথা হয় নি। চীনের মেয়েরা এতদিন সামাজিক অবিচারের ভার মাথায় বয়ে এসেছে। কনফ্যুসিয়াসের বাণীই তার সাক্ষী। অর্থনৈতিক দাসত্বের নিস্পেষণ যন্ত্রে তাদের রক্ত থেকে যে রঙীন্ সুরা তৈরী হ'য়েছে, তাকে উপভোগ করেছে আত্মাভিমানী চীনা পুরুষ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মেয়েরা পুরুষের এজমালী সম্পত্তির মতই গণ্য হ'য়ে এসেছে। চীনা কমিউনিষ্টরা যখন জমির ক্ষুধা থেকে চাষীদের মুক্তি দিলো তখন মেয়েদের মুক্তির অদম্য ক্ষুধা থেকেও তাদের বঞ্চিত করলো না। তাদের সামনে ছিলো লেনিনের অমর বাণী—"No nation can be free with

half of its population in the kitchen."—অর্ধেক জনসংখ্যাকে রান্নাঘরে পূরে কোন জাত স্বাধীন হতে পারে না। মেয়েদের এই মুক্তিকে বাস্তব করবার জন্য তার সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারও জুড়ে দেওয়া হ'লো। জনসাধারণকে নানারকমভাবে শেখানো হ'লো যে, মেয়েরা পুরুষদের সমান সব বিষয়েই—বিয়ের সময় ছেলে-মেয়ে উভয়ের মতেরই প্রয়োজন এবং উপপত্নী প্রথা (যা চীনে একরকম সামাজিক সচলতা লাভ করেছিলো--পার্লবাকের উপন্যাসেই তার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়) ভয়ানক দোষের। যুবক চীনের কাছে এ শিক্ষা সাদর অভ্যর্থনাই পেলো—কিন্তু সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীতে অভ্যস্ত বয়স্কদের কাছ থেকে পূর্ণ অনুমোদন পেতে সময়ের প্রয়োজন হয়েছিলো অনেক। তবে, সেরকম বাধা পেতে হয় নি—কেন না, পুরুষানুক্রমিক ধারণায় যখন একবার ঘা পড়ে তখন তার আঘাতে সব বিশ্বাসই শিথিল হ'য়ে যায়। যুগযুগান্ত যে জমিদার তার কাছে দেবতার মত সর্বশক্তিমান বলে বিবেচিত হ'তো সেই যখন প্রাণের দায়ে লোটা কম্বল সার ক'রে পালালো তার এতকালের দেবত্ব ছেড়ে, তখন আর কি কথা! রুশ বিপ্লবের পরে রুশিয়াতে এরকম বহু ঘটনা ঘটে। বিপ্লবের সফলতার পরে যখন জারের সম্বন্ধে, চার্চ বা পুরুতের সম্বন্ধে রুশ কৃষকের এতকালকার ধারণা বদলে গেলো, তখন দেখা গেলো তার উগ্র প্রতিক্রিয়া সুরু হ'য়েছে। কেউ বাইবেলের পৃষ্ঠা দিয়ে চুরুট তৈরী করে খাচ্ছে, কেউ এতকালের চার্চের গা থেকে ইট খুলে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ীর পায়খানা তৈরী করছে (Maurice Hindusএর Humanity uprooted দেখুন)।

বহুদিনের সংস্কারে ঘা পড়লে এমনি হয়। তাই, মানুষের অধিকার নিয়ে নারী যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো—সোভিয়েট চীনে, তখন সেটা

প্রথম প্রথম একটু অস্বাভাবিক মনে হ'লেও অসম্ভব মনে হ'লো না। এই নতুন ধারণা লাভ করে মেয়েরা যে উপপত্নীত্বের ঘৃণ্য পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তাতে অস্বাভাবিক কি আছে। এইভাবে মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পায়ের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চলতো—লোহার জুতোয় পা পূরে রাখা হ'তো যাতে পা বাড়তে না পারে—তারও অবসান হ'য়ে গেলো। নবীনার দল পায়ের এই মুক্তিতে জীবনের এক বড় যন্ত্রনার হাত থেকেই মুক্তি পেলো—তাই, সোভিয়েট চীনকে যে তারা সাদরে বরণ করবে একথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য চিয়াংকাইশেক কমিউনিষ্ট মেয়েদের উচ্ছেদের জিঘাংসায় যখন মেতে ওঠেন, তখন তিনি বেছে বেছে যত মেয়ের পা বড় এবং বব্ চুল আছে তাদেরই দফা শেষ করেছিলেন—যেন বড় পা আর বব্ চুল কমিউনিষ্টদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি।

মেয়েপুরুষের সমান এবং অবাধ মেলামেশার ফলে এই প্রথম চীনা সমাজে সুস্থ প্রেমের বিকাশ সম্ভবপর হ'য়ে উঠলো—ফলে, যৌন-জীবন সহজ এবং সবল বিকাশের পথে পা দিলো। "Communism must bring the joy of life and vigour which comes from completeness of love-life"—Lenin—প্রেমিক-জীবনের সম্পূর্ণতা থেকেই যে জীবনের আনন্দ এবং বলিষ্ঠতা আসে—সাম্যবাদকে সে স্ফূর্তি এবং সজীবতা আনতেই হবে। এই হ'লো লেনিনের কথা। শুধু লেনিনের কথাই নয়—এই হ'লো জীবনের মহাসত্য। এর আগে চীনা তরুণীদের বিয়েই হতো শুধু,—নিজেদের কোন ইচ্ছা বা উদ্যোগ তাতে থাকতে পেতো না। সোভিয়েট চীনে তরুণীরা বিয়েতে তাদের ইচ্ছা ও উদ্যম প্রকাশের স্বাধীনতা পেল। যেখানে বিয়ের অর্থ ছিলো একপক্ষের অত্যাচার, লাঞ্ছনা—সেখানে বিয়েটা হ'য়ে

উঠলো সৃষ্টি ও পরিপূর্ণতার সম্ভাবনায় ভরপুর। নৈতিকতা আগে ছিলো এক আধ্যাত্মিক নেশা বিশেষ—সমাজ বা বস্তুনিরপেক্ষ পদার্থ। আধ্যাত্মিকতার নামে কঠোর বিধি নিষেধের বন্ধনে, একতরফা অত্যাচারে নারীত্বের মহিমা থেকে যেতো অবিকশিত। শত অত্যাচারেও অত্যাচারী পুরুষের হাত থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় ছিলো না মেয়েদের। তাই, নৈতিকতা হয়ে উঠেছিলো উৎপীড়নের ছল বিশেষ। ভগবানের নামে মানুষের শাসন ও শোষণে যৌন জীবন হয়ে উঠেছিলো কলুষিত। এই জটিল যৌন-সম্বন্ধের হাত থেকে নারী মুক্তি পেলো সোভিয়েট সমাজে। নৈতিকতা হ'য়ে উঠলো জীবন দর্শী। বাস্তবের মাপকাঠিতে হ'লো তার বিচার। সমাজজীবনের পুষ্টিই হয়ে উঠলো তার নিরীখ। "Morality serves the purpose of helping human society to rise higher, to get rid of exploitation of labour."—মানুষের সমাজের উন্নত রূপান্তরে সাহায্য করা এবং শোষণের হাত থেকে মুক্তিই হ'য়ে উঠলো নৈতিকতার কষ্টিপাথর। এই নীতির ফলে সোভিয়েট সমাজে এক অভূতপূর্ব কর্মচঞ্চলতা দেখা দিল এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর সক্রিয় সহযোগিতায় সমাজ জীবন সার্থক হ'য়ে উঠলো। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার তারই পূর্ণ স্বীকৃতি।

গণিকাবৃত্তিও আইন ক'রে বন্ধ করে দেওয়া হ'লো। এ আইনকে সফল করবার জন্য ভদ্রভাবে জীবিকা উপার্জনের পথও মেয়েদের সামনে তুলে ধরা হ'লো। তাই, সনাতনী কাগজী আইন থেকে এই আইন প্রথম বাস্তবে কার্যকরী হবার সম্ভাবনা পেলো। ফলে, জীবন হ'য়ে উঠলো মসৃণ সুন্দর। আদর্শের সাথে বাস্তবের সংঘাত নেই—চিন্তার সাথে কাজের অমিল নেই। দারিদ্র্য আছে কিন্তু দারিদ্র্যের অপমান

নেই, নিগ্রহ নেই। অল্পের মধ্যে এই সুসামঞ্জস্য জীবনই সোভিয়েট চীনের দান।

কিন্তু, তবু সোভিয়েট চীনের এই সমস্ত ব্যবস্থা তারিফ করবার সময় তাকে যেন অহেতুক বাড়িয়ে না তুলি। মনে রাখতে হ'বে, সোভিয়েট চীনের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি তত পাকা ছিলো না যা থেকে একটা বড় দরের কিছু আশা করা যায়। আর্থিক জীবন সাবলীল না হলে আদর্শ ফলবতী হয় না পরিপূর্ণভাবে—তাই উন্নত জীবনের ভিত্তি সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সোভিয়েট জীবনে যথেষ্ট দোষ-ত্রুটি থাকবে এটাই সহজ সত্য। তবু, যার বনিয়াদ হলো গ্রাণাইটের মত দৃঢ় তার বুকে যে দৃঢ় হর্ম্যই গ'ড়ে উঠবে একদিন মশলা পেলে—এই আশাটুকু রাখা চলে হয়তো। শোষণের সম্ভাবনা সোভিয়েট চীনে নষ্ট হয়েছিলো এটাই তার সব চেয়ে বড় দান। এরই কষ্টিপাথরে সব কিছুকেই যাচাই করতে হবে।

কিয়াংসি সোভিয়েটের শেষ দিন

কিন্তু, যে ফুল যত সুন্দর (গন্ধ এবং সৌন্দর্য দুই মিলিয়ে) তার বিপদ তত বেশী। তার ফোটার পথে পোকার উৎপাত, রোদ-বৃষ্টির চক্রান্ত। ফুলের মত যে সোভিয়েট ফুটে উঠছিলো চীনের এক কোণে, ধ্বংসের পোকা তারই সন্ধানে জেগেছিল অহর্নিশ। যাদের স্বার্থে আঘাত দিয়ে সোভিয়েট গড়ে উঠছিলো, কায়েমী স্বার্থের সেই মুষ্টিমেয় মালিকেরা এর ধ্বংসের সব আয়োজন গড়ে তুলছিলো ও'দিকে। অন্ধ জিঘাংসায় চিয়াং চার চার বার অভিযান চালালেন সোভিয়েটকে ধ্বংস

করার জন্য—কিন্তু, প্রতিবারই অজস্র সুশিক্ষিত সৈন্য এবং সমরোপকরণ খুইয়ে তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়ে গেলো। সংঘবদ্ধ জনসাধারণই শুধু এ অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব করে তুলছিলো। নিজের জমির মালিক নিজে হলে মানুষ এমনি করেই লড়তে পারে। সে পরীক্ষা অনেকবার হয়ে গেছে ইউরোপে। খাস এসিয়ায় এই হয়তো প্রথম।

চিয়াংএর চতুর্থ অভিযান তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জা—"The greatest humiliation in his life"- পর পর এইভাবে ব্যর্থতার লজ্জায় চিয়াং বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝলেন, সোভিয়েট এলাকার সমস্ত লোককে এক এক করে ধ্বংস না করতে পারলে লাল পল্টনের পরাজয় অসম্ভব। তাই, শেষ পর্যন্ত জাপানীদের mopping up operationএর মত সব কিছু নির্মূল করার এক পরিকল্পনা করলেন। এ পরিকল্পনাকে বলা হয়ে থাকে—Three All Method—Kill All, Burn All, Loot All মারো, পোড়াও, লুট কর—এই নীতি নিয়ে তিনি তাঁর পঞ্চম অভিযান আরম্ভ করলেন। তাঁর জার্মাণ সামরিক উপদেষ্টার উপদেশ অনুযায়ী দখল করা এলাকায় Concrete Block-House তৈরী করারও এক পরিকল্পনা করা হলো—যাতে গেরিলা বাহিনী হঠাৎ কোনরকম ক্ষতি করতে না পারে। অর্থাৎ offensive and defensiveএর কৌশল একই সাথে গ্রহণ করা হ'লো। এ কৌশল ফ্যাসিবাদের কাছে শেখা—তাই, চিয়াংএর পুরোনো নীতি থেকে উন্নত। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, লোকজন নির্মূল করে তাঁর অভিযান এগিয়ে চললো। এবার সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সত্যিই টিকে থাকা অসম্ভব হলো। শোনা যায়, একটা ভুলই তাঁদের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হয়েছিলো। এর আগ পর্যন্ত কোন লড়ায়েই লালফৌজ স্থানু যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করে নাই—অর্থাৎ, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রবল শত্রুর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তার নীতি বিরুদ্ধ ছিলো। কিন্তু, এই পঞ্চমবারে হঠাৎ কেন নেতারা এই নীতি বদলালেন বোঝা গেলো না। তাঁরা তাঁদের ইতিহাসেই এই সর্বপ্রথম স্থানুযুদ্ধের আশ্রয় নিলেন। ফল যা হবার তাই হ'লো—কিয়াংসি সোভিয়েটের ভিত্তি নড়ে উঠলো। লাল-ফৌজের উপর নির্ভরশীল সোভিয়েটের সামরিক বিপর্যয়ের ফলে অস্তিত্ব জর্জর হয়ে উঠলো। নিশ্চিত ধ্বংসের সম্ভাবনায় তাঁরা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। সমস্ত কিয়াংসি সোভিয়েটটাকেই তার লোকজন, কল-কারখানা, ঘরবাড়ী সমেত তুলে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করলেন উত্তর-পশ্চিম চীনের ইয়েনানে। পৌরাণিক গন্ধমাদন পর্বের অধ্যায়কেও এ যেন বিস্ময়ে ছাড়িয়ে যায়। মহম্মদ তোঘলকের দিল্লী থেকে দেবগিরিতে লোকজন সব সমেত রাজধানী স্থানান্তর কল্পনা করা যায়—হ্যানিবল, নেপোলিয়ান, আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ভাবা যায় কিন্তু, হাজার হাজার মাইল দুর্গম পাহাড়-অরণ্য, হিংস্র বিরাট-বিরাট অজস্র নদী, নিষ্ঠুর বন্য জাতির নৃশংসতা, অনাহার, ইত্যাদি অসংখ্য রকম মারাত্মক বিপদকে অগ্রাহ্য করে যে একটা দেশ শুধু মাটি ছাড়া সব কিছু নিয়ে স্থানান্তরিত হতে পারে, অসাধারণ লোকেরা কি ব'লবেন জানি না, কিন্তু সাধারণ লোক তো একে এক কথায় অলৌকিক বলেই বলে ছেড়ে দিয়েছে। একটা জাত যখন একই পরিবারের মত অখণ্ড স্বার্থ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, একই মহান্ আদর্শের বন্ধনে বাঁধা পড়ে তখন এরকম আলৌকিক কাজ সম্ভবপর হতে পারে। এর নজীরও আছে একাধিক। লক্ষ লক্ষ লোকের এই অপূর্ব শোভা-যাত্রার সামান্য একটু বিবরণ এইবার দেবো। অবশ্য, এর আগেই একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো যে, উপরোক্ত দুটো কারণ ছাড়া আরও একটা বড় কারণে কমিউনিষ্টদের এই স্থানান্তরে যাবার প্রয়োজন

হয়ে পড়ে। প্রয়োজনটা রাজনৈতিক। কমিউনিষ্টরা এর আগেই ১৯৩২ সালে এক ঘোষণা জারী করে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নানাকারণে নান্‌কিং গবর্ণমেন্ট সেটা চেপে রাখেন। কিন্তু, এই যুদ্ধ ঘোষণাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি নান্‌কিং সরকারকে সে যুদ্ধে নামান না যায়। জাপানের মত একটা শত্রুর বিরুদ্ধে শুধু সোভিয়েট এলাকার শক্তি-সামর্থ্য কতটুকু। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় বলকে একত্রিত করার। কিন্তু, নান্‌কিং সরকার সে দিকে উদাসী। সুবিধার পর সুবিধা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা জাপানের লোভকে উদগ্র করে তুলছেন। এই অবস্থায় জনমতকে শক্তিশালী না করতে পারলে নান্‌কিং সরকারকে কার্যক্রম বদলাতে বাধ্য করা যাবে না। তাই, একদিক দিয়ে তারা ঘরোয়া যুদ্ধ বন্ধ রেখে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সমস্ত জাতির কাছে অবিশ্রান্ত আবেদন জানাচ্ছিলো। কিন্তু, তারা বুঝেছিলো, জাপানের দখলীকৃত এলাকার পাশে না গেলে এ আবেদন কার্যকরী হবে না। কেননা, জাপানী নৃশংসতায় নিঃসংশয় যারা, তারাই শুধু তার প্রতিরোধের মর্ম বুঝবে—অন্যের কাছে এটা নিছক প্রচারই মনে হবে—আমাদের দেশের মত। চীনের উত্তরে মাঞ্চুরিয়া তখন জাপানের দখলে—উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের আরও কয়েকটি প্রদেশের দিকে জাপানের দৃষ্টি শাণিত হয়ে উঠছে। অথচ, তখনও জাপানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাই রাজদ্রোহ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস কামনা কমিউনিজম্‌। 'কমিউনিজম্‌ অথবা রাজদ্রোহ' শব্দটা এতই স্থিতিস্থাপক যে একে যতদূর টানা যায় ততদূরই বাড়ে। বাড়ে না কেবল, আড়ালের উদ্দেশ্যটুকু। শোষণের মতলবটুকু কেন্দ্রায়িত হয়ে বাইরের অছিলাকে বহুরূপী করে তোলে। তাই, কখনও বব্‌ চুল রাখা, পা বড় করা হ'য়ে ওঠে

কমিউনিজম, কখনও সভ্যতা ধ্বংস করা হয়ে ওঠে সেই একই ইজম্। কেবল, আড়ালে থেকে লোহা, তেল, কয়লা, সোনা টেনে নিলে বা ছেলেমেয়ের মাথায় বোমা ফেললে সেটা সভ্যতা বাড়াবার মহান্ ব্রত হয়ে ওঠে।

জাপ-নিপীড়িত দেশের লোকেরাই জাপ-প্রতিরোধের মর্ম ভাল ক'রে বুঝতে পারবে ব'লে এবং ইয়েনান্ প্রদেশের দুর্গম আশ্রয় তাদের আত্মরক্ষার এবং প্রচারের উপযুক্ত জায়গা হবে বলে এবং জাপানী অভিযানের আশঙ্কাকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র হবে বলেই শেষ পর্যন্ত তাদের সামাজিক পরীক্ষার ধারা অসম্পূর্ণ রেখেই একদিন কিয়াংসি সোভিয়েট উত্তর-পশ্চিম চীনের পথে ভীড় করে এসে দাঁড়ালো।

কিয়াংসি সোভিয়েট যখন সচল হয়ে চলতে থাকে তখন তার সঙ্গে ছিলো লক্ষাধিক লোক—মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সব শ্রেণীর এবং সব স্তরের। সঙ্গে ঘরবাড়ী, কলকারখানার অংশ বিশেষ, রেডিও, প্রেস প্রমুখ রাজনৈতিক প্রচারের সাজ-সরঞ্জাম, ঘর সংসারের টুকিটাকি, গৃহপালিত জন্তু, ওষুধপত্রের ডিস্‌পেন্সারী, নার্স—সে এক বিরাট ব্যাপার। যাযাবর তিব্বতীরা যেমনভাবে চলে—এ তারই বৃহত্তম এক সংস্করণ যা কল্পনায়ও আসতে চায় না। পথে এদের কি দুস্তর বাধার মধ্যে পড়তে হয় তার বিস্তৃত তালিকা দিতে গেলে সেটাই এক স্বতন্ত্র বৃহৎ ইতিহাস হয়ে ওঠে এবং আশা করা যায় ভবিষ্যৎ বিপদমুক্ত চীন তার গৌরবময় ইতিহাস তৈরী করার সময় তাদের দুঃসাহসিক কীর্তির সুবিস্তৃত রোমাঞ্চক অধ্যায় সঠিকভাবে জুড়ে দেবে।

আপাতত, সংক্ষেপে বলা চলে—দীর্ঘ ছ'হাজার মাইল দুর্গম পথ পাড়ি দিতে এদের তিনশো আটষট্টি দিন লেগেছিলো। বারোটা বিভিন্ন প্রদেশের ওপর দিয়ে যাবার সময় নানকিং সরকারের সুসজ্জিত সৈন্যের

বোমাও শেলের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। গোটা পনেরো বড় বড় যুদ্ধ আর শ'তিনেক খণ্ড যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সফল হয়ে এরা চীনের বড় বড় অর্ধশত সহর, অজস্র গ্রাম দখল করে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসে। সভাসমিতির মধ্য দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য প্রচার করে। রেডিও, প্রেসের সাহায্যে জাপানী অভিযানের অর্থ এবং নানকিং সরকারের ভ্রান্তি বুঝিয়ে দেয়। কৃষকের মধ্যে জমি বিলিয়ে দিয়ে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে। নিঃশঙ্ক চিত্তে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নানকিং সরকারের বিরুদ্ধে অসংখ্য স্থানীয় প্রতিরোধের ব্যূহ সৃষ্টি করে রেখে যায়। পথে যেতে যেতে বন্য উপজাতিদের হাতে নানারকমে বিপদগ্রস্থ হয়—কেউ হয়তো খাবারের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে গিয়েছে সে আর ফিরে এলো না। এতগুলো লোকের খাবার ব্যবস্থা করা যে কত অসুবিধা তা কল্পনা করা যায়। উপরি পাওনা—মাথার উপর থেকে নানকিং সরকারের বিদায়ী উপহার নেমে এসে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত নরনারীর অস্থি-মজ্জার বোঝাকে হাল্কা করে দিয়ে যায়। মা মরেছে, ছেলের মাথাটা উড়ে গেছে, স্বামীর পেটটা ফেঁসে গেছে, —কয়েকদিন খেতে পাওনি? তাতে কি এগিয়ে চল! পেছনে মৃত্যু, সামনে অরাজক অন্ধকার—কিন্তু, জীবনের আলোর সন্ধান যারা পেয়েছে তাদের কাছে এসব কি! অভিযাত্রী বাহিনী এগিয়ে চলে—মাঝে মাঝে শত্রুর চোরা রাইফেল মানুষী বোঝা কমিয়ে দিয়ে যায়। সামনে দুরন্ত নদী, ওপারে কারা? নানকিং ফৌজ আগেই যে ওপারে হাজির রয়েছে! পরোয়া নাই। রাতের আঁধারে দুঃসাহসী যুবকের দল ছুটলো আর একটা পারঘাটার সন্ধানে। সেখানেও নদীর ওপারে নানকিং ফৌজের ছাউনী। কিন্তু বহুদূরের শত্রু যে রাতারাতি এতটা পথ চলে এসে অবাঞ্চিত উপদ্রব সৃষ্টি করবে এ ধারণা নানকিং ফৌজের ছিলো না। তাই, নিশ্চিন্ত

নিরুদ্বেগে তারা খানা, নাচ, গান আর হল্লা করার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলো। রাতের অন্ধকারে অন্ধকার রাত্রির চেয়েও ভীষণ সোভিয়েট যুবকের দল নিঃশব্দে একের পর আর, দলের পর দলে নৌকায় করে (তাদের সৌভাগ্যক্রমে পারানী-নৌকো এ পারেই ছিলো) ওপারে গিয়ে জমায়েৎ হলো। কিছুক্ষণ পর—হঠাৎ হৈ হৈ রৈ রৈ মার মার, কাট কাট চীনা ভাষার দুর্বোধ্য শব্দ—তারপর সব চুপচাপ। নানকিং ফৌজের হতাবশিষ্ট সৈন্য পালিয়েছে। মৃতেরা অসমাপ্ত গরম মাংসখণ্ডের জন্য আপশোষ করছিলো কিনা বোঝা গেলো না। শুধু বোঝা গেলো যে, দলের পর দল সোভিয়েট সেনা বহুদূর পথ পাড়ি দিয়ে রাতারাতিই নদীর এপাড়ে এসেছে। এখানকার নানকিং ফৌজের মত ওখানকার নানকিং ফৌজও বাঁধা মায়নার গোলামীর পরিচয় দিয়েছে। তাদেরই নাকের ডগা দিয়ে দলের পর দল সোভিয়েট সৈন্য অন্ধকারে মিশে গিয়ে জ্বলন্ত বারুদের মূর্তিতেই তাদের ওপর আকস্মিক-ভাবে ঝরে পড়লো কেমন করে বুঝতে না পেরে তারাও মহাজনপন্থা অনুসরণ করলো। এইভাবে একের পর আর বিপদ কাটিয়ে, আপদ দূর করে তারা এমন একটা রাজ্যে পা দিলো যেখানে দিনের পর দিন হেঁটে গেলেও ঘাসের বন আর ফুরোয় না। বৃক্ষহীন অনাবৃত প্রান্তরে অফুরন্ত তৃণশস্য রুক্ষমাটির গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। যেন, মৃত্যুর দেশে তারা অনাহুত অতিথির মতই আড়ষ্টতায় অথর্ব হয়ে আছে। দিনের পর দিন অভিযাত্রী বাহিনী এগিয়ে চলেছে—পেটে দানা নেই, তৃষ্ণায় জল নেই। রোদে পিঠ ঝলসে গেলেও তার প্রতিকারের পথ নেই। ওপরে তারার নীল আলোর মতই শত্রু প্লেন আনাগোনা করে মনে হয়, এই নিষ্ঠুর ঘাসের দেশে মৃত্যুর ওই নাল চেহারাও যেন খানিকটা

মনোরম। দুর্দিনের শেষের মত ঘাসের দেশেরও শেষে শেষ পাওয়া গেলো।

উপজাতিদের শত্রুতাকে মিত্রতায় রূপান্তরিত করবার জন্য এরা এক অভিনব মতলব বের করেছিলো। চীনাদের ওপর এই সব উপজাতিদের আজন্ম বিদ্বেষ—চীনাদের অনেক উৎপাত উপদ্রব এদের সহ্য করতে হয়েছে। তাই কোন রকম বাদ বিচার না করে চীনাদের দেখলেই এরা শত্রুতা সুরু করতো। কমিউনিষ্টরা কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধে কিছু উপজাতি সর্দারকে পাকড়াও করে তাদের নিজেদের আদর্শ সম্বন্ধে ভালোরকম সচেতন করে তোলে। উপজাতিরা অস্ত্র-শস্ত্র খুব পছন্দ করে—ওদের পছন্দমত কোন কোন জিনিস দিয়ে ওদের আন্তরিক বিশ্বাস অর্জন করে। এমনিভাবে কিছু বিশ্বস্ত এবং সচেতন সর্দারকে হাতে করে ওরা কোন উপজাতি এলাকায় প্রবেশের আগেই ওদের পাঠিয়ে দিতো প্রচারের জন্য। ফলে, ওরা অনেক সহজেই ওদের বাধাকে শান্ত করে ফেলতে পারত। এদের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র বিতরণ করার ফলে নানকিং সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরও জোরালো হয়ে ওঠে। এমনিভাবে উপজাতির শত্রুতার বাধা এদের সম্মুখে সাধা পথের সৃষ্টি করলো শেষে। বিষই হয়ে উঠলো অমৃত। বার্ধক্য হয়ে উঠলো যৌবন। মৃত্যু হলো জীবন।

এমনি করে বাধার পর বাধা ঠেলে পুরো এক বছর পর যখন এরা শেন্সীতে গিয়ে পৌছল তখন অনাহারে, অত্যাচারে, বোমা আর বারুদের মুখে অর্ধেক লোকই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তাদের মিলিয়ে যাওয়া দেহের ধূলির ওপর দিয়েই এরা বিজয়ীর বেশে চলে এসেছে। মা মরেছে, বাপ মরেছে—ভাইএর সন্ধান নেই কিন্তু এই সচল বৃহৎ পরিবারই তাদের সে অভাব দূর করেছে!

এই লং মার্চ এদের জীবন যাত্রায়, এদের জীবনবোধে, এদের মানস-জীবনে যুগান্তরকারী পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো। একই সঙ্গে এত-গুলো লোক—যাদের চলা বসা শোওয়া খেলাধূলা থেকে আরম্ভ করে, লড়াই করা এমন কি মরণ পর্যন্ত যাদের সুখ দুঃখ একই রকমভাবে ঘটছে—তারা যে এক ভিন্ন জাতের মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে সেটা বলাই বৃথা। আর্থিক স্বার্থ এদের একচুলও এদিক ওদিক ছিলো না, সাংস্কৃতিক জীবনে তিলমাত্র তারতম্য ছিলো না—জীবনধারণের চাকচিক্যের ব্যবধান ছিলো না যাকে কেন্দ্র করে মেদস্ফীত ব্যক্তিপরতন্ত্রতা জন্মলাভ করবে। সংঘক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এরা মানুষ হলো এতদিন ধরে। সংঘ আবেগ এদের জীবনে দানা বেঁধে আছে। সংঘজীবনে অভ্যস্ত এরাই তো ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রবাদের বলিষ্ঠ ভ্রূণ। দুঃখ আর কষ্টের টাংষ্টেন্ ধাতু মিশে এদের দেহমনকে করে তুলেছে ইস্পাত। পুরাকালের এক জীর্ণ সংস্কার ভুলে এক নতুন সংস্কারের মধ্যে বেড়ে উঠে এরা সব সংস্কারেরই ঊর্ধ্বে চলে গেলো। সংস্কারের এই রূপান্তর এ শুধু মনোগত নয়, এর দৃঢ় ভিত্তি রয়ে গেলো এদের কঠোর জীবনধারায়। তাই, এ রূপান্তর আষাঢ়ী জ্যোছনার মত ক্ষণিক নয়। শরতের সোনালী রোদের মতই এ সুনিশ্চিত।

চীনা সোভিয়েটের দ্বিতীয় অধ্যায়

যে-দেশে এসে long march এর strong search সুরু হলো স্থায়ী ডেরার জন্য, সে দেশ সত্যিই এক অদ্ভুত দেশ। এখানকার লোক বিশ্বাস করে যে জল তাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক। তাই, সাধারণ লোকে অতি সন্তর্পণে দুবার জলে স্নান করে থাকে সারা জীবনে—জন্মাবার সময় আর বিয়ের সময়।

এভাবে জলের কৃপণতার জন্য উত্তর পশ্চিম চীনের এই শেনসী প্রদেশের ভাবজীবনে এক বিরাট বিকৃতি গ'ড়ে উঠেছিলো। তরমুজ যাদের প্রধান খাবার জিনিস তাদের জলের প্রয়োজনই বা কি? প্রচুর আফিং এর জন্য বিখ্যাত শেনসীর লোকে আফিং এর নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাকতো। এখানে পাহাড়ের গুহায় লোকে বাস করে। পৃথিবীর দুর্লভতম রোগ Blubonic plague এর জন্মস্থান এটা। লড়াই এর একটা প্রধান ক্ষেত্র ব'লে সৈন্যদের একরকম স্থায়ী আড্ডা ছিলো বহুদিন এবং সৈন্যদের আড্ডা ছিলো বলেই সিফিলিস রোগের স্থায়ী বাসা এখানে গ'ড়ে ওঠে। তাই, এখানে শিশু মৃত্যুর-হার বিস্ময়কর। শোনা যায়, কমিউনিষ্টরা এসে এখানে দশবছরের নীচে কোন ছেলেই দেখতে পায় নি—সিফিলিসের কল্যাণে সব শেষ হ'য়ে গেছে। এমনি এক অদ্ভুত সৃষ্টি ছাড়া দেশে এসে কমিউনিষ্টরা কৃষ্টি গড়ে তোলবার সঙ্কল্প করলো। কিন্তু, এই সৃষ্টিহীন, কৃষ্টিহীন দেশই কৃষ্টিগড়ার পক্ষে খুব অনুকূল হ'য়ে উঠলো। প্রধানত, এর দুর্গম আশ্রয় বাইরের আক্রমণ থেকে অনেক নিরাপদ করলো। রাজনৈতিক দিক দিয়েও স্থানটির গুরুত্ব ভয়ানক।

প্রথমত, রাজনৈতিক দিক দিয়ে একমাত্র বন্ধু দেশ সোভিয়েট রুশিয়া কাছে—মুসলমান প্রধান অধিকতর নির্যাতিত প্রদেশগুলো পাশে। তাছাড়া, জাপানী সীমান্তও বেশী দূর নয়।

উপরোক্ত সুবিধার জন্যই কিয়াংসির অসমাপ্ত পরীক্ষা চালানো এদের পক্ষে সহজ হ'লো। এখানেও শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতির দিকে চীনা সোভিয়েটের অতন্দ্র দৃষ্টি রইলো। ছোট খাট—বোমা-প্রুফ ঘর হয়ে উঠলো চীনা সোভিয়েটের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং এর হেড কোয়ার্টার, লালফৌজের সেনানায়ক চু-তের অফিস ঘর। পাহাড়ের গুহা হ'য়ে উঠলো ইউনিভার্সিটি, মিলিটারী এ্যাকাডেমীর কার্যস্থল। সংস্কৃতির দিক দিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই এ জায়গাটা হ'য়ে উঠলো মহাচীনের সংস্কৃতি-জীবীদের তীর্থক্ষেত্র। চীনের আনাচে কানাচে এর খ্যাতি। দূর দূরান্তর থেকে সংস্কৃতিজীবীরা অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে, মৃত্যুর সম্ভাবনাকে স্বীকার করেও গোপনে এখানে এসে মিলতে লাগলো। কলকারখানার সুদক্ষ যন্ত্রবিদ্‌রাও জীবনের সহজ খ্যাতি আর আরামের পথ ছেড়ে এখানে এসে নতুন নতুন কল কারখানা খুলতে সাহায্য ক'রলেন এক কথায়, চীনের গোর্কী Lu Hsun এর কথায় বলতে হয়—"The road to Yenan is for Chinas youth the road to life."—"ইয়েনানে যাবার পথই চীনা যুবকের পক্ষে জীবনের পথ।"

যে অসুবিধার মধ্যে এরকম একটা দেশে কাজ চালানর কথা, নানাকারণে অতটা অসুবিধা কমিউনিষ্টদের ভোগ করতে হয়নি। তার প্রধান কারণ, কিয়াংস সোভিয়েট থেকে যে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ নতুন জীবনবোধ নিয়ে এসেছিলো, তাদের সুস্থ আবহাওয়াই এদেশের অসুস্থ ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্যকর ক'রে তুললো। ধীরে ধীরে একটার পর একটা সমস্যার প্রতীকারের দিকে সোভিয়েট মন দিলো।

শেন্‌সী প্রদেশ অত্যন্ত গরীব! তার ওপর, সোভিয়েট গ'ড়ে ওঠার আগ পর্যন্ত ট্যাক্সে, খাজনায় সামন্তেরা এখানকার লোকের কাছ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ রকমের পাওনা আদায় করতো। একে অনুর্বর দেশ, তার ওপর এই স্বেচ্ছাচারী শোষণ—জনসাধারণের অবস্থাটা কতদূর শোচনীয় হ'তে পারে তা একবার ভাববার মত। সোভিয়েট স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তারা প্রথম জমির মালিক হ'লো, সমস্ত রকম পাওনা থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হ'লো, তখন তাদের অকপট এবং সক্রিয় সহানুভূতি যে নতুন ব্যবস্থার ওপর পড়বে এটা না ব'ললেও চলে হয়তো।

প্রশ্ন উঠবে, খাজনা-ট্যাক্স বাদ দিয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চলবে কি করে? উত্তরটা খুব জটিল নয়—যেহেতু সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আর ধনতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট এক নয়। আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গীতে অভ্যস্ত আমাদের কাছে গবর্ণমেণ্ট ব'লতেই একটা গুরুভার পদার্থ বিশেষ বলে মনে হয়। মাইনে হাজার হাজার টাকা, পাথেয় খরচ ঝুরি ঝুরি টাকা—জাঁক-জমকের জৌলুশ—এই না হ'লে আবার গবর্ণমেণ্ট! কিন্তু, এখানেই গুণগত পার্থক্য ছিলো সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সাথে। শুনলে হয়তো বিশ্বাসই হবে না—গালিভারের দেশের মত আজব বলেই মনে হবে যে, সোভিয়েট চেয়ারম্যান্ মাও-সে-তুংএর মতো লোকের মাইনে ছিলো মাত্র পাঁচ ডলার, আর খাবারের জন্য কিছু তরিতরকারী চাল ডাল ইত্যাদি—যা আমাদের দেশের সাধারণ মজুরের আয়ের চেয়েও কম। এ সম্বন্ধে মাও এর নিজের কথাই উঠানো চলে—"My salary was seven dollars a month—which is more than I get in the Red Army now." এর আগে আমার মাইনে সাত ডলার ছিলো—আমি এখন যা লালফৌজের মধ্যে পেয়ে থাকি তার চেয়ে বেশী।

ভাড়াটে সৈন্যের মত লালফৌজের মাইনেগত জীবনও ছিলো না, তেমন আদর্শও ছিলো না। শ্রেণীচেতনাও তাদের স্বার্থত্যাগের প্রেরণাই দিয়েছে। অধিকাংশই তাদের স্বেচ্ছাসেবী। লালফৌজের জন্য বিশেষ যে জমির বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিলো ওতেই ওদের চ'লে যেতো। সেই জমিতে পালা করে সবাইকেই চাষ করতে হতো—সরকারী কর্মচারীদেরও রেহাই ছিলো না। Snow সাহেব একদিন এক ব্যাঙ্কে গিয়ে শোনেন, (অবশ্য, সেটা নানকিং সরকারের সাথে সহযোগিতার পরে) সব কর্মচারীই মাঠে ফসলের কাজে গিয়েছে।

সোভিয়েটের শাসনকাজের জন্য যে টাকা পয়সার প্রয়োজন হ'তো তার অধিকাংশই আসতো সামন্তদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি থেকে। জমি সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা সবই প্রায় এর ওপর থেকে মেটানো হ'তো। এই গেলো অর্থনৈতিক সমস্যার দিক সংক্ষেপে।

সোভিয়েট শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি ছিলো ষোলো বছরের ওপর বয়স্ক লোকের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ওপর। অবশ্য, এ অধিকার সমান ছিলোনা। সর্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক শ্রেণীরই এদিক দিয়ে অধিকার ছিলো বেশী। সোভিয়েট চীনে উন্নত শ্রমশিল্পের সুসংঘবদ্ধ এবং বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মজুরের একান্ত অভাব থাকায় এ অধিকার ভোগ করতো সাধারণত ভূমিহীন চাষী, কৃষি-মজুর, কুটীর শিল্পের মজুর—বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলকভাবে যাদের বৈপ্লকিক সম্ভাবনা ছিলো অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই, কোনরকম রেষারেষি সৃষ্টি না করেও এদের প্রভাব ছিলো রাজনীতিক্ষেত্রে বেশী। উদ্দেশ্য ছিলো প্রধানত গ্রাম্য সর্বহারার একরকম চলনসই একনায়কত্ব।

সামাজিক সংস্কারের দিক দিয়ে এখানেও সোভিয়েট কতকগুলো কাজ করলো। আমাদের দেশের গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান বিসর্জনের

মত এখানেও কতকগুলো নিষ্ঠুর প্রথা ছিল—যেমন, পুণ্যের লোভে শিশু সন্তানকে হত্যা করা হ'তো। আইন ক'রে সেটা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লো। শিশুদাসত্বের প্রথাও এখানে ছিলো—সেটাও নাকচ হ'য়ে গেলো। বহুবিবাহ প্রথার অবসান হ'লো। তাছাড়া মেয়েদের পা বাঁধা, গণিকাবৃত্তি—এসবও বাদ পড়লো না। গণিকাবৃত্তির অবসানে কমিউনিষ্টদের আইনের প্রয়োজন হয় নি—অর্থনীতিই তার স্থান নিয়েছিলো। তা ছাড়া, এদের সামনে ছিলো এক উজ্জ্বল আদর্শ—অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতা যার সাথে বেমানান। অবিবাহিত জীবন যাপনও এদের প্রয়োজন ছিলো না। জীবন ছিলো এদের সহজ, জীবিকা আরও সহজ। বিয়ে করার অর্থ শ্বেত হস্তী পোষা নয় (সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের একজন সভ্য বলেছিলেন, ধনী স্ত্রী পোষা আর শ্বেত হস্তী পোষা একই কথা)। বিয়ে সহজ ছিলো ব'লেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার কুৎসিত পথে এদের পা দিতে হ'তো না। অবাধ মেলামেশার আশ্রয়ে সমান আদর্শের সহযোগিতার পথে প্রেমই এদের অধিকাংশের যৌন সমস্যার সহজ মীমাংসা করতো। ফলে, যৌনজীবনের তিক্ততার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ বারবনিতার প্রয়োজন হ'তো না। একমাত্র সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থায়ই এটা সম্ভব।

মেয়েদের দিক থেকে বলা চলে, সম্মানজনক জীবিকার সুযোগ সোভিয়েট সমাজ তাকে দিয়েছিলো—তাই, দেহবিক্রয়ের পথে তাকে পা বাড়াতে হয় নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই সামাজিক জঘন্য ব্যাধির মূলোৎপাটন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সম্ভব ক'রেছিলো।

"Face, Fate and Favour"—সৌন্দর্য, ভাগ্য এবং অনুগ্রহ এই ত্রিদেবতার অবাধ অধিকার ছিলো সমগ্র চীনের ওপর। চীনা জীবনের ভার নির্ণয়ে এরাই ছিলো প্রধান শক্তি। সোভিয়েট সংস্কারের

আঘাতে তারা বানচাল হ'য়ে গেলো সোভিয়েট এলাকায়—তার স্থানে গ'ড়ে উঠলো সামাজিক মূল্য পরিমাপের নতুন যন্ত্র, তাকে বলা হলো সামাজিক সেবা। মানুষের মূল্য বাড়াবার এই নতুন শক্তিতে সোভিয়েট জীবনের উন্নত রূপান্তর হ'লো। সত্যি, চীনের অতীত গৌরবে এর নজীর নেই।

এই অর্থনীতিই ভিক্ষুক সমস্যারও মীমাংসা ক'রলো। জীবিকার সুযোগ পেয়ে পেশাদার ভিক্ষুকও সামাজিক ব্যাধি বিনাশের ইচ্ছুক সহযোগী হ'য়ে উঠলো। অষ্টম রুট আর্মির সাথে (কুয়োমিনটাংএর সাথে মিলনের পরে লালফৌজ এই নামেই পরিচিত হয়) রেডক্রসের একজন অফিসার লিখেছেন, "I did not see a beggar during all my travels in the Red areas."—কমিউনিষ্ট এলাকায় আমি একজনও ভিক্ষুক দেখি নি। সোভিয়েট শাসনের এই একটা কৃতিত্বই তার গৌরবময় শাসনের যথেষ্ট নমুনা হ'তে পারত। কারণ, এই ভিক্ষুকের পথেই জাতির ধ্বংসের অসংখ্য জটিল উপাদান এসে হাজির হয়। আবার, এই ভিক্ষুকই সমাজের ব্যাধির চিহ্ন।

সোভিয়েট নেতারা শেন্সীতে স্থির হ'য়ে ব'সে একটা গুরুতর কাজে হাত দেন। মুসলমানরা চীনে একটা শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এদের সংখ্যা অনুমান প্রায় দু' কোটী হবে—উত্তর পশ্চিম চীনের কয়েকটা প্রদেশে জড়ো হ'য়ে আছে। চীনাদের তুলনায় এরা আরও গরীব—কেননা আরও শোষিত। সামন্ত ব্যবস্থার অমানুষিক শোষণে এরা অস্থির হ'য়ে উঠেছিলো। সামন্তদের প্রয়োজন মেটাতেই এদের বিশেষ কিছু বাকী থাকতো না। সামন্তদের জন্য প্রতি বাড়ী থেকে সৈন্য দেওয়া চাই—সৈন্য না দিতে পারলে মাথা প্রতি দেড়শো ডলার চাঁদা দিতে হবে, অথবা তার বদলে অন্য কোন লোককে দিতে হবে। আবার মজা

এমন, লড়াইএর সরঞ্জাম খাবার দাবার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব তাদেরই জোগাতে হবে। এ যেন নিজের মৃত্যুর বুলেটের খরচ নিজেরই বহন করা গোছের।

তাদের এই অসহনীয় অবস্থাই তাদের বৈপ্লবিক সম্ভাবনার সাক্ষী। সোভিয়েট নেতাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এটা প্রথমেই ধরা পড়লো। তাঁরা প্রথমেই এদের মধ্যে প্রচারের জন্য কিছু মুসলমান প্রচারক নিয়োগ করলেন। চাইনিজ তুর্কীস্থানের সোভিয়েট শাসন (রুশ) এবং শেন্‌সীর সোভিয়েট শাসনের ফল স্বরূপ সামন্ত শোষণের অন্যায় রূপ ওদের চোখে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। সোভিয়েটের ওপর এই অনুকূল ধারণা বর্তমান থাকায় প্রচার চালাতে উপরোক্ত মুসলমান প্রচারকদের সুবিধা হল। এর জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। লালফৌজের পক্ষে শুধু মুসলমান এলাকার জন্য কতকগুলো নিয়ম পালনের ব্যবস্থা হলো। যেমন, ওদের ধর্ম সম্বন্ধে বা সংস্কার সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল আচরণ করা চলবে না। মুসলমানদের নিয়ে আলাদা সৈন্য-দল গড়তে হবে। জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সময় এই মুসলমান ফৌজ বিশেষ কাজে লেগেছে। কেননা, এরা আক্রমণাত্মক লড়াইএ খুব দুর্ধর্ষ। এইজন্যেই জাপান মুসলমানদের বিগড়িয়ে দেবার জন্য ওদের মধ্যে প্রচুর প্রচার চালাতে আরম্ভ করে: মুসলমানদের ধর্ম-কর্মে ভয়ানক ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হচ্ছে—তাদের মসজিদ অপবিত্র করা হচ্ছে, অপবিত্র সব খাবার খাওয়ান হয়, বিধর্মী কাজ করতে বাধ্য করা হয় ইত্যাদি। মুসলমান এলাকার জন্য উপরোক্ত বিশেষ এবং কঠোর ব্যবস্থা তৈরী করে সোভিয়েট তার জবাব দেয়। অবশ্য, এসব ব্যবস্থা সোভিয়েট আগে থেকেই করতে আরম্ভ করে-ছিলো। সম্মিলিত প্রতিরোধের সময় তারই সুফল পাওয়া যায় বেশী

করে। মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও ওরা অনেক আগেই মেনে নিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়।

এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে দু'কোটী মুসলমানের মধ্যে সোভিয়েট ব্যবস্থা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই এতবড় একটা শক্তির আস্থা লাভ করে সোভিয়েটও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জাপানীর বিরুদ্ধে লড়াইএর সময় মুসলমানদের মধ্য থেকেই কয়েকটা সৈন্যদল গড়ে ওঠে।

এইভাবে অবস্থানুযয়ী ও সময়োপযোগী শাসনতন্ত্র গড়ে তুলে সোভিয়েট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লোকসংখ্যাও অত্যন্ত কম। তার কারণ প্রথমত, দেশের উর্বরতাশক্তি বিশেষ কিছু ছিলোনা। দ্বিতীয়ত, ১৯২৮ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রায় নব্বুই লক্ষ লোকের বোঝা খালাস করে দিয়ে যায়। এই মৃত্যুসংখ্যাতেও আমরা চমকিত হইনা—কেননা, আগেই বলেছি, আমেরিকার বাজেট, রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের হতাহতের হিসাব আর চীনের দুর্ভিক্ষে চিত্রগুপ্তের ক্ষতিয়ান অনবরত শুনতে শুনতে আমাদের চমকাবার ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে পড়েছে। Malthus এর সুবিধাবাদী মতবাদ চীনের মৃত্তিকায় অনেকটা কাজে লেগেছিল—অবশ্য, চীনাজনসাধারণের নয়—সাম্রাজ্যবাদের জারজ সন্তানদের। কেননা, তারা চীনের মৃত্যু দিয়েই প্রমাণ করতে পারত প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত বাড়তি লোকসংখ্যা কমিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। অতএব সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ক্ষতি কি! প্রকৃতিই যখন ইষ্টানিষ্টের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছেন! অবশ্য, Malthus তাঁর অমূল্য মতবাদের জন্য লোভনীয় অধ্যাপকবৃত্তি East India Companyর কলেজে পেয়েছিলেন কিনা, আমাদের তা দেখবার দরকার নাই।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

এই সমস্ত নানা সামাজিক পরীক্ষায় সোভিয়েট ব্যস্ত আছে, এমন সময় পর পর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেলো, যার ফলে চীনের সমগ্র ইতিহাসের ধারাই গেলো বদলে।

ক্রমবর্ধমান জাপানী আক্রমণের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য ১৯৩২ 'শেই কমিউনিষ্টরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সেটা আমরা আগেই বলেছি। জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতীয় সম্পদকে প্রয়োগ করবার জন্য নানকিং সরকারের কাছে বহুবার আবেদন জানান হয়—কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এমনকি তাতে এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় যে এর জন্য কমিউনিষ্টরা তাদের সামাজিক বিপ্লবনীতি বন্ধ করতেও প্রস্তুত আছে। কিন্তু, সিঁদুরে মেঘের আতঙ্কে আচ্ছন্ন নানকিং সরকার তাকে গ্রাহ্যই করলেন না। অনেকটা চেম্বারলেনের মতই আর কি। স্পেনে ফ্যাসিজম এর স্বরূপ বুঝতে পেরেও শ্রেণীচেতনার বিকার চেম্বারলেনের কাটলো না। তাই, Stalin যখন বলেছেন, "The struggle in Spain is not the private affair of the Spaniards but the common cause of all advanced and pragressive mankind."—স্পেনের লড়াই শুধু স্পানিয়ার্ডদের ঘরোয়া লড়াই নয়, সমস্ত অগ্রগামী এবং প্রগতিশীল লোকের এ লড়াই—বা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কডওয়েল যখন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—মাদ্রিদের মাথায় যে বোমা আজ ভেঙ্গে পড়ছে আগামীকাল সেই বোমাই লণ্ডনের নরনারীর মাথায়ও ভেঙ্গে পড়বে—

তখনও চেম্বারলিন নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে ভাবছেন—আরে বলশেভিজম্ তো আপাতত জাহান্নামে যাক তারপর আর সব! কিন্তু, বলশেভিজম্ তো জাহান্নামে গেলো না লণ্ডনের মাথায়ই বোমা thistle (কাঁটা) এর মতই গিয়ে বিঁধলো। কাঁটার ঘায়েই চেম্বারলিনের নেশা ছুটেছিলো।

চিয়াংকাইসেকের অবস্থাটাও অনেকটা তাই হয়েছিলো তাঁরও বলশেভিজম্এর ধ্বংসের নেশা এত উৎকট হয়ে উঠেছিলো যে মাথার ওপরকার জাপানী বোমার সন্ধান তিনি রাখতে পারেন নি। অথচ কমিউনিষ্টদের ঐক্যের আন্দোলনে দেশে সাড়া জেগে উঠেছে। জাপান-বিরোধী গণআন্দোলন যেখানে সেখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। Kwangsi, Kwangtungএর সামরিক নেতারা পর্যন্ত জাপান-বিরোধী আওয়াজ তুলে 'Peoples' Anti-Japanese Salvation Army" গড়ে তুলে নানকিং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ওদিকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়াই Suiyuan এর শাসনকর্তা জাপান প্ররোচিত মোঙ্গোলিয়ান এবং মাঞ্চুরিয়ান সৈন্যদের এক অভিযানকে বিতাড়িত করেছেন।

কিন্তু, সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটলো শেনসীর রাজধানী সিয়ানে। শেনসীতে কমিউনিষ্টদের অবরোধ করে রাখবার জন্য চিয়াং মাঞ্চুরিয়ার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা চ্যাং-সিউ-লিয়াংকে তার তাংপেই অথবা মাঞ্চুসৈন্যের নেতৃত্বে পাঠান। আগেই বলেছি, এই সৈন্যদের প্রধান স্বার্থ ছিলো তাদের স্বদেশ মাঞ্চুরিয়ায় ফিরে যাওয়া। কমিউনিষ্টদের সাথে লড়াই তারা চায় নি। ওখানে গিয়ে যখন দেখলো, কমিউনিষ্টরাও তাদের মতই জাপানীর বিরুদ্ধেই লড়তে চায় তখন ওদের সাথে লড়াই করা তো দূরের কথা ওদের সাথে বন্ধুত্বই গড়ে উঠলো।

এমন হলো যে কমিউনিষ্ট নেতারাই মাঞ্চুসৈন্যদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগাবার জন্য রীতিমত ক্লাশ করছে, বক্তৃতা দিচ্ছে ইত্যাদি। চ্যা-সিউ-লিয়াংও দেশের মায়ায় এইদিকে ঝুঁকে পড়লেন। দুইপক্ষের সৈন্যদের মিতালি বেড়ে উঠলো। নানাস্থানের দেশপ্রেমিক ছাত্র সামরিক শিক্ষা নেবার জন্য এখানে এসে মিলতে লাগল। এক কথায় সিয়ান হয়ে উঠলো জাপ-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র।

এত বড় ব্যাপার চাপা থাকার কথা নয়। চিয়াং তাঁর কয়েকজন পার্শ্বচর সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ছুটলেন। কিন্তু, অবস্থাটা তাঁর প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। বিদ্রোহী তাংপেই সৈন্যরাই দলবল সহ চিয়াংকে আক্রমণ করলো। কয়েকজন দেহরক্ষী হতাহত হলো। চিয়াং তখন পলাতক। বিদ্রোহীরা যখন তাঁর সন্ধান পেলো তখন তিনি বরফে ঢাকা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পালাবার উপক্রম করছেন। ছিন্ন পরিচ্ছদে চিয়াংএর অবস্থাটা তখন রীতিমত করুণ হয়ে উঠেছে। মুখের false teeth আনতেও ভুলে গিয়েছেন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে তিনি তাঁর সব চেয়ে কাছের সৈন্যকে বললেন,—If you are my comrade, shoot me and finish it all."—যদি তুমি আমার কমরেড হও তবে আমাকে গুলি করে সব চুকিয়ে দাও।

কিন্তু, সব চুকিয়ে দেওয়া হলো না। চিয়াং বন্দী হলেন। চিয়াং-হরণে সারা জগতে চাঞ্চল্য পড়ে গেলো। প্রধূমিত আগ্নেয়গিরিতে যে অগ্ন্যুৎপাত সুরু হয়েছে তা কেউ জানেনা। কেউ মনে করলো এ Banditদের কীর্তি—কেউ ভাবলো, এ Red Banditদেরই অপ-কীর্তির আর এক নমুনা। কেউ বললো, চিয়াং আর ইহজগতে নেই। এ. পি. সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদ দাতা তো নতুন খবর দেবার লোভে সোজাসুজি ঘোষণা করে বসলেন—চ্যাং-সিউ-লিয়াং রেডিও মারফৎ

বলেছেন, কেমন করে এবং কেন চিয়াংকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু, সব গবেষণাকে অগ্রাহ্য করে চিয়াং বেঁচে রইলেন। নির্জন সেলে তাঁকে আটক রাখা হলো। চরমপন্থী সৈন্যরা চিয়াংএর বেঁচে থাকাটাকে সহ্য করতে রাজী ছিলো না। এমন সময় নিয়তির পরিহাসের মতই কমিউনিষ্টদের ডাক পড়লো। চ্যাং এবং কমিউনিষ্ট নেতারা উগ্র সৈন্যদের চেয়ে চিন্তাশীল। যে ঘটনার উপর চীনের সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, নিমেষের অপরিণামদর্শিতায় তা জমাট আঁধারে ঢেকে যেতে পারে। এক মিনিটে হত্যা করা যেতে পারে—প্রায় এক যুগের রক্তপাতের প্রধান অভিনেতার বিরুদ্ধে এই পরিণতিই হয়তো স্বাভাবিক হতো—উগ্র সৈন্যদের পক্ষে। কিন্তু, একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটাবার মত একটা কাঁচা কাজ সাজে না। সব কিছু ভেবেই তাদের কাজ করতে হয়। যারা মনে করেছিলো, কমিউনিষ্টরা তাদের লক্ষ লক্ষ শহীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে হাতে পেয়ে কিছুতেই ছাড়েনি, তাকে হত্যা করেছে,—তাদের আবেগের তারিফ করা চলে, কিন্তু তাদের স্থূল বিচারশক্তির প্রশংসা করা যায় না। চিয়াং যদি ব্যক্তিমাত্র হতেন তবে তার হত্যায় কিছুই আসতো যেতো না। কিন্তু, চিয়াং শুধু রক্ত মাংসের একটা বোঝা নন্—তাঁর হলদে দেহখানাকে ঘিরে রয়েছে একটা জাতির ঐতিহ্য, তার অংশবিশেষের জ্বলন্ত সংস্কার। সত্য হোক, মিথ্যা হোক—অন্ধবিশ্বাসের তাগিদেই হোক—সে সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে চিয়াংএর হত্যা কাজে সহায়তা করলে চিয়াংএর ব্যক্তিগত অস্তিত্বই লোপ পাবে না, একটা বিরাট জাতির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠবে। কেননা, চিয়াংএর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার দেশের মধ্যে এক ভয়াবহ গৃহবিবাদ জ্বলে উঠবে। এর সুযোগ

নেবে জাপান—কেননা, জাতীয় অনৈক্যই তাদের স্বার্থের অনুকূল। যে ঐক্যের জন্যে কমিউনিষ্টরাই সংগ্রাম করছে, চিয়াংকে হত্যা করার অর্থ তারই বিরোধিতা করা। তারা জানতো, জাপানই আজ চীনের সবচেয়ে বড় শত্রু। যে চীন ধনী-দরিদ্র, মহাজন-চাষী, মালিক-মজুর সবার জন্মভূমি, বিদেশী শত্রুর হাতে তাকে বিকিয়ে দিয়ে কেউই লাভবান হতে পারে না। তাই, সবারই সম্মিলিত স্বার্থ তারই প্রতিরোধে। ধনী জানতো, দেশের মাটিই যদি তার হাতছাড়া হয়ে যায় তবে কারখানা দাঁড়াবে কোথায়? কমিউনিষ্টরা জানতো, "We cannot even discuss Communism if we are robbed of a country in which to practise it."—যেখানে কমিউনিজম্‌কে কাজে প্রয়োগ করা হবে সেই দেশই যদি দস্যুর কবলে চলে যায় তবে কমিউনিজম এর আলোচনাও তো চলবে না (প্রয়োগ তো পরের কথা)।

তাই সবারই স্বার্থ ছিলো জাপানী বিতাড়নে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েই কমিউনিষ্ট Chou-en-lai চিয়াংএর নির্জন সেলে চললেন দেখা করে একটা আপোষের কোন পথ বের করা যায় কিনা উপায় খোঁজ করতে। সাংহাইএ যিনি চিয়াংএর ক্ষমতা লাভে সাহায্য করেছেন—পরে চিয়াংএর সৈন্যের হাতে গ্রেপ্তার হয়েও যিনি অবস্থার সুযোগে পালাতে পেরেছিলেন এবং যাঁর মাথার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার ঝুলছিলো সেই Chou এর কথা Chiangএর উজ্জ্বল হয়েই মনে থাকবার কথা। ইতিহাসের এক করুণ প্রহসন—এঁরই হাতে ভার পড়লো চিয়াংএর জীবনরক্ষার। সে দায়িত্ব ইনি ভালো করেই পালন করতে পেরেছিলেন কিনা পরবর্তী ঘটনাই তার সুস্পষ্ট

সাক্ষী। জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির এত বড় সুযোগ পেয়ে তিনি তাকে কাজে লাগাবার জন্য চললেন চিয়াংএর কাছে।

কয়েকদিন ধরে খুব আলোচনা চ'ললো—প্রথমতো—চিয়াং কমিউনিষ্টদের সাথে কোনরকম কথা ব'লতেও রাজী ছিলেন না। শেষে বহু কষ্টে রাজী হ'য়েও আপোষের প্রস্তাবে আগাগোড়া গররাজী থেকে গেলেন।

ওদিকে নানকিংএ রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেছে। চিয়াংএর অপেক্ষাকৃত অবিমৃষ্যকারী সমরনায়কের দল তো অবিলম্বে এই বিদ্রোহকে চূর্ণ করবার জন্য সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুত। যাঁদের রাজনীতি জ্ঞান একটু গভীর ছিলো—সেই চিয়াং এর স্ত্রী, তাঁর অষ্ট্রেলিয়ান্ উপদেষ্টা Donald এবং শ্যালক Soong—হঠকারিতার পরিণতি যে চিয়াংএর জীবনকে আরও ভালো করে বিপন্ন করা সেটা বুঝিয়ে দেওয়ায় তবে তারা নিরস্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা তিনজন সিয়ানে ছুটলেন। সেখানে এঁরা কমিউনিষ্টদের সাথে আলোচনা ক'রলেন। চিয়াংএর সাথে এঁদের দেখা করতে দেওয়া হ'লো। ম্যাডাম্ চিয়াং সবাইএর অলক্ষ্যে কি কতকগুলো কাগজপত্র চিয়াংএর হাতে গুঁজে দিলেন। কমিউনিষ্টদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবী পেশ করা হ'য়েছিলো—(১) নান্‌কিং গবর্ণমেণ্টকে ঢেলে সাজা হ'ক এবং জাতীয় মুক্তির দায়িত্বে অংশ নেবার জন্য সমস্ত দলকে ওর মধ্যে নেওয়া হ'ক্। (২) অবিলম্বে সমস্ত রকম ঘরোয়া লড়াইএর অবসান করা হ'ক্ এবং জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের নীতি নেওয়া হ'ক্। (৩) সাংহাইয়ের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের সাতজন নেতার মুক্তি দেওয়া হ'ক্। (৪) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। (৫) মেলামেশার অবাধ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা চাই। (৬) জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক

স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করা হ'ক্। (৭) সান্‌ইয়াৎসেনের Three Principles বা তিন নীতির বাস্তব প্রয়োগ চাই। (৮) অবিলম্বে জাতীয় মুক্তি সংসদ আহ্বান করা হ'ক্।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এর মধ্যে কমিউনিষ্ট দাবী কোনটাই ছিলো না। নিছক গণতান্ত্রিক দাবীই এসব। আপোষ কি হলো অথবা আদৌ হলো কিনা বোঝা গেলো না—অন্তত কাগজে পত্রে কিছু হ'য়েছে কিনা আজ পর্যন্ত বাইরের কেউই কিছু প্রায় জানেনা—হঠাৎ দেখা গেলো একদিন একখানা বিমানপোত দলবলসহ চিয়াংকে নিজের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। আগ্নেয়গিরির যে অগ্ন্যুৎপাত সুরু হ'য়েছিলো তারই এক কণা জ্বলন্ত লাভা (lava) যেন উল্কার গতিতে দক্ষিণ মুখো ছুটলো। চিয়াং মরে নি—কিন্তু, তার অতীতের জীর্ণ খোলস্ আগুণে পুড়ে গেছে। যে ফিরে এলো সে নতুন আর এক চিয়াং—সমগ্র জাতির অবিসংবাদিত নেতা।

চীনা সোভিয়েটের আত্ম-পর্যালোচনা

চীনা সোভিয়েটের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলয়ের কতকগুলো ধাপ আছে। সেই ধাপগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার।

১৯২৪ এর United Front যখন ১৯২৭ সালে বুর্জোয়া এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের সংযোগহীনতার ফলে বানচাল হয়ে যায় তারপর থেকে ক্যান্টন্ কমিউন্‌এর পর পর কতকগুলো অভ্যুত্থান ঘটে। এই

অভ্যুত্থান কৃষক এবং সর্বহারার আত্মরক্ষার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ভেতর থেকেই লালফৌজের সৃষ্টি হয়। এই গেলো সোভিয়েটের আদি যুগ। বুর্জোয়া এবং মধ্যবিত্তের একাংশ বিপ্লববিরোধী হ'য়ে পড়ায় শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তের নীচু অংশকে নিয়ে সোভিয়েট গ'ড়ে তোলার সিদ্ধান্ত কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রহণ ক'রে। এই হ'লো সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার সত্যকার ইতিহাস। তাই, ব'লে রুশ সোভিয়েট এবং চীন সোভিয়েট এক নয়। রুশ সোভিয়েটে সর্বহারার সত্যকার একনায়কত্ব ছিলো। কিন্তু, চীন সোভিয়েট হ'লো শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্তের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব রুশ বুর্জোয়াকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে—তাই, তার সামনের প্রশ্ন ছিলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের। কিন্তু, চীনা-সোভিয়েট-বিপ্লব থেকে চীনা বুর্জোয়াজী দূরে ছিলো—তাই, বুর্জোয়াজীর অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সারা চীনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই চীনা সোভিয়েট বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল।

অবশ্য, কেরেন্স্কীর যুগের রাশিয়ান্ সোভিয়েটে মেন্‌শেভিক প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আধিপত্য থাকায় লেনিন All Power to the Soviet (সোভিয়েটের হাতে সব ক্ষমতা) এর ধ্বনি দেন নি। সোভিয়েটে সর্বহারার সত্যকার ক্ষমতা প্রতিষ্টিত হবার পরেই সেই আওয়াজ তোলেন। মোটের উপর চীনা-সোভিয়েট কেরেন্স্কী যুগের সোভিয়েটের মত প্রতিক্রিয়া-প্রভাবান্বিত ছিলো না। আবার, রুশ-সোভিয়েটের মত এমন ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক ভূমিকাও এর ছিলো না।

মোটামুটি চারটে ধাপে চীনের সোভিয়েট বিপ্লবকে ভাগ করা যেতে পারে—(১) কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম—১৯২৭—৩০; (২) গেরিলা ফৌজের লালফৌজে রূপান্তর এবং গেরিলা এলাকা সোভিয়েট এলাকায় পরিণত—১৯৩০—১৯৩১ এর

শেষ; (৩) নিখিল চীন সোভিয়েট ডেলিগেট্‌স্‌ ১ম কংগ্রেস—২য় কংগ্রেস; ১৯৩১-৩৪ কেন্দ্রীয় সোভিয়েট থেকে প্রত্যাবর্তন; (৪) লং মার্চ এর সুরু—সিয়ান ঘটনার আগ পর্যন্ত। •

এর পর গৃহযুদ্ধের দশ বছর। এই গৃহযুদ্ধেরও কয়েকটা স্তরভাগ আছে—যার ফলাফল সোভিয়েটের ওপর কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি। প্রথম ভাঙনের সময় কায়েমী স্বার্থবাদীরা গণবিপ্লবের আশঙ্কায় প্রচণ্ডভাবে লড়ে। এই সময়টাই হ'চ্ছে গণবাহিনীর আত্মরক্ষার সংগ্রামের পর্ব। এর পর প্রতিক্রিয়া-ক্যাম্পে সঙ্কট সৃষ্টি হয়। সেই সুযোগে বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েট গ'ড়ে ওঠে। তৃতীয় স্তরই সোভিয়েটের পক্ষে সবচেয়ে সঙ্কটময় কাল। এই সময় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য ভেঙ্গে যায়। তারা সোভিয়েটকে আর কৃপার চোখে দেখতে পারছিলো না। তাই, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে নানকিং সরকারের পেছনে এগিয়ে আসে—ফলে, নানকিং সরকারকে আরও বেশী বিদেশী-ঘেঁষা হ'য়ে পড়তে হয়। তাছাড়াও, এই সময় প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ফ্যাসিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জার্মেণীতে এই সময় নাৎসী শক্তির শত্রু-নিধনকার্য পূর্ণগতিতে এগিয়ে চ'লেছে। এই সময়ই চিয়াংএর পঞ্চম অভিযান বিধ্বংসী গতিতে সুরু হয়। ফলে, লংমার্চের সুরু।

এই সোভিয়েট-আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে চু-তেকে Nym Wales প্রশ্ন ক'রলে তিনি তার মোটামুটি সারাংশ দেন। সেটা এই:—(১) লাল পল্টনের সৃষ্টি। (২) কমিউনিষ্ট পার্টি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত—দীর্ঘ-মূল্যবান সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যবৃন্দ দামী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন—এরাই পার্টির বজ্রকঠিন স্তম্ভ। (৩) সোভিয়েট আইন কানুন এবং তার বহুমুখী কৃতিত্ব শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। (৪) সোভিয়েটের সংগ্রাম শুধু

চীনে নয়, সারা জগতের শ্রমিক-কৃষকের মনের ওপর শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। (৫) চীনা গণতন্ত্রের দৃঢ় বনিয়াদ হিসেবে এই সমস্ত সোভিয়েট এলাকা প্রচুর কার্যকরী হবে। (৬) উপরোক্ত কারণগুলির জন্যে, ১৯২৫ সাল থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের United Front গড়ে ওঠার অনুকূল সম্ভাবনা আসে। (৭) দশ বছরের কঠোর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং জনসাধারণ মূল্যবান সংঘশিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই দশ বছরের অমানুষিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে চীনা কমিউনিষ্টরা কি শিক্ষালাভ করেছে—Nym Wales এর এই প্রশ্নের উত্তরে চু-তে বলেন, (১) আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদী লড়াইএ গণতন্ত্রের ওপর জোর দিতে হবে এবং বুর্জোয়ার সাথে United Front গড়ে তুলতে হবে। (২) গণতন্ত্রের প্রাথমিক অগ্রগতির ভেতর দিয়ে সামন্ত-সমাজকে নিঃশেষ করতে হবে। গণতান্ত্রিক নীতি ছাড়া সামন্তবাদের অবসান হয় না। কৃষক-শ্রমিককে সামন্ততান্ত্রিক দাসত্বের জোয়াল ভেঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগ দিতে হবে। United Front নীতি গ্রহণে এ সংগ্রাম অনেক সহজ হয়। (৩) এই বিপ্লবের জন্যে সশস্ত্র ফৌজেরও প্রয়োজন এবং সেই ফৌজকে অবশ্যই গণফৌজ হতে হবে।

চু-তের মতে ১৯২৫-২৭ সালে তাঁদের মস্ত বড় একটা ভুল হয়েছিল। ভুল হয়েছিলো, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় না রেখে বুর্জোয়ার লেজুর হিসেবে কাজ করতে যাওয়ায়। এই স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, বুর্জোয়ারা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লব থেকে সরে দাঁড়ায় তখন বিপ্লবকামী জনগণের অবস্থা সঙ্কটময় হয়ে ওঠে। আরও কতকগুলো ভুল করা হয়—যেমন, অবিমৃষ্যভাবে অভ্যুত্থান চালিয়ে যাবার নীতি, অবশ্য

কৃষক এবং শ্রমিকদের ওপর অত্যধিক চাপই একে অপরিহার্য করে তোলে। তারপর গণসংযোগহীন সামরিক কাজ চালিয়ে যাওয়ায় জনসাধারণ থেকে কমিউনিষ্টদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়। এ ছাড়া, ব্যাপক এবং বিশৃঙ্খল partisan সংগ্রামের জন্য জনসাধারণের ব্যক্তিগত অসংযত মনের আবেগ আত্মপ্রকাশ করতে স্থরু করে—অনেক জায়গায় তারা নিছক ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। লালপণ্টন থেকে জনসাধারণ আগাগোড়াই একটু চরমভাবাপন্ন, তাই, বেশী বেশী হত্যাকাণ্ডে তাদের উৎসাহ। সংক্ষেপে এই হলো সোভিয়েট চীনের আত্মপর্যালোচনা।

পীত টাইফুনের দৌরাত্ম্য

বিংশ শতাব্দীর রঙীন্ আলোয় জেগে ওঠার আগেই চীনের বুকে পীত বিভীষিকা জাঁকিয়ে ওঠে। জাপানী পীত সাম্রাজ্যবাদ স্থষ্টির প্রথম মুহূর্তেই যাকে লক্ষ্য করে হাত পা ছুড়তে লেগেছিলো সে চীন এখনও আফিংএর ঘুমে অচেতন। অনেক দেরীতে জন্ম নিয়েও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ স্বকল্পিত অপরাধীর পায়ে বেড়ী পড়াতে অস্থবিধা বোধ করে নি। কেননা, চীন শক্তিহীন—অনৈক্যের ব্যথায় পঙ্গু। অচীন্ যাত্রী যারা চীনের ভাগ-বাঁটোয়ারায় মত্ত ছিলো তারাও বহু দূরের পথিক। তাই, নিজেদের দুর্বলতার সচেতনতায় তারা মহাচীনের মত প্রকাণ্ড একটা দেশের শোষণের অংশীদারত্বে আপত্তি বোধ করে নি। বিশেষত, রুশবিপ্লবের পর বলশেভিক আতঙ্কের বিফলতায়

একদিকে তারা ইউরোপে জার্মাণীকে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে টেনে খাড়া করছিলো তেমনি এসিয়ায়ও নূতন বলশেভিকবাদের এক নতুন পরিপন্থীর সন্ধান পেয়ে তাকে তেলে জলে মানুষ করে তুলেছে। তাই, ধীরে ধীরে ফরমোজা, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত গ্রাস ক'রে ফেললেও কেউ তাকে বাধা দেয় নি। মহাযুদ্ধের পর ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে চীনের স্বাধীনতার যে মৌখিক একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (মার্কিনী এবং ব্রিটিশি স্বার্থেই এ স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিলো) তা' শুধু সাম্রাজ্যবাদের এক সৌখীন প্রস্তাবই। মাঞ্চুরিয়া অধিকারের সময়ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক (?) লীগ অব নেশন্‌স্ জাপানের এই অপকর্মে ধমক দেন বটে—কিন্তু, সেও যেন অনেকটা দুষ্টু ছেলের অসমসাহসিক কাজের ওপর এক প্রশংসনীয় ধমক মাত্র। রুশ-আতঙ্ককে পীত আতঙ্ক দিয়ে দূর করতে গিয়ে যে নিজেদের আতঙ্কই বড় হয়ে দেখা দেবে একদিন—এ শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদের এইসব ধুরন্ধরদের তখনও হয় নি। তাই, দিনের পর দিন জাপানের অরাজক অত্যাচার এইভাবে প্রশ্রয় পেয়েই এসেছে। কিন্তু, অতিপ্রশ্রয়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে, যাতে প্রশ্রয়কারীরই বিপদ ঘটে শেষে—স্বার্থের গরজে এ চিন্তারও প্রয়োজন ছিলো না কোন। তাই, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে অসহায় চীন শুধু রুশিয়ার কাছেই ভরসা পেলো। রুশিয়া বহুভাবে চীনকে এই বিপদে সাহায্য করেছে।

এই সাহায্যের কারণ রুশ-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই রয়েছে। রুশ-বিপ্লব শুধু মাত্র রুশিয়ারই বিপ্লব নয়—এটা বিশ্ববিপ্লবেরই অংশ—যেমন, চীন-বিপ্লবও বিশ্ববিপ্লবের একাংশ। রুশ বিপ্লব পরাধীন, উৎপীড়িত উপনিবেশগুলোর সামনে মুক্তির এক নতুন সম্ভাবনা এনে দেয়। রুশ বিপ্লবের ফলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

সাম্রাজ্যবাদের হৃদপিণ্ডে সম্মিলিত আঘাতের সুযোগ আসে—ফলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শোষিত জনগণের মধ্যে উদ্দেশ্যের এক সুদৃঢ় সেতু তৈরী হয়। সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য এবং পদানত প্রাচ্যের এই সহযোগিতার সর্তই চীনের মুক্তি আন্দোলনকে নিঃসন্দেহে পরিপুষ্ট করেছিলো। সোভিয়েট বিরোধিতার মোহে প্রাচ্যের অনেক তথাকথিত বিপ্লবীও সেকথা আজ ভুলে যেতে বসেছেন এবং রুশ বিপ্লবকে বিকৃতভাবে প্রচার ক'রছেন।

রুশিয়া নানাভাবে সে সময় চীনকে সাহায্য করে। সুদূর প্রাচ্যে তার বিরাট সৈন্যদল মোতায়েন রেখে সে চীনের ওপর জাপানের হামলাকে অনেক কমাতে পেরেছে। কেননা রুশ আতঙ্কের সম্মুখীন হবার জন্য জাপানকে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত জুড়ে বহু সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছে—যে সৈন্য সে চীনের ওপর প্রয়োগ করতে পারত। শোনা যায়, যখনই কোন বড় সহর জাপান আক্রমণ করতে গিয়েছে তখনই রুশিয়ার সুদূর প্রাচ্যের সৈন্যের একটু জায়গা বদলাবদলির ফলেই শুধু জাপান তাড়াতাড়ি সৈন্য সরিয়ে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে জড়ো করতে বাধ্য হ'য়েছে। ফলে, চীনের ওপর আক্রমণ অনেক হাল্কা হ'য়ে গেছে। ১৯৩৭ সালে রুশিয়া যে তার নিজ এলাকাস্থ চ্যাং কু ফেং পাহাড় দখল ক'রে বহু জাপানী সেনা হতাহত করে এবং যে ঘটনা সোভিয়েট সম্বন্ধে জাপানের ভবিষ্যৎ নীতিকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে বলে শোনা যায়—ঐতিহাসিক Pringle সাহেব সন্দেহ করেন, এই ঘটনার আর একটা উদ্দেশ্য ছিলো সোভিয়েটের তরফ থেকে—হ্যাঙ্কোর দিকে জাপানী অগ্রগতির শক্তিকে শিথিল করা। ঠিক ওই সময়ই নাকি জাপানী সেনারা হ্যাঙ্কোর দিকে এগিয়ে চলেছিলো। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্, সোভিয়েটই একমাত্র শক্তি যে চীনকে বরাবর অকৃত্রিম ভাবে

সাহায্য করেছে এবং এখনও করে থাকে। সেকথা চিয়াং সেদিনও স্বীকার করেছেন, সান্‌ ইয়াৎ সেন অনেক আগেই সেটা নানাকাজের মধ্য দিয়েই স্বীকার করে গেছেন।

জাপানের সর্বশেষ আক্রমণ চীনের ওপর ঘটে ১৯৩৭ সালে ৭ই জুলাই। বিদেশী আক্রমণের অজুহাতের অভাব কোনদিন চীনের ওপর হয়নি—মিশনারী হত্যা, আফিং নিতে অস্বীকার, বিদেশী জিনিস বয়কট, বিদেশী নাগরিক হত্যা। এবারের অজুহাতও অনেকটা সেই ধরণেরই—কয়েকজন জাপানী সৈন্যকে নাকি হঠাৎ একদিন রাতে পাওয়া গেলো না। চীনারা নাকি তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এটা অজুহাত যখন শুধু, তখন জাপানী সৈন্য আর সেল প্রস্তুতই ছিলো বলতে হয়। কামান ছুটলো, বোমা গর্জালো, অনেক চীনা অপ্রস্তুতভাবেই মরলো। অথচ, যে সব জাপানী সৈন্যদের পাওয়া যাচ্ছিলো না তারা কিন্তু গণিকালয় থেকে অনেক আগেই ফিরেছে—ফিরলো না কেবল যুদ্ধপূর্ব ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা শান্তি আর চীনের অজস্র সৈনিকদের মৃত জীবন। যে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেলো ওই উপলক্ষ্যে, সে আজও সুরু হলো কালও সুরু হলো।

ঠিক ওই সময়েই চীনকে আক্রমণ করার জাপানের দিক থেকে কয়েকটা কারণ ছিলো। প্রথমত, চীনের অনৈক্যই জাপানের কাজ হাঁসিল করেছে এতকাল। কিন্তু, চীনের সে অনৈক্য আর নেই, চিয়াং আজ সমগ্র চীনাজাতির নেতা। ঐক্যবদ্ধ চীন কিছু সময় পেলে অজেয় হয়ে উঠবে বলেই জাপান আর সময় নষ্ট করতে চায় নি। দ্বিতীয়ত, মিত্রপক্ষও এসময় স্পেনের গৃহযুদ্ধের জন্য অন্য জায়গায় ব্যস্ত ছিলো। এ সুযোগও হারানো চলেনা। তৃতীয়ত, শোনা যায় খাস জাপানেও সে সময় সঙ্কট সুরু হ’য়েছে। জাপানে চিরকালই সমর

নেতারাই আধিপত্য করে এসেছে সব দিক দিয়েই। তাদের সামরিক কৃতিত্বই এর মূল ছিল। অনেকদিন সেরকম চমকপ্রদ কোন কৃতিত্ব দেখাতে না পেরে সামরিক নেতাদের সে আধিপত্যে ঘুণ ধরেছিলো— তাই, চীনের ওপর আবার নতুন কোন কৃতিত্বের আশায় তারা পিকিং অঞ্চলে আক্রমণ সুরু করে দিল।

ইউনাইটেড ফ্রন্টের খতিয়ান

লিখিত চুক্তি হোক্ বা না হোক্ মৌখিক কিছু একটা হয়েছে যে সেটা বেশ বোঝা গেলো। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যে সব সৈন্য যুদ্ধ করছিলো তাদের সরিয়ে নেওয়া হলো। বক্তৃতার সুরে কমিউনিষ্টদের আক্রমণের আমেজ থাকলেও তাদের দাবী অনুযায়ী কিছু কিছু কাজও হতে আরম্ভ করলো। রাজনৈতিক বন্দীদের ধীরে ধীরে ছাড়া হতে লাগলো—শাসন পরিষদও বাড়ানো হতে লাগলো। অবশ্য, চুক্তিকে কাজে পরিণত করাবার জন্যও অনবরত আন্দোলন করতে হয়—নইলে, চুক্তিও চুক্তিই থেকে যায়। সভাসমিতির স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেড়ে ওঠায় সারাদেশব্যাপী কমিউনিষ্টরা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সমর্থনের জন্য জোর আন্দোলন আরম্ভ করে দিলো। চিয়াংএর দলের অনেক কুচক্রীর কুচক্র ব্যর্থ করেও ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা সম্মিলিত প্রতিরোধ জোরদার হয়ে উঠলো। এর ভিত্তি হলো প্রধানত তিনটে—(১) জাপ-বিরোধী যুদ্ধ পরিচালনা, (২) গণতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থার প্রসার, (৩) জনসাধারণের জীবিকার মান উন্নত করা। অনেকটা সান্‌ইয়াৎ সেনের তিন নীতির অনুসরণ আর কি।

কমিউনিষ্টদের লক্ষ্য ছিলো, জাপ-বিরোধী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, এবং জাতীয় মুক্তি আদায়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামকে কার্যকরী করতে গেলে সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য এবং সেটাই তার সহজ মৃত্যু। কেননা, জনসাধারণের হাতে অস্ত্র না দিলে, জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকার না দিলে, জাপানের পরাজয় কখনই হবে না বা হতে পারে না, এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে—জাপানের উচ্ছেদ ছাড়া কেউই লাভবান্ হতে পারে না। তাই, সামন্তদেরও বজায় রাখবো, জাপানকেও তাড়াবো এই দুই একসাথে চলতে পারে না। সামন্তদের বজায় রাখলে জনসাধারণের হাতে জমি আসতে পারে না, তাদের জীবিকা উন্নত হতে পারে না—তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার চাপা পড়ে থাকে। ফলে, জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইএর প্রেরণা পাবে তারা কোথা থেকে? এইজন্যে অনেকের অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এগিয়ে চললো। অবশ্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রভৃতিও জনসাধারণের হাতে এমনি আসে নি—তার জন্য একদিকে জনসাধারণকে অবিরাম লড়াই চালাতে হয়েছে। অন্যদিকে, চিয়াংএর দীর্ঘদিনের কঠোর অভিজ্ঞতাও তাঁকে কমিউনিষ্ট বিরোধী অভিযান চালাতে নিরুৎসাহ করেছিলো। হিসেব করে দেখেছিলেন তিনি, কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর কী বিপুল ক্ষতি হয়েছে,—অজস্র সুশিক্ষিত সৈন্য মারা পড়েছে, অতুল সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। তার ফলে, দেখা গেছে তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে, অনেক জায়গাও কমিউনিষ্টদের দখলে চলে গেছে। এবং দেখা যাচ্ছিলো, ক্রমেই বেশী পরিমাণ জমি

কমিউনিষ্টদের আওতায় চলে যাচ্ছে। চিয়াংএর সাথে আপোষের ঠিক আগেই কমিউনিষ্টদের দখলে সবচেয়ে বড় ভূমিখণ্ড চলে যায়। এত বড় এলাকা এর আগে কোনদিন তারা দখল করতে পারে নি। এই সমস্ত দেখে শুনে বাধ্য হয়েই চিয়াংকে ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের নীতি স্বীকার করে নিতে হয়।

প্রত্যুত্তরে কমিউনিষ্টদেরও কতকগুলো সুবিধা ছেড়ে দিতে হয়। যেমন তারা প্রতিশ্রুতি দেয়—সোভিয়েট এলাকার নাম হবে—'Special Border District,' লালফৌজের নাম হবে—'জাতীয় বিপ্লবী সেনাদল',—এরা নানকিংএর অধীনে পরিচালিত হবে। জমি বাজেয়াপ্ত করার নীতি এবং পুনর্বণ্টনের নীতি পরিত্যাগ করা হবে। কুয়োমিন্টাংএর বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ রাখা হবে।

এই পরস্পর স্বার্থত্যাগের ফলে যে আপোষ গড়ে উঠলো তাকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন—যেমন, একদিন রুশ বিপ্লবের ফলাফলকেও এঁরা বিচ্যুতি বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন!

কমিউনিষ্টদের অভিধানেও অবশ্য আপোষের স্থান আছে, তা এঙ্গেল্স্ নিজেই স্বীকার করেছেন। "Compromises are often unavoidably forced upon a fighting party by circumstances...". অবস্থার দায়ে আপোষ অনেক সময় সংগ্রামশীল দলের পক্ষেও অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্রেণীর ওপর বিশ্বস্ত থেকে যদি এক পা পেছিয়ে দু'পা এগিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করা হয়, তবে আপোষ হলেও সেটা বিপ্লবী আপোষই। উন্মাদ হয়ে আগুনের মধ্যে ছোটাছুটি করাটাই বিপ্লব না-ও হতে পারে।

অনেকে আবার বলে থাকেন, চীনের কমিউনিষ্টরা এইভাবে সমাজ-তন্ত্রের পথ থেকে সরে গেলো। কিন্তু, সমাজতন্ত্রের পথ বাঁধা পীচের

রাস্তা নয় যে, চোখ বুঁজে হেঁটে গেলেই পৌঁছনো যায়। এ পথে পীচও যেমন আছে, কাদাজলও তেমন আছে। চোখ বন্ধ করে হেঁটে গেলে সেই কাদা জলে আছাড় খাবার সম্ভাবনা আছে। সমাজতন্ত্রের পথে যে গণতন্ত্রের একটা বাঁক আছে এটা যাঁরা ভোলেন তাঁরা হয় পথ চলবার সময় চোখ খোলেন না অথবা খুললেও পথ চলেন না ভয়ে—তাছাড়া আগেই বলেছি, দেশ না থাকলে কোন তন্ত্রই পা রাখতে পারে না। জাপ-প্রতিরোধ আর গণতন্ত্র যে একই তলোয়ারের দুটো ধারালো দিক একথা মাও-সে-তুংই বলেছেন। জাপ-প্রতিরোধের ধারালো দিক চালিয়ে গণতন্ত্রের পথ খোলসা করা হয় আর গণতন্ত্রের ধারালো দিক চালিয়ে জাপ-প্রতিরোধকে জোরালো করা যায়। তলোয়ারের এক মুখ আর এক মুখেরই পরিপূরক। আর একটা কথা যাঁরা বলে থাকেন মস্কোর পথই কমিউনিষ্টদের একটানা পথ—অন্য পথে যাবার স্বাধীনতা তাদের নেই—চীনের ঘটনা মনে করলে তাঁরাও লাভবান হবেন—কেননা, চীনা বিপ্লব মস্কোর পথে ধাওয়া করে নি—তার আপন বিশিষ্ট পথেই তার চলার সমাধান করতে হয়েছে। চীনের সমাজ ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির হিসেব রেখেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই 'Sinonization of Marxism' এর কথা চীনা Marxist নেতাদের কথা।

অনেকে বলে থাকেন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ভয়েই কমিউনিষ্টরা আপোষ করতে উদ্যত হয়—তার উত্তর এর আগেই দেওয়া হয়েছে—তাছাড়া, আপোষের ঠিক আগেই বৃহত্তম এলাকা দখল করেই সোভিয়েট চীন তার 'সুদৃঢ় জবাব দিয়েছে। আর তখন ব্যাপার সবই কমিউনিষ্টদের অনুকূল ছিলো ঘটনার দিক দিয়ে। তাছাড়াও Edgar snowর কথায় এর চরম উত্তর পাওয়া যেতে পারে—"Liberals who

build up hopes that the communists in china are "different" and only reformers and have abandoned revolutionary methods are doomed to ultimate disillusionment. These men are nationalists because they are in a Nationalist United Front Phase of Revolution, and they are perhaps strong enough in their own right not to fear becoming submerged as puppets of any body. But their religion remains International Socialism, and if conditions change, they may adopt whatever methods they believe necessary in order to stay on the locomotive of history. ..."যে সমস্ত লিবারেল্ (উদারপন্থী) এই আশা গড়ে তোলেন যে, চীনের কমিউনিষ্টরা "আলাদা" (ধরণের)—তারা নিছক সংস্কারক এবং তারা বিপ্লবী পথ ত্যাগ করেছে, তাঁরা চরম ভ্রান্তির মধ্যেই পড়বেন। বিপ্লবের জাতীয় যুক্ত প্রতিরোধের অধ্যায়ে আছে বলেই তারা জাতীয়তাবাদী। নিজেদের অধিকারেই তারা এতদূর শক্তিশালী যে কারও হাতের পুতুল হয়ে যাবার আশঙ্কা তাদের নাই। কিন্তু, নীতি তাদের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র। ইতিহাসের চাকায় টিঁকে থাকবার জন্য তারা, অবস্থা বিবেচনায়, যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।"

চীনের পুরোনো প্রবাদ বাক্যও এই আপোষেরই অনুকূল। তাতে আছে—শ্রেষ্ঠ সারথী কখনও প্রাণপণে ছোটে না। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কখনও রাগ দেখায় না। তাছাড়া, নিছক সাহস প্রতিপন্ন করাই বিপ্লবের ধর্ম্ম নয়। চীনের কমিউনিষ্টরা এই নিছক সাহস দেখাতে পারলে জাপানী স্বার্থের প্রতিভূরা যে তাতে খুসি হোতেন সেটা অনেকেই জানে।

ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টে ভূতপূর্ব সোভিয়েট

"বিশেষ এলাকা"—ভূতপূর্ব সোভিয়েটের এই নতুন নামে কাজ চল্‌তে লাগলো। শাসন সংক্রান্ত কাজ "Three Thirds" system অথবা তিন-তিন নীতি অনুযায়ী চলতে লাগলো! এই নীতি অনুযায়ী কোন শাসন পরিষদে এক তৃতীয়াংশ থাকবে কমিউনিষ্ট সদস্য, এক তৃতীয়াংশ কুয়োমিন্‌টাং এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বাইরের। কমিউনিষ্টরা এ চুক্তি বরাবরই পালন করে এসেছে বলেই শোনা যায়। যেখানে তাদের একতৃতীয়াংশের বেশী সদস্য ভোট পেয়েছে সেখানেও তারা সে আসন খালি করে দিয়েছে সাথে সাথে। কমিউনিষ্ট সদস্য কোনরকম দুর্নীতির আশ্রয় নিলে পার্টি থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা, তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেছে। এই শৃঙ্খলার ব্যবস্থা থাকায় কোন কমিউনিষ্ট সদস্যর পক্ষে চট্ করে অসংগত আচরণ করার উপায় ছিলো না। জনসাধারণের আস্থা রাখতে গেলে তাকে স্বার্থত্যাগী হতে হয়, তাকে কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়। একে অন্যের আদর্শ সৃষ্টি করে, পরস্পর আলোচনা-সমালোচনায় আত্মসংশোধনের ব্যবস্থা করে তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজকে এবং সমষ্টিগতভাবে পার্টিকে এবং দেশকে শক্তিশালী করতে পেরেছিল। এই বিশেষ এলাকায় রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় জনসাধারণের চেতনা অনেক উন্নত হয়ে উঠেছিলো। এমন কি সাধারণ গ্রাম্য চায়ের দোকানে পর্যন্ত রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শোনা যেত।

ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টে এই সমস্ত বিশেষ এলাকায় ভোটাধিকারের রীতিও সোভিয়েট থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে পড়লো। পূর্ণ গণতন্ত্রই সোভিয়েট

ব্যবস্থার স্থান নিলো। সবাই সমান ভোটাধিকার পেলো। এমনকি গ্রাম্য সামন্ত পর্যন্ত—যারা নতুন ব্যবস্থায় কেউ কেউ ফিরে এসেছিলো।

গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদকেই দৃঢ় করবার জন্য কমিউনিষ্ট নেতারা প্রথম মন দিলো আবার নতুন করে। এবার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে একই পরিকল্পনায় কাজ চলতে থাকলো—তাই, সাহায্যও কিছু কিছু পাওয়া গেল। চীনা গণতন্ত্রের নতুন বনিয়াদ তৈরী করলো চীনের নতুন ভাবে সৃষ্ট কোঅপারেটিভ আন্দোলন। এই কোঅপারেটিভ আন্দোলন চীনের সমাজও রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ পটভূমিকায় এক নতুন জীবনের বাণী নিয়ে দেখা দিল। কোঅপারেটিভ এর আগেও ছিল, কিন্তু এমন ব্যাপক রাজনৈতিক চেতনা সেদিন ছিলো না। এই রাজনৈতিক চেতনাই অসম্ভব বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়েও কোঅপারেটিভ চালু রেখেছে এবং তারই সাথে চীনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত রকম সঙ্কটকে অনেক পরিমাণে কমাতে পেরেছে। সংক্ষেপে এই আন্দোলনকে বলা হয় ইন্ডাস্কো (Indusco-অর্থাৎ, Industrial Co-oprative)। লেনিন বলেছিলেন, কোঅপারেটিভই হবে সোভিয়েট গণতন্ত্রের শক্তিশালী পটভূমি। চীনের ক্ষেত্রেও বলা যায়, এই ইন্ডাস্কোই ভবিষ্যৎ শক্তিশালী চীনা গণতন্ত্রের বনিয়াদ তৈরী করেছে। ক্রিপস্ একসময় বলেছিলেন, "The Chinese industrial co-opratives are building the foundations of a new democracy in China"—চীনা ইন্ডাস্কো চীনে এক নতুন গণতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী করছে।

যুদ্ধরত চীনে বিরাটকায় কল-কারখানা গড়ে তোলা অসম্ভব। সময় অর্থ, নিরাপত্তা সবদিক দিয়েই এর প্রচণ্ড বাধা আছে। তাই, জনসাধারণের সহজ চাহিদা এবং গেরিলা লড়াইএর দিকে লক্ষ্য রেখেই

অনধিকৃত চীনে—বিশেষ করে, এই বিশেষ এলাকায় অর্থাৎ ভূতপূর্ব সোভিয়েট সীমানায়—সমবায়-শিল্পের ছোট ছোট অসংখ্য কেন্দ্র গ'ড়ে তোলা হয়েছে। এর পেছনে আছে এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এর মূল-নীতিই হচ্ছে, "An ounce of planning is worth several tons of bombs."—এক আউন্স পরিকল্পনা কয়েক টন বোমার সমান। গেরিলা শিল্প বললেই একে বুঝবার পক্ষে ভাল হয়। কেননা এর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো এর সচলতা। গেরিলার পেছনে থেকে তার প্রয়োজনীয় সহজ এবং হাল্কা জিনিসপত্রই সাধারণত এরা তৈরী করে থাকে। সামান্য মূলধনেই এর কাজ সুরু করা যায়।

এই ইন্‌ডাস্‌কোই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও চীনা জনসাধারণকে টিঁকিয়ে রেখেছে। চীনা জনসাধারণ এর মধ্যে পেয়েছে তাদের বেঁচে থাকার সংস্থান। পেয়েছে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক চেতনা। এরই মধ্য থেকে গড়ে উঠছে ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের পরিচালনার সুষ্ঠু জ্ঞান। এক কথায় বলা চলে, চীনা ইন্‌ডাস্‌কো চীনা জনসাধারণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যা মিটিয়ে চীনের জন্য এক মহাভবিষ্যৎ নির্মাণ করছে।

জাপানী আক্রমণের মুখে ছোট ছোট কলকব্জা গুটিয়ে নিয়ে এদের সরে পড়তেও দেরী হয়না। আবার নতুন জায়গায় গিয়ে নিমেষের মধ্যে কাজ সুরু করায়ও কোন অসুবিধা নেই। অধিকৃত চীনের সাথে যোগাযোগ রাখাও এর পক্ষে অসুবিধা হয়নি—কেননা, অর্থকে চীনে "silver bullets"—রূপোর গুলি বলা হয়। গুলির মতই এর লক্ষ্য অব্যর্থ। এমনকি জাপানী শান্ত্রীকে পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে এরা বাইরের সাথে যোগাযোগ রাখতে পেরেছে। তাই অবরোধ এদের মৃত্যু ঘটাতে পারে নি। আর, জীবনরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে জনসাধারণও একে

আপনার বলেই গ্রহণ করেছে। এই গণসংযোগই একে করেছে দুর্জয়।

কমিউনিষ্টদের এলাকাতেই এর বিশেষ সফলতা দেখা দেবার প্রধান কারণ—তাদের স্বার্থত্যাগ। এরা অনেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করে। অনেকে ইচ্ছা করেই খুব সামান্য অর্থ ই এর কাছে দাবী করে থাকে। এই স্বার্থত্যাগের সাথে যোগ হয়েছে তাদের দলগত শৃঙ্খলা, তাদের অটুট শ্রমশক্তি, দুঃখকষ্ট সহ্য করার অদ্ভুত ক্ষমতা (দশ বছর অভূতপূর্ব দুঃখ কষ্টের সাথে লড়াই করে এদের শারীরিক এবং মানসিক কাঠামো হ'য়ে উঠেছে ইস্পাতের মত সুদৃঢ়) আর সবার শেষে এক সমষ্টিগত বলিষ্ঠ আদর্শ। এদের সাফল্যের সামনে নানকিং-এর দলগত চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গড়ে ওঠার পরও নানকিংএর কুচক্রী অংশ নানাভাবে চেষ্টা করেছে বিশেষ এলাকার ইন্‌ডাস্‌কোকে নষ্ট করতে। তারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বরাদ্দ অর্থ বন্ধ করেছে, বিশেষ এলাকা সৈন্য দিয়ে অবরোধ করেছে এবং আরও বহু জঘন্য পথের আশ্রয় নিয়েছে। কমিউনিষ্টদের জনপ্রিয়তা, তাদের শক্তিবৃদ্ধি—এদের শক্তি হ্রাসের কারণ বলেই এদের ধারণা। তাই, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির স্বাভাবিক পথে না গিয়ে এরা শক্তিঅপচয়ের দিকে গিয়েছে। তাতে, জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইএর ক্ষতি হলেও এদের মতির অন্যথা হবে না। ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট দুর্বল হ'লেও এরা সবল হতে চায়, তাকে পরাস্ত করে।

তবু এরা এই বিশেষ এলাকার ইন্‌ডাসকো ধ্বংস করতে পারে নি। বরং দিন দিনই এদের গেরিলা লড়াইএর কৃতিত্বের সাথে এদের শিল্প পরিচালনার দক্ষতা বেড়েছে বই কমে নি।

এর সাথে সাথে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থার দিকেও এরা মন দিয়েছে। জনপ্রিয় গান, নাটক, সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সে শিক্ষাকে

দ্রুত এবং সার্থক করেছে। কিন্তু, আগেকার তুলনায় এখনকার ধারাই একেবারে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এখনকার সব কিছুই জাপান বিরোধী। নানকিং-বিরোধী প্রচার একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের নীতিকে এরা কতদূর নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে তার একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। চীনের বিখ্যাত মহিলা সাহিত্যিক Ting-lingকে (টিংলিং) নানকিং সরকার এর আগে গ্রেপ্তার করে এক অনির্দিষ্ট স্থানে আটকিয়ে রাখে। অনেকেই জানতো, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। জাপান-বিরোধী ফ্রণ্ট সৃষ্টি হবার পর তাঁর এই অহেতুক নির্যাতনের হাত থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়। মুক্তির পর তাঁর বন্দীজীবনের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট নীতি ক্ষুণ্ণ হবে বলে কোন কিছু বলতে অস্বীকার করেন। এইভাবে এরা নিষ্ঠার সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট নীতি পালন করে থাকে বলে শোনা যায়। তাই, এদের ধ্বনি হয়েছে আজ—"Support the leader against Japan—." জাপানের বিরুদ্ধে নেতাকে সমর্থন কর।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি গড়ার কাজে এই মরণ-বাঁচন সমস্যার মধ্যেও এরা সমানই সজাগ। কারণ, এরা জানে জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সাথে সংস্কৃতি বা কৃষ্টির যোগাযোগ সৃষ্টি না করতে পারলে ফ্যাসিজ্ম্এর বিরুদ্ধে লড়াইএ বিজয়ের পথে এগোন যায় না। সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনই মানসিক স্ফূর্তি বা সজীবতা সৃষ্টি করতে পারে—প্রতিরোধের পক্ষে যা অপরিহার্য। সংস্কৃতির চেতনাই মানুষকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে, তাকে সংস্কৃতি রক্ষায় দুর্ধর্ষ করতে পারে। এই চেতনার ফলেই দীর্ঘ আট বছরেও চীন ভেঙ্গে পড়ার লক্ষণ দেখায় নি।

এই সংস্কৃতির ভিত্তি তৈরী হচ্ছে পাহাড়ের গুহায় গুহায়—যেখানে

গড়ে উঠেছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়—শিল্পকলার অজস্র পীঠস্থান। পাহাড়ের গুহাই তাদের অট্টালিকা, ইট হচ্ছে বেঞ্চ, মাটির দেওয়াল ব্ল্যাক বোর্ড, পাশের জমি যোগাচ্ছে—ফসল, শাক-সব্জী। সংস্কৃতির এমন জীবন্ত সমারোহ কেউ কোনদিন দেখেছে কি! এতবড় সংস্কৃতির মূলে যে এত সহজ-সরল এবং অনাড়ম্বর ব্যবস্থা, তা ভাবলে অবাকই লাগে। সংস্কৃতির সাথে বাস্তবের সংযোগ ঘটিয়ে এইভাবে তাকে করা হয়েছে সুস্থ, স্বাভাবিক—জীবনসমস্যার সমাধানের সহজ পথ-নির্দেশক।

জাপান-বিরোধী নাটক এরা মাঝে মাঝে অভিনয় করে জনসাধারণের জাপ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে। এই অভিনয়ে যোগ দেবার অধিকার সবারই আছে। লালফৌজ আর গেরিলাদের সাথে সাধারণ কৃষক-মজুর পাশাপাশি বসে এই অভিনয় দেখে। 'অভিযান' বলে নাটক অভিনয় হচ্ছিলো একদিন। এই সুযোগে তার বিষয়বস্তুর একটা ইঙ্গিত সংক্ষেপে দিয়ে রাখি—সিন্ ওঠার সাথে সাথে দেখা গেলো—১৯৩১ সালের মাঞ্চুরিয়ার একখানা গ্রাম। জাপানীরা পলায়িত চীনা সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেলো, একজন কৃষকের বাড়ীতে জাপানী সৈন্যদের এক মহোৎসব চলছে। চীনারা চেয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে জাপানী সৈন্যদের চেয়ারের অভাব পূর্ণ করছে। মাতাল জাপানী সৈনিক গৃহকর্ত্রীর কাছে প্রেমনিবেদন করছে। আর একটা দৃশ্যে এসে ঢুকলো জাপানী ছদ্ম-ফেরীওয়ালার দল—মরফিন্ এবং হিরোয়িন্ (আফিং থেকে তৈরী একরকম বিষের মত নেশা বিশেষ) চাষীদের দিয়ে জোর করে কেনাতে লাগল। যে কিনতে নারাজ হয় তাকে বেছে নিয়ে নানারকম জেরা করা হয়—শেষে গুলি করে মারা হয় তাকে। তারপর জাপানী সৈন্যরা দলে দলে ছুটে জাপ-বিরোধী

দস্যুদের ধরে নিয়ে আসে—পথে যাকে পায় তারই কাছ থেকে পাসপোর্ট দাবী করে। না পেলে গুলি করে মারে। জাপানী সৈন্যরা দোকানদারের কাছ থেকে জিনিস কেনে; দাম চাইলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তারা। বলে, তোমাদের চিয়াং আমাদেরকে জেহোল, চাহার (চীনের প্রদেশ) দিয়ে দিয়েছে আর তোমরা এই সামান্য জিনিসের জন্য দাম চাও? শেষ দৃশ্যে দেখা গেলো—জাপানী অত্যাচারে বেপরোয়া গ্রামবাসী যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে লড়াই করতে ছুটছে।

নাটকের মাঝখানে আবার দর্শকরা সবাই মিলে দাবী করে বসলো—মাও সে তুং আর রেড্ এ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্ট লিন্-পিয়াওকে ডুয়েট্ গান গাইতে হবে। কবি মাও সে তুংকে আমরা চিনেছি (লং মার্চের সময়ও তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন) কিন্তু গায়ক মাও এর পরিচয় অজ্ঞাত ছিলো। হঠাৎ দেখা গেলো, দর্শকদের এক প্রান্ত থেকে একখানা ভাঙ্গা চেয়ার বেয়ে অগণ্য মানুষের গা-মাথা প ডিঙ্গিয়ে মাও নেমে আসছেন। পণ্ডিত-দার্শনিক নতুন চীনের সব-সেরা নেতার মুখে যখন গানের সুর মূর্ত হয়ে উঠলো সে এক শোনার জিনিস না হলেও দেখার জিনিষ বটে। এমনি করে নায়ক আর গায়কের ভূমিকায় চীনের শক্তিশালী জননেতা জনগণের প্রাণের সাথেই যোগ রাখতে পেরেছেন। তাই, চীন আজ আর অচীন্ জীবনের ভস্মাধার মাত্র নয়—নতুন জীবনের কিশলয় তার নবজীবনের শ্যামল চিহ্ন।... তাই বলে Edger Snow কিন্তু (নাচ না জান্লেও) ইউরোপীয় নাচ দেখাবার দায়িত্ব থেকে রেহাই পান নি—তাঁকেও জনসাধারণের দাবীকে মেটাতে হয়েছিলো।"

এই গান আর নাচই এই বিশেষ এলাকার জীবনী শক্তি। এই গান এখানে এমনই ছোঁয়াচে এবং এমনই স্বতঃস্ফূর্ত যে এর হাত থেকে

কারও পরিত্রাণ নেই। Snow সাহেবের বর্ণনাতেই জানা যায় যে, এ রোগ সৈন্যদের মধ্যে সংক্রামক। তারা কোথাও মার্চ করে চলেছে, হয়তো অমনি কেউ গান গেয়ে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে দলের সবারই মুখ হাত বা পা কিছু না কিছু তাতে সারা দেবেই। আর গানের ষ্টক্‌ও কি এতো! এর যেন শেষ নেই। এরা অভিনয় করে, এরা গান গায়—এরা বেয়নেট নিয়ে লড়াই করতে ছোটে—তাই শূন্য হাতেও এদের প্রতিরোধ দুর্জয় হয়ে ওঠে।

জাপ-বিরোধী প্রচারের নমুনাও এদের আলাদা। জাপানী ভাষায় প্রচারপত্র তৈরী করে এরা সৈন্যদের মধ্যে বিলি করে। কার্টুন ছবি এঁকে রাস্তায় রাস্তায় ঘাড়ে করে বেড়ায়। কোন ছবিতে হয়তো রয়েছে—ঘোড়ার পিঠে জাপসম্রাটের কঙ্কাল। জাপসৈন্যদের তিনি চাবুক মারছেন। কোনটাতে হয়তো রয়েছে—জাপানী সেনা যারা দলত্যাগ করে চলে এসেছে, তাদের অভ্যর্থনা করা হচ্ছে।

জাপানী সৈন্যদের অথবা তাবেদার ওয়াং-চিং-ওয়েই গবর্ণমেণ্টের চীনা সৈন্যদের দলত্যাগের সুবিধার জন্য এরা একরকম ছাড়পত্র ছড়িয়ে দেয় ওদের মধ্যে। তাতে লেখা থাকে—(১) এই ছাড়পত্রের সাহায্যে আপনি লাইন পার হয়ে আমাদের কাছে চলে আসতে পারেন। (২) এই ছাড়পত্র আপনার জীবন রক্ষা করবে। (৩) এই ছাড়-পত্রের বলে আপনি আমাদের সৈন্যবাহিনীতে সদ্ব্যবহার পাবেন—আহতগণ বিশেষ চিকিৎসা পাবে। (৪) যারা জাপানে ফিরে যেতে ইচ্ছুক তাদের পথ খরচ দেওয়া হবে।

এর ফলও পাওয়া গেছে বেশ। দলত্যাগী অনেক জাপানী সেনা এ পক্ষে ভীড়ে গিয়েছে।

জাপ-বিরোধী অনেক পত্রিকাও গড়ে উঠেছে—"মুক্তি" তাদের মধ্যে

অন্যতম। অনেক জাপ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিও তৈরী হয়েছে—যেমন, "সৈন্যদল গঠন সমিতি," "জাপ-বিরোধী সংঘ" ইত্যাদি।

লালফৌজের, বর্তমানে জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর, শৃঙ্খলা এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধে Snow সাহেব মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি লিখছেন যে তাঁর অবস্থানের সময় একদিনও তিনি ওদের পরস্পর মারামারি দেখেন নি—সৈন্যদের মধ্যে এগুণ দুর্লভই। গুণগত রূপান্তর ছাড়া এ সম্ভব নয়। এ নতুন আদর্শ বোধের গুণ। জাতীয় বিপ্লবী বাহিনী—অষ্টম রুট আর্মি এবং নতুন চতুর্থ আর্মি নামে পরিচিত। প্রথমে এক অষ্টম রুট আর্মিই ছিলো শুধু। এদের সাহস, ত্যাগ ও কৃতিত্বে এবং জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারে দলে দলে লোক এইসব বাহিনীতে এসে যোগ দেয়—এদের অধীনস্থ খণ্ড-বিচ্ছিন্ন গেরিলা দল ভারী করে তোলে। এরাই জাপানীদের পথের সবচেয়ে বড় কাঁটা, তাই এদের বলা হয়—"The partisans are spokes in Japanese wheels"—পার্টিজানরা (গেরিলাদের বলা হয়) জাপানী চাকায় স্পোকের মত। এই স্পোকই মুহূর্তে মুহূর্তে ওদের বিপদ ঘনিয়ে তোলে। জনসাধারণের বিপদের মুহূর্তে এরা সব চাইতে বড় বন্ধু বলে এবং এদের অপূর্ব ত্যাগ ও বীরত্বের জন্য ভগবানের মত লোকে এদের উপরই আস্থা রাখে বেশী—তাই, এরা 'Soldiers Of God (ঈশ্বর প্রেরিত ফৌজ), "World Army No 1" (এক নং বিশ্ববাহিনী) বলে পরিচিত। এ থেকেই এদের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করা যায়।

এখন সংক্ষেপে এই বিশেষ এলাকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেই এ অধ্যায় শেষ করবো। সিউ-টে-লি (Hsu-Teh-Li) এই শিক্ষা সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত। জাপ প্রতিরোধ এবং সান্‌ইয়াৎ

সেনের তিন নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এর কাঠামো।

শিক্ষা প্রসারের কাজে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান সাহায্য করছে। তার মধ্যে আছে—“লেখা-পড়া-শেখা সমিতি” (Learn To Read And Write Society), নৈশ বিদ্যালয়, হাফ ডে-স্কুল, জনশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, চলন্ত লাইব্রেরী ইত্যাদি। অশিক্ষা দূর করার কাজে এদের সবারই বিশেষ দান আছে।

পাঠ্যতালিকায় আছে—লিখতে পড়তে শেখা, অঙ্ক কষা, জাতীয় সঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা, দেশরক্ষা বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান।

‘জাপানের সাথে চীন কেন লড়ছে’, ‘ভালো লোকে ফ্রণ্টে যায়,’ ‘আহত সৈন্যদের আনন্দ দাও’—ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট গল্প তৈরী হয়েছে যা ছেলেদের শোনান হয়।

সব কিছুই প্রায় এদের বাস্তবের নিরীখে শেখানো হয়। অঙ্ক শেখাবার পদ্ধতিও আলাদা। চার আর পাঁচে নয় হয় না বলে বলা হয়—চারটে মাঞ্চুরিয়ার প্রদেশ এবং পাঁচটা জাপান কর্তৃক আক্রান্ত উত্তর চীনের প্রদেশ মিলে নয়টা প্রদেশ হয়।

খোলা জায়গায় লেখাপড়া, খেলাধুলো সব চলে—ফলে, সামান্য খরচেই লেখাপড়া শেখানো চলে। দেশরক্ষা বিষয়ে শিক্ষা দেবার সময়ে ছেলেদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়—তাদের শান্ত্রীর কাজ করতে হয়। সৈন্যদের স্কুলের ঘরে অনেক সময় থাকতে দেওয়া হয়—ফলে, ছেলেদের সাথে সৈন্যদের ছোটবেলা থেকেই কেমন একটা প্রীতির ভাব গড়ে ওঠে। এইভাবে বাস্তবের সংস্পর্শে এদের সামরিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কোন কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে এদের কল্পনাবিলাসী হবার সুযোগ দেওয়া হয়না। বাস্তব জীবনে যা ঘটছে এবং ঘটতে পারে তাই এদের শিক্ষার বিষয়-বস্তু। তাই জাপানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত

বীর প্রাণ দিয়ে লড়েছে তাদের বীরত্বের কাহিনী এদের শোনান হয়। রচনার বিষয়বস্তু হয়—'কেন আমরা বেশী ফসল উৎপাদন করবো ?'

বাস্তব জীবনে এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করবার সুযোগ দেওয়া হয়। ছোট ছেলেরাও ফসল ফলাবার কাজে সাহায্য করে। অশিক্ষিত চাষীদের শিক্ষিত করে তুলবার দায়িত্ব এদের ওপরও আছে।

এদের নাটকের পদ্ধতি, এদের গানের বিষয়বস্তু, এদের শিক্ষার ধারা অনেকটা সমরমুখী হয়েছে সত্য, এবং তার জন্য খানিকটা বিকৃতির অভিযোগ স্বীকার করে নিলেও একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে, জীবনের কঠোর সত্যের সম্মুখীন হবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সেই শিক্ষাই এদের আজকের একমাত্র শিক্ষা হবে—এটা আশ্চর্যজনক নয়। শত্রু দুয়ারে যখন তখন প্রেমের গান শোভা পায় না—উঁচু চিন্তারও অবকাশ নেই। যে শত্রু আজ শিয়রে দাঁড়িয়ে তাকে সবাই মিলে ধ্বংস করাই আজ প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্বকে মহান্ শিক্ষার নামে ফাঁকি দেবার অর্থ চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা। আঘাতোদ্যত অস্ত্র মানবিক গুণের প্রেরণা যোগাতে পারে না সবটাই—কিন্তু অস্ত্রের আড়ালে যে মন রয়েছে সে মনে আছে মানবত্বকে, মানুষের সব মহত্ত্ব, সব ঐশ্বর্যকে রক্ষা করার দুর্লভ প্রেরণা। তাই, সে মন বিকৃত নয়। বিকৃতি যদি কিছু থাকেও তবু সে অস্বাভাবিক জীবনের তরঙ্গাঘাতে। যেদিন জীবন-নদী শান্ত হয়ে যাবে, শত্রুর কালো ছায়া দিগন্তে মিলিয়ে যাবে, সেদিন ওই তরঙ্গের বিকৃতি থাকবে না। সেদিন নদীর মতই জীবন উঠবে আলো-ছায়ায় অপরূপ হয়ে। সেই আলো-ছায়া যে আজকের দুর্যোগেরই রঙীন পরিণতি সে কথা অস্বীকার করবে কে ?

তাই, সামরিক কারণে খানিকটা ত্রুটী, খানিকটা বিকৃতি সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও শত্রু যেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে,

সেদিন আবার সুস্থ অথচ পূর্বের চেয়ে অনেক সজীব জীবনেরই আস্বাদ পাওয়া যাবে। এ সাময়িক বিকৃতিও অতীত ও ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করার স্বীকৃতি। মানুষের কল্যাণ—এ আপনিই আসে না, একে আনতে হয়। মানুষের প্রগতি—মসৃণ পথের ওপর দিয়ে একে টেনে আনা যায় না, একে আনতে হয় বন্ধুর পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে; তাই পাথেয় তার কিছু চাই-ই। সেই পাথেয়ই তো এই বিশেষ এলাকার মানুষ জীবন এবং যৌবনের বিনিময়ে সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

ইউনাইটেড ফ্রণ্টের বিনাইটেড অণ্টরা

এখন ইউনাইটেড ফ্রণ্টের এই বিনাইটেড অণ্টদের সম্বন্ধে কিছু বলবো। ইংরাজীতে aunt অর্থ মাসী আর benighted মানে নীতি-হীন। ইউনাইটেড ফ্রণ্টএর এই নীতিহীন মাসী কারা? মাসীর ছদ্ম দরদ দিয়ে কারা একে অপথে বিপথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করছে! কাদের চোরা-গুপ্ত আক্রমণে জনসাধারণের অজস্র জীবনের বিনিময়ে তৈরী একতার মহান্ হর্ম্য মাঝে মাঝে ধ্বংসের আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছে! এক কথায় এর উত্তর—যারা চিয়াংএর অপহরণের সময় সৈন্য পাঠিয়ে আবার নতুন করে গৃহযুদ্ধের ভূমিকা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। নিরপরাধ অসংখ্য দেশপ্রেমিকের মাথার জন্য যারা জাতির অজস্র সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছে—শত শত চীনা গ্রামকে শ্মশান করে দিয়েছে এবং যারা আপন নির্লজ্জতায় জাপানী স্বার্থের পায়ে

নিজেদের মাথা নুইয়েছে—এক কথায়, জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে—এরা তারাই—কায়েমী স্বার্থের মালিকবৃন্দ।

ইউনাইটেড ফ্রন্ট সৃষ্টির আগেও যেমন এরা ছিলো ঐক্যের সব চেয়ে বড় বাধা—পরেও এরাই সেই গড়ে-ওঠা ঐক্যকে ভেঙে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের মধ্যে আজও এদের শক্তিশালী অংশ রয়ে গেছে। এরা সময়ে অসময়ে জাতির সমষ্টিগত স্বার্থ বিপন্ন করবার জন্য জঘন্য নীচ সমস্ত কাজ করে বসে। রোগের বীজানুর মত এরা অহর্নিশি জাতির ধ্বংসের কাজ লেগে আছে। এদেরই একজন হচ্ছে যুদ্ধমন্ত্রী হো-টিং-চীন, কমিউনিষ্টদের ঘোরতর শত্রু। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ইনি বিরোধী ছিলেন। দায়িত্বশীল মহলে এইরকম ধারণা আছে যে, চিয়াং কাইশেক ইচ্ছা করলেও এঁকে এঁর পদ থেকে সরাতে পারেন না। যুদ্ধমন্ত্রীই যুদ্ধের বিরোধী কথাটা শুনতে অনেকটা সোণার পিতলের ঘুঘুর মত। এঁর নেতৃত্বে যে যুদ্ধ কি রকম ধরণের জোরালো হতে পারে তা বেশ অনুমান করা যায়। ভূতপূর্ব নানকিং ফৌজের দুর্বলতা এখানেই। তাই, তাদের ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে পড়ে। তাই, কমিউনিজম্‌এর নামগন্ধ না থাকলেও এঁরা কমিউনিষ্ট দুঃস্বপ্নের ঘোরে প্রলাপ তুলে বলেন—"Japanese are only lice on the body of China, but Communism is a disease of the heart."—জাপানীরা তো চীনের গায়ের ওপর শুধু উকুন মাত্র, কিন্তু কমিউনিজম্ হলো হার্টের রোগ (তাই, আরও সাংঘাতিক)।

কমিউনিষ্টদের এত স্বার্থত্যাগেও এঁদের বিকার বিকারই থেকে গেছে। কমিউনিজম্ চীনের মুখ্য প্রশ্ন নয়—জাতীয় স্বাধীনতাই মুখ্য প্রশ্ন—একথা বার বার নানারকম ভাবে কমিউনিষ্টদের তরফ থেকে

ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও এদের টাইফয়েডের ডিলিরিয়াম বন্ধ হয় নি—বরং বেড়েই চলেছে।

কমিউনিষ্টদের পরিচালিত সৈন্যদল যে যুদ্ধে জেতে সেটাও তাদের দোষ। তারা যে জাপানের কাছে বিভীষিকা এটাও এই সব মাসীরা বিসূচিকার মতই মারাত্মক মনে করেন। আসল কথা, সোণার সিন্দুকের মধ্যে প্রাণ রেখে এঁরা সচেতন জনসাধারণের হাতে তার রক্ষার ভার না দিতে পেরে শঙ্কায় কাতর হয়ে উঠছেন। তাই মাঝে মাঝে এরকম আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

এই আশঙ্কার ঘোরেই এঁরা কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তিশালী মর্যাদাকে আজও স্বীকার করে নিতে পারেন নি। কমিউনিষ্টদের সাথে যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কটা কেমন, তা কেউ জানে না আজ পর্যন্ত। জনসাধারণের সভা-সমিতিতে আজও পুলিশের উৎপাত লেগেই আছে—এ্যানা লুইজি ষ্ট্রঙ্গএর সাক্ষ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অষ্টম রুট আর্মির পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য আর নতুন চতুর্থ আর্মির ওর চেয়ে কম সংখ্যক সৈন্যের মাইনার দায়িত্ব নিয়েছেন—অথচ, এদের সংখ্যা কমসে কম পাঁচ ছ' লাখ। যুদ্ধ জেতেও এরাই বেশী। জাপান এদেরই ডরায় বেশী। জনসাধারণেরও আস্থাভাজন এরাই। সাধারণ লোকের একটা কবিতা প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছে—"As in lettuce you eat the heart, so if you join the Army, join the New Fourth"! লেটুস্ শাকের শাঁসালো অংশ যেমন খেতে ভালো তেমনি সৈন্যদলের মধ্যেও নতুন চতুর্থ আর্মিই যোগ দেবার পক্ষে উপযুক্ত। এদের শক্তির এইই প্রমাণ।

এরাই সব চাইতে বিপদপূর্ণ এলাকায় চলাফেরা করে—এদেরই জন্য শুধু জাপান আজও চীনের অনেকটা জয় ক'রেও কিছুই জয় করতে

পারে নি। বড় বড় সহরে শুধু তার শাসন—গ্রামগুলো আজও এইসব গেরিলা সৈন্যের আসন। অথচ, এর পুরস্কার কি! পুরস্কার হচ্ছে এদেরই ধ্বংসের চক্রান্ত। কেননা, জাপানীদের চেয়েও এরা বেশী শত্রু, জনসাধারণের বন্ধু ব'লে। এদের সাথে পার্থক্য দেখাতে গিয়ে একজন কমিউনিষ্ট নেতা ব'লছেন—"The difference between us and the Kuomintang is that we think Japanese Imperialism is a deadly disease and our blood-cells need the help of scientific medicine, while the Kuomintang thinks our medicine is too revolutionary than the disease itself."—অর্থাৎ, আমাদের সাথে কুয়োমিনটাংএর পার্থক্য হ'চ্ছে—আমরা জাপ সাম্রাজ্যবাদকে কঠিন ব্যাধি বলে মনে করে থাকি এবং মনে করি আমাদের রক্ত কণিকায় বৈজ্ঞানিকের ওষুধের সাহায্যের প্রয়োজন (ওই রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য)—কিন্তু, কুয়োমিনটাং মনে করে রোগের চেয়ে আমাদের দাওয়াই অত্যন্ত বেশী জোরাল বা মারাত্মক।

এই দাওয়াইকেই ওই সব মাসীদের বড় ভয়। আর স্বাভাবিক কারণেও (অনেকটা) দুই দল সৈন্যের দুই রকম দাওয়াই সৃষ্টি হ'য়েছে। কুয়োমিনটাং ফৌজের শিক্ষা হচ্ছে জার্মাণ সমর-বিশারদদের কাছে—তাই, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে হুকুম চালান আর হুকুম তামিল করা গোছের। নেতৃত্বের মুখ চেয়ে তাদের লড়াই চলে—জনসাধারণের সহযোগিতার ধার ধারে না। তাই, গতি তাদের একরোখা—হয় পেছনো নয় এগোনো—এ দুয়ের সামঞ্জস্য তারা করতে পারে না—কেননা, গণ-সংযোগ দরকার হয়ে পড়ে সেই সামঞ্জস্য আনতে গেলে। কিন্তু কমিউনিষ্ট সৈন্যদলের প্রধান হাতিয়ার জনসাধারণ। এই হাতিয়ারের পরাজয় নেই। একের স্থান আর একজন নিয়ে থাকে।

সামনে-পেছনে সব দিকেই শত্রুর শত্রু বিভীষিকার চক্র সৃষ্টি করে তাদের দিক্‌ভ্রম ঘটায়—তাই, পরাজয় হয়ে ওঠে তাদের অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু, আপন দুর্বলতায়ই এই গণসংযোগ গড়ে তুলতে পারেনি কুয়োমিনটাং সেনা। পুঁজির উজীরি করে জনশক্তির উদ্বোধন করা যায় না। যে ত্যাগ গণমানবকে আকৃষ্ট করতে পারে এদের তা' কোথায়? তাই, এরা যুদ্ধে হারে—আর, যারা জেতে, স্বার্থের তাগিদে, ঈর্ষার কশাঘাতে তাদেরও জয় অসম্ভব করে তুলবার সব রকম চক্রান্ত সৃষ্টি করে। এর বহু নজীর আছে।

এই চক্রান্তের ফলেই যে টাকা মাইনা হিসেবে এই জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর প্রাপ্য তাও পৌঁছয় না। মাসের পর মাস চাপা পড়ে থাকে। অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া তো দূরের কথা। একজন কমিউনিষ্ট নেতা দুঃখ করেই বলেছিলেন, কুয়োমিনটাংএর চাইতে আমরা জাপানী এলাকা থেকেই সহজে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে থাকি। এই একটা উক্তির আড়ালে অনেক প্রচ্ছন্ন উক্তির ইঙ্গিত রয়েছে।

এমন ঘটনাও অনেকবার হয়েছে, এইসব মাসীয় দলের চক্রান্তে কুয়োমিনটাং ফৌজ—কমিউনিষ্ট ফৌজের চার পাশে অবরোধ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাদের এগোতে দেবে না। অনেকবার সংঘর্ষও হয়ে গেছে দুই দলে। প্রথম সংঘর্ষ হয় উত্তর শেনসীতে। এই এলাকায় কুয়োমিনটাং দূষিত চক্র প্রায় দু'হাজার ব্লক হাউজ তৈরী করে রেখেছিলো—এদের অবরোধ করে শুকিয়ে মারবার জন্য। অথচ এই কমিউনিষ্ট সৈন্যদের জয়ের ফল ভোগ করবার বেলায় এরাই আগে ছোটে। জাপানীদের আক্রমণের মুখে কাপুরুষের মত পালাবার বেলায়ও এরাই আগে। যেমন Chefoo (চেফু) প্রদেশের শাসনকর্তা। জাপানীরা আসছে শুনেই তিনি তল্পি-তল্পা নিয়ে সরে পড়েছেন। জনসাধারণ

তাদের বিপদের দিনে ওঁর কোন সাহায্য পেলো না—অথচ, যেই কমিউনিষ্ট ফৌজরা এসে ওই এলাকা জাপানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো, অমনি পাতাল থেকে হঠাৎ যেন তিনি গজিয়ে উঠে তাঁর রাজ্য থেকে সেলামী দাবী করে বসলেন। এরাই হচ্ছে তখনকার ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের কপট মাসীর দল। এদেরই দুর্বলতার সুযোগে জাপানী প্রচার প্রগল্‌ভ হয়ে উঠে। ওয়াং চিং ওয়েইএর মত কুইস্‌লিংদের সন্ধানে তার সন্ধানী চোখ সজাগ হয়ে ওঠে।

আমেরিকান্ বণিকরাও বণিকী স্বার্থে কমিউনিষ্টদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অপপ্রচারে মেতে আছে। তাদের প্রভাব পড়েছে আমেরিকায়। আমেরিকান বণিকের ফরমাসী সেবক হলিউড্ কমিউনিষ্টদের এলাকার এক ভয়াবহ রক্তচিত্র ফুটিয়ে তুলে মাঝে মাঝে মার্কিন জনসাধারণকে বিহ্বল করে তোলে এবং তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া পড়ে চুংকিংএর ওপর। চুংকিংএর এই দুর্বলতাই জাপানের বড় শক্তি। আর তার শক্তিই চীনের বড় দুর্বলতা। সমস্ত জাতির শক্তির এই দুর্বল স্থানেই অহর্নিশি এদের আঘাত পড়ছে। সে আঘাত কাটিয়ে ওঠার দায়িত্ব চীনা জনসাধারণের।

সঙ্কটের লালমেঘ

United Frontএর দুর্বলতার কারণ এর আগেই বলা হয়েছে। আজ যুদ্ধ যখন সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, যখন সারা পৃথিবীর বিপ্লবী মানব প্রতিক্রিয়াপন্থী কায়েমী স্বার্থের মালিকদের চক্রান্তকে বানচাল ক'রে দিচ্ছে—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, গ্রীস যার নিদর্শন—তখন বিশ্বব্যাপী এক অকুল গণসমুদ্রে পুরানো চীনের বনিয়াদী গোষ্ঠীর হাবুডুবু খাবার সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠায় চক্রান্তের সমস্ত রকম অস্ত্র নিয়েই তারা পরীক্ষা সুরু করে দিয়েছে। এই অস্ত্রো-পচার হৃৎপিণ্ডে পৌঁছলেও এদের তাতে ক্ষতি নেই। গ্রীস এবং বেলজিয়ামের রক্ত-মোক্ষণের জহ্লাদের দল যেমন চুরুট-মুখী চার্চিলএর আড়ালে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে—চীনের গৃহযুদ্ধের পুরোধা সৈনিকেরাও জেনারেলিসিমো চিয়াংকে তাদের আশ্রয়ের প্রাচীর করে তুলবার ফিকিরে আছে। ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট গড়ে ওঠার পরেও কেন এবং কি করে এই ভাঙ্গন চীনের রক্তকে বিষাক্ত করে তুলছিলো এবং পরিশেষে সেই সর্বজনপুষ্ট শিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘনিয়ে তুলেছে সংক্ষেপে তার একটা ইতিহাস দেবার চেষ্টা করবো।

চারিদিক থেকেই একটা রব উঠেছে কিছুদিন থেকেই চীন গেলো গেলো। রুশ শ্রমিকদের মুখপত্র War And The Working Class খবর দিলো কয়েকটী ক্ষেত্রে চীনের প্রতিরোধ বন্ধ হয়ে আছে। দেখতে দেখতে জাপান চীনকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। আমাদের দেশেও কানা-ঘুষোকারীর দল তৎপর হয়ে উঠলো—'চীন গেছে—চীন আর নেই—

জাপানের সাথে তার সন্ধি হয়ে গেছে।' বিদেশী সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের মারফতে চীনের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থারই খবর ক্রমান্বয়ে আসছিলো। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন এবং টুকরো খবর মিলিয়ে একটা সত্য সিদ্ধান্তে পৌছান যেতে পারে। সেটা হচ্ছে এই—চীনের প্রতিরোধের শিথিলতা এসেছে। তবে কি এই দীর্ঘ আট বছরের অথবা অন্য কথায় বলা চলে—পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রতিরোধী আন্দোলন চীনের সম্পদ ও শক্তির সীমান্তকে ছাড়িয়ে চলেছে? সে কথার উত্তর দিলো সেই 'যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী'। এর চাইতে নগণ্যতম শক্তি ও সামর্থ্য নিয়েও যুগোশ্লাভ প্রতিরোধী বাহিনী জার্মাণ বাহিনীর মত প্রচণ্ড বাহিনীর সাথে সাফল্যের সাথে লড়াই করে চলেছে।

তবে চীন প্রতিরোধের এই দুর্বলতার উৎস কোথায়? বিভিন্ন সূত্রের সংবাদও মোটামুটি একই উৎসের সন্ধান দিলো। ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরেছে। তাই, প্রতিরোধের এই আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন যে ঐক্য কোনরকমে বজায় ছিলো—আজ তা' চৌচির হয়ে যাবার মুখে। United Frontএ পক্ষ বলতে যখন প্রধানত দুটো—কুয়োমিনটাং এবং কমিউনিষ্ট, তখন এ দু'য়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্ব কার—ঘটনার নিরিখে সেটা বিচার করে দেখা যাক্।

গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থায় সিয়ান ঘটনার ফলে কুয়োমিনটাং কমিউনিষ্টের বোঝাপড়া অর্থাৎ—United Frontএর ভিত্তি তৈরী হলো (যদিও এ সম্বন্ধে পাকাপাকি কোন দলিল তৈরী হয়েছে বলে বাইরের কেউ জানে না) তখন দুই পক্ষের ওপরই অপরিহার্যভাবে কতকগুলো দায়িত্ব পড়ে। মোটামুটি সান মিন চিউ নীতিই এই পারস্পরিক সম্পর্কের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এই নীতি কমিউনিষ্টদের সর্বনিম্ন কার্যতালিকারও নীচে পড়ে—কেননা, এতে আমূল ভূমি-বিপ্লবের কথা ছিলো

না কিংবা শ্রমিকদের আট ঘণ্টা শ্রমকাল নির্ধারিত হয় নি—তবু, কমিউনিষ্টরা আপোষে পারস্পরিক স্বার্থত্যাগের মূলনীতি স্বীকার করে ওই সান্ মিন্ চিউ (২য়) নীতিতেই আঁকড়ে থাকার সিদ্ধান্ত করে। এখন পরীক্ষা করা দরকার, কমিউনিষ্টরা তাদের নীতি থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হয়েছে কিনা।

সেদিন পর্যন্তও যে চিয়াং কমিউনিষ্টদের রক্ত পিপাসায় ছুটাছুটি করে বেড়িয়েছেন আজ তাঁরই সাথে হাত মেলানো—কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত জনসাধারণ একে নির্বিচারে মেনে নিতে পারে নি। তাই, কমিউনিষ্টদের ঘরে-বাইরে সর্বত্রই এক কঠোর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে এই United Front গড়ার কাজে। যদিও কমিউনিষ্টদের অপূর্ব নেতৃত্ব-প্রভাব এবং জনগণের অভূতপূর্ব কমিউনিষ্ট-নিষ্ঠা এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে-ছিলো, তবুও পূর্ব সংস্কারের দৌরাত্ম্য তাদের মন থেকে একেবারে মুছে যেতে পারে নি—কেননা সে সংস্কারের পেছনে ছিলো আগুন আর খুনের এক নির্মম ইতিহাস। এই সংস্কারের অস্তিত্বই দেখতে পেয়েছিলেন নিম্ ওয়েল্স্। কুয়োমিনটাং-কমিউনিষ্ট আপোষ সর্তানুযায়ী সোভিয়েটের স্বেচ্ছাকৃত বিলুপ্তির দিনে নিম্-ওয়েলস্ সোভিয়েট-চীনে ছিলেন। তিনি সোভিয়েটের রূপান্তরের যে সুন্দর একটা ছবি ফুটিয়েছেন, পাঠকের সামনে সেটা হাজির করার লোভ সামলাতে পারলাম না: Through a small hole in the paper window at which I occasionlly watch life in the courtyard, I can see my bodyguard from the OIPU fingering his new Kuomintung cap in gingerly fashion rubbing the bourgeois blue-and-white enamel symbol. No doubt he is thinking of the tattered old cloth Red Star that he wore from Kiangsi on the Long

March and resewed with his own loving fingers when it became unrecognizable. But the Red Star is no longer visible on the once-Soviet horizon. Even Chu Teh wears a Kuomintung cap. The whole Chinese Red Army is now clothed in regulation Kuomintung uniforms supplied by Nanking. It has not even a name, but only a number like all other armies under the Central Government ; it is the Eighth Route Army of the National Revolutionary Armies of China.

এর মোটামুটি অর্থ—কাগজের জানলার ছোট্ট ফুটোর ভেতর দিয়ে (যার ভেতর দিয়ে আমি প্রাঙ্গনের জীবনযাত্রা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে থাকি)। আমি আমার 'ও জি পি ইউ' এর (সোভিয়েট চীনের গুপ্তচর বিভাগ) দেহরক্ষীকে দেখতে পাচ্ছি। সে তার নতুন কুয়োমিন্‌টাং ক্যাপটাকে আশঙ্কিতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলো—সাথে সাথে নীল-সাদা-রংএর এনামেলের বুর্জোয়া প্রতীকটির গায়ে হাত রগড়াচ্ছিলো। নিঃসন্দেহে সে সেই ন্যাকড়ার তৈরী পুরোনো জরাজীর্ণ রেড্‌ ষ্টারটির কথা ভাবছে—কিয়াংসি থেকে লং মার্চের সময় যা সে পরেছিলো এবং মাঝে মাঝে তার সুন্দর আঙুল দিয়ে সেলাই করে যাকে সে কোনরকমে চিনবার অবস্থায় রেখেছিলো। কিন্তু সেই একদা সোভিয়েটের দিক্‌চক্রবালে রেড্‌ ষ্টার আর দেখা যায় না। চু-তে পর্যন্ত কুয়োমিনটাং ক্যাপ মাথায় পরেছে। গোটা চীনালাল-পল্টন নানকিংএর দেওয়া ইউনিফর্মে আজ সজ্জিত। লালপল্টনের নাম পর্যন্ত (আজ) নেই—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একটি সংখ্যা মাত্রে সে পরিণত হয়েছে। জাতীয় বিপ্লবী সেনাদলে সে অষ্টম রুট আর্মি নামে গণ্য হয়েছে।

এইভাবে সোভিয়েট চীন শুধু কুয়োমিনটাং ক্যাপ, ড্রেস আর ব্যাজই গ্রহণ করে নি—তার গণতান্ত্রিক নিষ্ঠায় তার চেয়েও সুস্পষ্ট সাক্ষী হয়ে আছে 'নিউবর্ডার রিজিয়্যান্' (সোভিয়েট নামের আধুনিক সংস্করণ)। এর সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সময় নিম্ ওয়েল্‌স্ হাজির ছিলেন—তাই তার অকৃত্রিমতায় তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে ফিরে-ছিলেন—নইলে, একটু দুঃখমিশ্রিত স্বরে, তিনি লিখিতেন না—"the last of the Chinese Soviets will have abdicated and the one-time-Soviet-Republic of China will be rather undramatically called 'The Frontier Districts of Shensi, Kansu and Ninghasia". অর্থাৎ, শেষ চীনা সোভিয়েট লোপ পাবে এবং এককালীন সোভিয়েট রিপাবলিককে অনাটকীয় ভাবে বলা হবে 'শেনসী, কান্‌সু এবং নিংয়াসিয়া-প্রান্তিক জেলা'।

কুয়োমিন্‌টাং বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ক্রমে জাপ-বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ নেয়—এড্‌গার স্নো তার সাক্ষী হয়ে আছেন। এইভাবে একটা আমূল পরিবর্তন এই এলাকায় দ্রুত ঘটে যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে অনেক জমিদার-মহাজন আবার ফিরে আসেন। পূর্বেকার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করার নীতির স্থানে জমির সমীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়। Liquidation of Capitalএর জায়গায় Control of Capitalএর নীতি গ্রহণ করা হয়। অবশ্য Capital অথবা মূলধন যাতে জনসাধারণের আর্থিক সঙ্গতির কোন ক্ষতি করতে না পারে মূলধনের ওপর সেই রকম কর্তৃত্বরাখাই এর উদ্দেশ্য।

শ্রেণী-উচ্ছেদের স্থানে সর্বশ্রেণীর স্বার্থ-পরিপোষণই প্রতিরোধ নীতির মূল কথা। পারস্পরিক স্বার্থ এবং দায়িত্ব রক্ষা এবং পালনের ভিত্তিতে এই নীতি পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে। তাই, একদিকে

খাজনা-ট্যাক্স কমান যেমন কৃষকের স্বার্থ তেমনি জমিদারেরও দায়িত্ব। আবার ট্যাক্স-খাজনা দেওয়াটাও সেই কৃষকের দায়িত্ব এবং জমিদারের স্বার্থ। কমিউনিষ্টরা একদিকে কৃষককে তার দায়িত্ব পালনে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছে—জমিদারকেও তার দায়িত্ব প্রতিপালনে সজাগ করেছে। এইভাবে উৎপাদনও এদের এলাকায় যথেষ্ট বেড়েছে। কলকারখানার ক্ষেত্রেও ওই একই নীতি। দেশরক্ষার দিক দিয়ে মজুর এবং মালিক উভয়েরই দায়িত্ব আছে। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যেমন মজুরের দেশপ্রেম জাগিয়ে তাকে উৎপাদন বাড়াতে প্রবুদ্ধ করেছে—তেমনি মজুরের মজুরী। শ্রমসময় এবং অন্যান্য শ্রমিক-কল্যাণ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য মালিকের দায়িত্ববোধও জাগান হয়েছে।

এইভাবে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার যেমন বজায় আছে তেমনি সেই অধিকার যাতে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হতে পারে তারও ব্যবস্থা আছে—কেননা, জনগণই এই প্রতিরোধের মূলশক্তি। তাকে দুর্বল করার অর্থ সমস্ত দেশরক্ষাকেই পঙ্গু করা। সেইজন্যই 'Control over production'—উৎপাদনের ওপর খবরদারী—এবং 'Equalisation of land'—জমীর সমীকরণ আজকের কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি—এই নীতি অনুযায়ী জমিদার-মহাজন-মালিক সবারই প্রতিরোধ ব্যবস্থায় স্থান আছে—কিন্তু সে স্থান সবাইকে ছাড়িয়ে নয়। অবশ্য, এই জমিদার প্রভৃতিদের জনসাধারণ সাধারণতঃ সুনজরে দেখে না। কিন্তু, জনপ্রিয় সংস্কৃতিবান জমিদার বা মালিক যে শাসনতন্ত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে তার প্রমাণ—(১) শিউ-ফ্যান্-টং—টাং সেং লুইএর (একটা জাতীয় রাজনৈতিক দল) একজন পুরোণো সভ্য। ইতি বর্তমানে শেনসী প্রদেশের শাসনবিভাগের প্রধান কর্তা। (২) ইয়াং-সিউ-ফেঙ্গ—ভূতপূর্ব খ্যাতনামা ইউনিভার্সিটি প্রফেসার।

বর্তমানে শানসী-শানটুং-হোপেই-হোনান প্রান্তিক প্রদেশের চেয়ারম্যান। (৩) সুং-শাও-ওয়েন—শানসী-হোপেই-চাহার প্রান্তিক প্রদেশের প্রধান কর্তা। কুয়োমিনটাংএর ইনি একজন সদস্য।

এথেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে জমিদার বা মালিক হলেই সে এইসব বিশেষ এলাকায় অপাংক্তেয় নয়। বরং কায়েমী স্বত্ব উপযুক্ত জনপ্রিয়তার শক্তিতে কোন কোন স্থানে বিশিষ্ট মর্যাদায় আসীন। অবশ্য, আমলাতান্ত্রিক রাজত্ব এখানে চলতে পারে না—কেননা, জনসাধারণের সত্যকার গণতন্ত্র এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের গণতন্ত্রের মত এখানকার ভোটাধিকার শুধু অধিকার হিসেবেই গণ্য হয় না—অথবা পণ্যের মত সর্বোচ্চ ক্রেতার কাছে নির্বিচার বিক্রয়ের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। শতকরা আশীজন ভোটার নির্বাচনে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়। এ থেকেই বোঝা যাবে, এরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কতটা সজাগ। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির প্রশ্রয় পাওয়ার মত কোন সুযোগ এখানে নাই—কেননা, জনসাধারণ এখানে জীয়নকাঠির স্পর্শে সদাই সজাগ। রাজনৈতিক মতামত প্রচারের অধিকার, একমাত্র দেশদ্রোহী ছাড়া, সবারই আছে—যে কোন দল, দেশদ্রোহী দল ছাড়া, এখানে আইনসঙ্গত। এখানে কুয়োমিনটাং আছে, ন্যাশন্যাল স্যাল্‌ভেশান এসোসিয়েশান, Sacrifice League, League and Educatiou Group, Communist Party, শ্রমিক সংঘ, কৃষক সমিতি—সবই পাশাপাশি এক নিবিড় ঐক্যসূত্রে প্রতিষ্ঠিত। এখানে সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি বলে গণ্য করা হয় না। তাই Pillars of the Sacred Right of Private Propertyই শাসনতন্ত্রের একচেটিয়া মালিক নন—অগণিত জনসাধারণ সেই শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র অন্যান্য আমলতান্ত্রিক

দেশের মত ব্যয়বহুল নয়—'Simplicity and Efficiency'—সরলতা এবং যোগ্যতা—শাসনতন্ত্রের এই-ই আদর্শ। কর্মচারীদের মাইনে এখানে অতি সামান্য—মাও-সে-তুং এর মাইনের কথা এর আগেই বলা হয়েছে—এ থেকেই আন্দাজ করা চলবে। অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেও কাজ করে থাকেন। যোগ্যতার কারণও এরই মধ্যে নিহিত।

এই বিশেষ এলাকায় খাজনার হার ফসলের শতকরা সাইত্রিশ ভাগ—ফসলেই তা দিতে হয়। কৃষক সমিতির সামনেই এই খাজনার চুক্তি হয়। আইন করে সর্বোচ্চ মজুরীর হারও বেঁধে দেওয়া আছে এবং সেটা ফসলের মারফৎই শোধ করা হয়। মজুরী ও খাজনা—এ দুইই ফসলের মারফৎ দেবার ব্যবস্থা না থাকায় কুয়োমিনটাং চীনে এই inflation এর নমুনা কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একবার বের হয়। তাতে জানা যায় যে, একটা টুপির দাম সেখানে ২৫০৲ টাকা—একটা সিগারেট প্রায় ৫০৲ টাকা দামে বিক্রী হয় (দামটা ঠিক মনে না থাকলেও আনুমানিক ঐরকম)। Inflation এর দৌরাত্ম্যে জীবনধারণ যে অসহ্যের সীমায় পৌছেচে—তার নমুনা আমরা পাই ওয়েণ্ডেল উইল্কীর 'One World' নামক বইএর এক জায়গায়। চুংকিংএর পথে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এগারো মাইল ব্যাপী নিরন্ন-ছিন্নবাস চৈনিক নরনারীর দীর্ঘ জমায়েৎ শুধু একটা আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত করছিলো,—আমেরিকার সাহায্যই সেই আকাঙ্ক্ষার মূল কথা। উইল্কীর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে সেই সম্ভাবনাই জাগিয়ে তুলেছিলো বলে এই অভূতপূর্ব গণসমাবেশের সৃষ্টি।

অথচ, তারই পাশে কমিউনিষ্টদের বিশেষ এলাকায় উপরোক্ত ব্যবস্থা থাকায় inflation এর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে নি। Inflation এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চোরাবাজারের অবাধ রাজত্ব কুয়োমিনটাং চীনের

জীবনযাত্রাকে অচল ক'রে তুলেছে। সেদিন এক আন্তর্জাতিক চোরাবাজারী ষড়যন্ত্র (চীনের বুকে) ধরা পড়েছে—এর মধ্যে সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত জড়িত আছেন। এই চোরাবাজার জাপানী এলাকার সাথেও নিজেদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখেছে—ফলে, চুংকিংএর রাজনীতিতে এই চোরাবাজারী দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সত্যকার গণতন্ত্রের মধ্যে চোরাবাজারের স্থান নেই। তাই, টিটোর যুগোশ্লোভিয়ায় চোরাবাজারের রাজত্ব যেমন শেষ হয়েছে, রুশিয়াতে এর অস্তিত্বের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না—তেমনি, কমিউনিষ্টদের এই বিশেষ এলাকাতে চোরাবাজারের অস্তিত্ব নেই। তাই, তার প্রতিরোধেও কোন দুর্বলতা ফুটে উঠতে পারে নি। চুংকিংএর শাসন পরিষদের বহু পদস্থ কর্মচারীও আজ এই চোরা-বাজারের অদৃশ্য জালের অংশীদার—তাই, সেই জাল কেটেই শত্রু তার পথ করে নিচ্ছে। অথচ, তারই পাশে ওই বিশেষ এলাকার দুর্জয় প্রতিরোধ আজ সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে যে কুয়োমিনটাং সান্ মিন্ চিউকে তার আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে—চীনের কমিউনিজম্এরও সেই আদর্শ। কমিউনিজম্এর সাথে সান্ মিন্ চিউ নীতির কোন বিরোধ নেই—বরং উভয়েই উভয়ের অবলম্বন। সান্ ইয়াৎ সেন্ একদিন বলেছিলেন, "Communism is a good friend of the Three Principles—" কমিউনিজম্ তিন নীতির খাঁটি বন্ধু।

কমিউনিষ্টদের এলাকায় কিরকম খাঁটি গণতন্ত্র চালু হয়েছে এবং তার প্রভাব কত শক্তিশালী সে সম্বন্ধে 'পিপল্স্ ওয়ার', পত্রিকার চীনস্থিত সংবাদদাতার প্রেরিত একটা গল্পের উল্লেখ না করে পারলাম না। একদিন চীনের একটা গ্রাম জাপানী সৈন্তরা দখল ক'রে সেখানকার

গ্রাম্য পরিষদের চেয়ারম্যান্‌কে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে। কিছুতেই বের করতে না পেরে শেষে তারা কয়েকজন যুবককে হত্যা করে।

হঠাৎ লাইনের মধ্য থেকে একজন যুবক বলে ওঠে, "I am the chairman—I am the chairman" (আমিই চেয়ারম্যান্)। শেষে, সবাই চীৎকার করতে থাকে, "I am the chairman—I am the chairman. —I am the chairman." এরা জঙ্গল থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যকার চেয়ারম্যানকে খুঁজে বের করে তাকে ধরে নিয়ে যায়। রাত্রে গ্রামের লোকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মুক্তি পেয়ে চেয়ারম্যান্ আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, 'Democracy has saved me.' 'গণতন্ত্রই আমাকে বাঁচিয়েছে'। এরকম ধরণের অনেক গল্প আছে।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, কমিউনিষ্টরা যদি সত্য সত্যই গণতন্ত্র সৃষ্টি করে থাকে তবে চীনের বুকে ওই ভাবে partition তুলে এক বিশেষ সীমান্ত সৃষ্টি করার অর্থ কি? এর উত্তরও কমিউনিষ্ট নেতারা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এই সীমান্ত সৃষ্টির পূর্ণ দায়িত্ব চুংকিং চীনের। সেই দায়িত্বগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি। পাঠক সমস্ত ঘটনার আলোকে বিচার করুন কার এই দায়িত্ব—কমিউনিষ্ট চীনের অথবা ভূতপূর্ব নানকিং এবং বর্তমান চুংকিং চীনের।

১৯৩৭ এর আপোষের পর চীনের জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়। এই সাড়ার কারণ, এই সময় চীনা-জনসাধারণ ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক অধিকারের দিকে এগিয়ে চলে। হ্যাঙ্কোএর পতনের আগ পর্যন্ত যেভাবে চীনের ইতিহাস এগিয়ে চলেছিলো আজ পর্যন্ত তার গতি অব্যাহত থাকলে পৃথিবীর ইতিহাসই বদলে যেতো। কিন্তু, ইতিহাসের পথ অত মসৃণ নয়। তার

উংরাই যেমন আছে—চড়াইও তেমনি আছে। ১৯৩৮এর শেষে হ্যাঙ্কৌএর পতনের পরে কায়েমী স্বার্থ-সর্বস্ব ব্যক্তিরা তাঁদের সংযমের বাঁধকে আর অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেন না। দিগন্তের কোণে আবার লাল-আতঙ্ক জেগে উঠলো। United Frontএর প্রাচীরে প্রথম ফাটল ধরলো। জাপমুখী জেনারেল হো-ইং-চিন্ বেয়নটের ফলককে পেছনে ফিরিয়ে ধরলেন।

এর পর থেকেই সুপরিকল্পিত গতিতে ওই প্রতিক্রিয়ার মরা জোয়ার এগিয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগলো। ১৯৪১এর জানুয়ারী মাস। কমিউনিষ্টদের নতুন-গড়া New Forth Army—অতুলনীয় সাহস এবং কৌশলে যে চীনের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রেখেছে এবং সারা পৃথিবী যার দুর্দমনীয় প্রতিরোধের সাক্ষী—সেই আর্মিরই একাংশকে কেন্দ্রীয় সরকারের ফৌজ নির্মমভাবে হত্যা করে। জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইএর এ এক চমৎকার (!) অনৈতিহাসিক দৃষ্টান্ত! ঘটনাটা এই রকম। ১৯৪০এর ১৯শে অক্টোবর। কেন্দ্রীয় ফৌজের সেনাপতিদের কাছ থেকে নির্দেশ আসে, পীত নদীর দক্ষিণে অবস্থিত গোটা অষ্টম রুট আর্মি এবং নিউ ফোর্থ আর্মিকে একমাসের মধ্যে নদীর উত্তর তীরে নিয়ে আসতে হবে। কমিউনিষ্টদের তরফ থেকে উত্তর দেওয়া হয়, দক্ষিণ আনহোয়ে প্রদেশের সৈন্যদের নির্দেশ অনুযায়ী সরানো হবে—কিন্তু, অন্যান্য সৈন্যদের সরানো সম্ভব হবে না—কেননা, পীত নদীর উত্তর তীরে তাদের সৈন্যরা তখন জাপ-শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। বলা হয় যে, যুদ্ধটা শেষ হবার সাথে সাথেই নির্দেশিত স্থানে উপরোক্ত আর্মি দুটোকে সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু, ১৯৪১এর ৫ই জানুয়ারী যখন দক্ষিণ আনহোয়ে সৈন্যদলের নয় হাজার সৈন্য উত্তর দিকে চলতে থাকে, তখন চিয়াং তাদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ

করার আদেশ দেন। ৬ই জানুয়ারী থেকে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত স্থায়ী এই গৃহযুদ্ধে নিউ ফোর্থ আর্মির একাংশকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়। এর পরই চিয়াং ১৭ই জানুয়ারী এক ফতোয়া জারী করে নিউ ফোর্থ আর্মিকে ভেঙ্গে দেন এবং সেনাপতি ইয়েটিংকে বিচারের জন্য পাঠান হয়। এর পর থেকে উত্তর এবং মধ্য চীনের সমস্ত জাপবিরোধী ঘাঁটিতে কমিউনিষ্ট সেনাদলের ওপর নির্মম একং একটানা আক্রমণ চলতে থাকে।

এর আগেও ১৯৩৯ এর শীতকালে এবং ১৯৪০এর বসন্তকালে এই রকম সঙ্কট একবার দেখা দেয়। এই সময় কুয়োমিনটাং সেনা শেনসী-কানসু-নিংঘাসিয়া প্রান্তিক প্রদেশের (অষ্টম রুট আর্মির ঘাঁটি) পাঁচটি বড় বড় সহর—সুন-হুয়া, সুন্-ই, চিং-নিং, নিং-সিইয়েন, চেন্-ইয়েন্—দখল করে নেয়। জাপ-বিরোধী প্রচণ্ডতম ঘাঁটিকে জাপবিরোধী সেনারাই দখল করে নিচ্ছে—এটা নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই শোনায় না কি!

তৃতীয় সঙ্কট ঘটে ১৯৪৩এর গ্রীষ্মকালে—যখন কেন্দ্রীয় ফৌজ পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে কমিউনিষ্টদের বিশেষ এলাকার ওপর ঝটিকা আক্রমণ সুরু করে দেয়। আজ যখন কেন্দ্রীয় ফৌজের প্রতিরোধ বহুস্থানে স্তব্ধ এবং শিথিল হয়ে আছে তখনও চিয়াংএর পাঁচ লাখ সুশিক্ষিত অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য এই বিশেষ এলাকার চারিদিকে বজ্রবেষ্টনী সৃষ্টি করে ঘিরে রয়েছে।

কুয়োমিনটাং যখন ফাসিষ্ট কৌশল অবলম্বন করে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে চলেছে, তখন জাপান সেই কৌশলেরই ছায়ায় একের পর আর এলাকা দখল করে চলেছে। কুয়োমিনটাং নীতির দুর্বলতার ফাটল দিয়ে বহু সৈন্য দলত্যাগ করে জাপানীদের দলে গিয়ে যোগ দিচ্ছে—অথচ, কমিউনিষ্টদের সম্বন্ধে এত হিসেবী যাঁরা,

তাঁরা কিন্তু সেই সমস্ত বিশ্বাসঘাতক দলত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও পর্যন্ত করছেন না। কুয়োমিনটাং সেণ্ট্রাল এক্‌জিকিউটিভের কুড়ি জন্ সদস্য দলত্যাগ করেছেন এপর্যন্ত—তাঁদের দলে আটান্ন জন কুয়োমিনটাং জেনারেলও আছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় দলত্যাগী সৈন্যদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অথচ, কমিউনিষ্টরাই নাকি চীনের প্রতিরোধের শত্রু—তাদের দলকে বলা হয় বিশ্বাসঘাতক দল, তাদের সৈন্য বিশ্বাসঘাতক সৈন্য।

জাপানী সৈন্যের শতকরা আটান্নজন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত আছে—আর, অবশিষ্ট বিয়াল্লিশ জন কুয়োমিনটাং এলাকায় পাহারাদারী হিসেবে রয়েছে মাত্র। অর্ধেকের বেশী জাপানী সৈন্যকেই নিযুক্ত রেখেছে অধিকৃত এলাকায় চীনা গেরিলাবাহিনী—অথচ, এরা কোন সাহায্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পায় না। অষ্টম রুট আর্মি এবং নিউ ফোর্থ আর্মিরও ওই একই অবস্থা। যারা সমস্ত রকম সাহায্য পায়, তারা কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধেই লড়ে—অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য সংগ্রাম কমিউনিষ্টদেরই বিরুদ্ধে—আর গৌণ সংগ্রামের অভিনয় মাত্র বজায় আছে সত্যকার শত্রুর বিরুদ্ধে। শুনলে অবাকই লাগে, কমিউনিষ্ট-কুয়োমিনটাং আপোষের পরেও হাজার হাজার কমিউনিষ্ট যুবককে হত্যা করা হয়েছে। অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে—জেল, ফাঁসির তো কথাই নাই। নিউ ফোর্থ আর্মির ভাইস্ কম্যাণ্ডার হ্যান্-ইং তাদের মধ্যে অন্যতম। এদের অপরাধ, এরা দস্যু জাপানীর বিরুদ্ধে চীনা নরনারীর স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে তাদের অপরাজেয় করে তোলে। এদের দুর্বলতা, এরা আজও ওই সমস্ত চোরাবাজারী বিশ্বাসঘাতক শত্রু-দালালকে ইউনাইটেড ফ্রণ্ট থেকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

আরও বিস্ময়ের বিষয়, জাপানীদের সাথে কুয়োমিনটাংএর কুচক্রীদের বেশ কতগুলো বিষয়ে মিল আছে। কমিউনিজম্এর বিরুদ্ধে জেহাদ তুই পক্ষেরই মূল লক্ষ্য—কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই দুয়েরই প্রধান কর্মতালিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপানীদের আগে আওয়াজ ছিলো, 'Down with the Communists', কমিউনিষ্টরা নিপাত যাক্— 'Down with the Kuomintung' কুয়োমিনটাং ধ্বংস হোক— কিন্তু, শেষের আওয়াজ এখন সে বন্ধ করেছে। কুয়োমিনটাং সম্বন্ধে শত্রুর দুর্বলতা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই, দেখতে পাই, শতকরা যে বিয়াল্লিশজন জাপানী সৈন্য কুয়োমিনটাং এলাকায় শুধু পাহারা দিয়ে বেড়াতো, সেই পাহারা দেবার প্রয়োজনও তারা আর বোধ করে না—তাই দেখতে পাওয়া গেলো হঠাৎ চেকিয়াং এবং হুপেই প্রদেশ থেকে তারা আরও কিছু সৈন্য উঠিয়ে নিয়ে গেলো। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, লোভ দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করান। অথচ, এ লোভ তারা কমিউনিষ্টদের এলাকায় একদিনও দেখায় নি।

মিত্রপক্ষের সাথে জাপানের যুদ্ধ বাধার পর থেকে কুয়োমিনটাং-এর যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হতে থাকে। 'যাক শত্রু পরে পরে'—এই নীতির লোভে পড়ে কুয়োমিনটাংএর প্রতিক্রিয়াশীল অংশ ঠিক করলেন, মিত্রপক্ষই তাঁদের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করবে— অতএব, তাঁরা নিজেদের শক্তিকে কমিউনিষ্ট নিপাতের কাজে সজ্জিত করতে উদ্যোগী হলেন। এরই পরিণতি হলো ১৯৪৩ এর ব্লীৎস্ ক্রিগ— বিশেষ এলাকার ওপর।

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের সময় এই কুচক্রীর দল আশা করেছিলো, জাপান অনিবার্যভাবে রুশিয়াকে আক্রমণ করবে। তার বাড়তি সুযোগ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় ফৌজকে কয়েকটি এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো।

এরই জন্যে এই মীরজাফরের দল ইউরোপের সেকেণ্ড ফ্রন্ট খোলারও বিরোধী ছিলো। বিরোধী ছিলো এইজন্যে যে সেকেণ্ড ফ্রন্ট না খোলা হলে রুশিয়া দুর্বল হবে এবং দুর্বল রুশিয়াকে জাপান আক্রমণ করবে সহজেই। ফলে, এই পারস্পরিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে একদিকে দুনিয়ার লাল আতঙ্কের উচ্ছেদ ঘটবে, অন্যদিকে পীতাতঙ্কও হ্রাস পেয়ে কুয়োমিনটাংএর কায়েমী স্বত্বওয়ালাদের রাজত্ব কায়েমী হয়ে উঠবে। কিন্তু, সে আশা যে পূর্ণ হয় নি—পরবর্তী ইতিহাসই তার সাক্ষী। সে আশা যে দুরাশা রুশিয়ার জনগণের সাথে চীনের জনগণ তা প্রমাণ করেছে। সে আশার রঙীন ফানুসে চড়ে কোন্ নিঃসীমতার শূন্য পথে যে এঁদের অভিযাত্রা শেষ হবে তার সন্ধান এঁরা আজও রাখেন না।

এঁদের এই দেউলিয়াপনা দেখেই জাপ তাঁবেদার ওয়াং-চিং-ওয়েই (তাঁবেদারীর দায়িত্ব থেকে ইনি আজ মুক্ত—যেহেতু তিনি আজ মৃত) নির্লজ্জের দল ভারী করার আশায় ভরসা-ব্যাকুল কণ্ঠে এদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন :—

"Dear brothers are after all dear brothers, Chungking shall go the same road in the future as we did, but we hope that the time can be shortened as much as possible."
—Oct. 1st.-Domei.

এর মোটামুটি অর্থ— হাজার হলেও ভাই ভাইই। আমরা যে পথে এসেছি চুংকিংকেও ভবিষ্যতে সেই পথেই আসতে হবে। কিন্তু, আমাদের আশা, যতদূর সম্ভব সময়কে সংক্ষিপ্ত করা চলতে পারে।" খবরটা ডোমেই এজেন্সীর।

জাপ রেডিও-ও এই দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে দিনের পর দিন

আঁপোষের সর্ত উঠিয়ে এসেছে। তাতে বিভিন্ন ধরণের সর্তের উল্লেখ ছিলো। কিন্তু, জাগ্রত জনগণ সে পথের কাঁটা।

ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সামনে যে সমস্ত গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা ছিলো—যার সুষ্ঠু সমাধানের ওপর সামরিক সাফল্য নির্ভর করে—কুয়োমিনটাং তার মীমাংসা করেনি। একের পর আর ওজর তুলে সে সমস্যাকে চাপা দিয়ে রেখেছে।

প্রথমত, বর্তমান কুয়োমিনটাং নিজেই বহু পুরোণো সদস্য নিয়ে গঠিত। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে কুয়োমিনটাং-এর নির্বাচন হয়নি। ফলে, গৃহযুদ্ধ যুগের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই একে নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে—যুদ্ধের ভিতর দিয়ে চীনের ইতিহাসের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার কোন ছাপ কুয়োমিনটাংএ পড়েনি। তারই পরিণতিস্বরূপ যুদ্ধের নতুন নতুন সমস্যাকে মীমাংসা করতে পারেনি এরা। এদের মানসিক স্তরে আজও কমিউনিষ্ট জুজুই দানা বেঁধে আছে—জাপান সেখানে বড় একটা সমস্যা নয়।

দ্বিতীয়ত, সামরিক কাজে ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং সহযোগিতার জন্য যে জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তোলা হয়, তাকে পিছাতে পিছাতে নাকচ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, পিপল্‌স্ ন্যাশনাল্ কংগ্রেস মারফৎ নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করার কথা ১৯৩৭এর নভেম্বর মাসে—অথচ শেষে বলা হয়, যুদ্ধের পরেই ওটা হবে। অবশ্য, চিয়াং সেদিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুদ্ধের অবস্থা একটু আয়ত্তে এলেই নতুন নির্বাচন করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু, যুদ্ধের অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য যে তার প্রধান বাধা দূর করা দরকার সে প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়ে দিলে ঘোড়ার গাড়ী এগোয় না কোনদিনই। ষ্টীম না দিয়ে রেলইঞ্জিন চলে না।

তেমনি প্রতিরোধও সেই রেলইঞ্জিনের মতই—এর ষ্টীম হচ্ছে জনগণ—জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ, পিপল্স্ ন্যাশনাল কংগ্রেস মারফৎ সেই ষ্টীম কার্যকরী হতে পারত। কিন্তু, wishful thinking এর thinker যাঁরা, তাঁরা চিরকালই গাড়ীকে ঘোড়ার আগেই দেখে থাকেন।

এই উল্টো চিন্তার ফলেই জনগণের দেশপ্রেম না জাগিয়ে তাঁরা জনগণের আতঙ্ক সৃষ্টি করেই যুদ্ধজয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তাই দেখা যায় গ্রেপ্তার জরিমানা প্রভৃতির ভয় দেখিয়ে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে—রাজনৈতিক শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই। সভা সমিতি করার কোন অধিকার নাই—খবরের কাগজে দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিলেও (সম্প্রতি সেরকম একটা ঘটনা ঘটেছে) সেটা রাজনৈতিক অপরাধের মধ্যে গণ্য হয়। সারা দেশে পুলিশ আর গুপ্তচরের অবাধ রাজত্ব বিস্তার ক'রে এরা ফাসিষ্ট নীতি দ্বারাই ফাসিষ্ট শক্তিকে পরাস্ত করার স্বপ্ন দেখেছেন। জনগণের সহযোগিতা তো দূরের কথা, জনগণকে শত্রু করে তোলাই যাঁদের কাম্য, জনযুদ্ধের সঙ্কটময় মুহূর্তে কোন্ ভূমিকা তাঁরা গ্রহণ করবেন সেটা জলের মতই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কুয়োমিনটাংএর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সমষ্টিগত এবং চরম প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪৩এর গোড়ার দিকে প্রকাশিত 'China's Destiny' নামক বইএ। এক কথায় একে চীনা ফাসিষ্ট দর্শনের ভ্রূণ বলা যেতে পারে—যদিও চীনা ফ্যাসিজম্এর সামাজিক কোন ভিত্তি গড়ে উঠবার অবস্থা আজও হয় নি। বইখানি—অন্তত লোকচোখে চিয়াংএর লেখা বলেই প্রমাণিত; কিন্তু, শোনা যায়, অলক্ষ্যে কালিকলমের শ্রাদ্ধ করেছেন আর একজন—তাঁর নাম Tas-Hsi-Sheng। নানকিং বিশ্বাস-ঘাতকদের সাথে এঁর যোগাযোগ, এঁর ফ্যাসিষ্ট প্রীতি, সর্বশেষে মিত্রপক্ষের প্রতি এঁর বিরুদ্ধ মনোভাব, কুখ্যাতি লাভ করেছে অনেককাল।

এদিক দিয়েও হিটলারের 'মাইন্ ক্যাম্ফ' এর সাথে এর একটু সাদৃশ্য আছে। শোনা যায়, 'মাইন্ ক্যাম্ফ' নাকি হিটলারের নিজের লেখা নয়।

যাক্, চিয়াংএর নিজের লেখা না হলেও এই সাংঘাতিক ফাসিষ্ট দর্শনে যে তাঁর প্রত্যক্ষ সহানুভূতি এবং সম্মতি আছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা না হলে বইটা বের হবার সাথে সাথেই বাজেয়াপ্ত বইএর তালিকায় তাকে দেখতে পেতাম। তা তো হয়ই নি—বরং চীনা বালক এবং যুবকদের বইটাকে বাইবেলের মত করে পড়তে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এর মারাত্মক দিকগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যক্।

প্রথমেই বলা দরকার দু'শো তেরো পৃষ্ঠা নিয়ে তৈরী বইটার মধ্যে মাত্র সাড়ে বারো পৃষ্ঠায় চীনের জাপবিরোধী যুদ্ধসমস্যা নিয়ে আলোচনা আছে। আর বাকী অংশটা কমিউনিষ্টদের এবং সমস্তরকম উদারমতবাদকে তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। অর্থাৎ, চীনের সমস্যা ততটা জাপানকে নিয়ে নয়—যতটা কমিউনিষ্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ভাবাপন্নদের নিয়ে। আমাদের দেশের পটভূমিকায় ব্যাপারটাকে ঠিক এইভাবে খাড়া করা যেতে পারে। আমাদের দেশের মূল সমস্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী, বৈদেশিক শাসন এবং দেশরক্ষার সমস্যাকে এড়িয়ে কোন রাজনৈতিক শীর্ষস্থানীয় নেতা যদি সিনেমা-রেডিও-কলকারখানা ইত্যাদি যা কিছু বৈদেশিক সব কিছুকে গালাগালি করে একখানা বই লেখেন, তাতে ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়ায়, এটাও অনেকটা ঠিক তাই। জাপানী আক্রমণে যখন চীনের সত্তর লক্ষ লোক (আগেকার হিসেবে) মাটির সাথে মিশে গেছে—অজস্র ছেলেমেয়ে রক্তাক্ত দেহে ছটফট করছে—শত শত স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি গুঁড়িয়ে গেছে—ছোট

ছোট বালককে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আফিং এবং হিরন্ (এও আফিং থেকে তৈরী এরকম তীব্র নেশা যা মানুষকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে দেয়) বিক্রীর বর্বর কাজে জোর করে নিয়োগ করেছে—ভোরের আকাশে যেখানে সাইরেনের ধ্বনি মৃত্যুর সঙ্কেত নিয়ে আসে—রাতের অলক্ষ্য আড়ালও যেখানে জাপানী বোমার হাত থেকে মায়ের বুকের ঘুমন্ত শিশুকে নিরাপদ করতে পারে না—এক মর্মভেদী হাহাকার তুলে হাজারে হাজারে কেড়ে নিয়ে যায়—জাপানী শেলের দুরন্ত আস্ফালনে যেখানে জীবন টাইফুনের সমুদ্রের মত অস্থির—জাপানী প্লেনের পাখার আড়ালে বসে যেখানে চোরাবাজারীর শোণিতোৎসব চলে রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত—সেখানে মায়াবাদীর নির্বিকার ঔদাস্যে এ সমস্ত প্রশ্নকে তুচ্ছ করে যাওয়ার একমাত্র অর্থ কি হতে পারে পাঠকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তিই তা ঠিক করুক।

এরপর আলোচনা করা হয়েছে জাতিগত সমস্যা নিয়ে। সান্ ইয়াৎ সেনের মন্ত্রশিষ্য রাজনীতি থেকে শেষে ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বললেন, চীনে একটামাত্র জাতিই আছে—সেটা হচ্ছে সুমহান চৈনিক জাতি। তাহলে চীনের তিব্বতী, পশ্চিমাগত মুসলমান জাতি, মিয়াও, ইয়াও, লোলো, ইস্ এবং অন্যান্য আরও অসংখ্য জাতি—এরা কারা? তাহলে কুয়োমিনটাং এর প্রথম কংগ্রেসের বিখ্যাত ঘোষণা (১৯১১)—"The right of self-determination of the various Nations within China is recognised..." চীনের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হচ্ছে—এর অর্থ কি দাঁড়ায়? এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে চীনের অন্যান্য জাতির ওপর চীনা ধনিক শ্রেণীর শোষণের অব্যাহত অধিকার? রোমক-গ্রীক রক্তের বিশুদ্ধতা থেকে আরম্ভ করে জার্মান আর্য জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা ও জাপানী রক্তের

পবিত্রতা পর্যন্ত এত বিশুদ্ধ রক্তের বাগাড়ম্বর আমরা ইতিহাসের মুখে শুনেছি যে, আজকাল ওই রক্ত-কৌলীন্যের মতবাদ শুনলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না—আবার কিছু সংখ্যক পশ্চাৎপদ জাতির রক্তমোক্ষণের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই রক্ত বিশুদ্ধতার ইতিহাসে ফ্যাসিষ্ট জার্মানীর রক্তাক্ত ইতিহাস আজও মানুষ সভয়ে স্মরণ করে। এই রক্তের বিশুদ্ধতার প্রয়াসে কত সহস্র মানুষের রক্ত যে ক্ষয় করা হয়েছে তার পরিমাণ নেই। 'China's Destiny'তে চিয়াংএরই সেই প্রয়াস সেই রক্তক্ষয়েরই ইঙ্গিত—তাই, এর মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধে চীনের জাগ্রত জনসাধারণ হুঁসিয়ার আছে বলেই বিশ্বাস।

এর পরে আর এক অনৈতিহাসিক রোগনিদানতত্ত্ব জাহির করা হয়েছে। চীনের বর্তমান দুঃখ কষ্টের মূল নাকি তার অতীতের 'Unequal Treaties' অর্থাৎ অসমান চুক্তি। এরকম একটা হাস্যকর যুক্তি চিয়াংএর মত একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিকের কাছ থেকে আশা করতে পারা যায়না। এও অনেকটা সেই ঘোড়ার আগে গাড়ীর মত উলটপুরাণ। অসমান চুক্তিই চীনের দুর্বলতার জন্য দায়ী না চীনের দুর্বলতাই তার অসমান চুক্তির জন্য দায়ী, চীনের ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য ধারণা থাকলেই এটা বোঝা যায়। চিয়াংএর কথাই যদি সত্য হয় তবে তাইপিং বিদ্রোহীরা অথবা কমিউনিষ্ট বিশেষ এলাকা কেন আজ পর্যন্ত একটা অসমান চুক্তিও করে নি—অথচ, মাঞ্চু চীন অথবা কুয়োমিনটাং চীনে সে ঘটনার আধিক্য কেন? পাশাপাশি এই দুই বিপরীত কাহিনী থেকে একটা জিনিস সুবোধ্য হয়ে ওঠে। গণশক্তির সামনে সাম্রাজ্যবাদ কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যেখানে স্বেচ্ছাতন্ত্রের জোঁয়ালের তলে গণজীবন পঙ্গু, সেখানেই সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্কতিলক একটা জাতির কপালে এঁটে বসে। এখানে ডাঃ সান্‌ইয়াতের একটা

কথা উল্লেখ করা চলতে পারে—"The former weakness and decline of China was due to the harsh oppressions of absolutism."—অর্থাৎ, চীনের অতীত দুর্বলতা এবং অধোগতির জন্য দায়ী স্বেচ্ছাতন্ত্রের নির্মম উৎপীড়ন। অথচ, সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের দিনটিকে চিয়াং 'Golden World' বলে বর্ণনা করেছেন—তার শত ত্রুটী স্বীকার করে নিয়েও—ফ্যাসিষ্টরা যেমন অতীতের বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে নিজেদের স্ফীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। ইতিহাসের এক মন্থর গতিপথে যার অবস্থান, অতীত চীনের সেই Pao-chia অর্থাৎ, গ্রাম্য-সমাজ-ব্যবস্থা (আমাদের প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমাজের মত) নাকি চীনের ইতিহাসের এক গৌরবময়, অধ্যায়। সেই কৃষিমূলক গ্রাম্য-সমাজ-ব্যবস্থা যদি অতই গৌরবময় তবে জাপান সেই ব্যবস্থাকেই কায়েমী করে রাখবার ব্যবস্থা করেছে কেন—তার অধিকৃত এলাকায়। সেটা যদি এতই আদর্শস্থানীয়, তবে জাপানী রেডিওতে প্রচার করে কেন—"An agricultural China and an industrial Japan"—অর্থাৎ, কৃষি-চীন এবং শিল্পপ্রধান জাপান! তবে কি সাম্রাজ্যলিপ্সু জাপান হঠাৎ এক শক্তিশালী চীনের অভ্যুদয় কামনা করতে আরম্ভ করেছে? এর উত্তরও চিয়াংই দিতে পারতেন! চিয়াং আর জাপান—আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত কি এক দৈব দুর্ঘটনায় একই আওয়াজের উদ্গাতা হয়ে পড়লেন—না, ইতিহাসের এক দুর্জয় তরঙ্গভঙ্গের মাঝখানে দুইজনেই পরিত্রাণের এক যোগসূত্র খুঁজছেন! চীন শুধু চীনই নয়—আধুনিক জগতের সঙ্কট-সমাকুল সমস্ত সমস্যাই এখানে এক দুরন্ত gulf-streamএর সৃষ্টি করেছে। না হলে বেলজিয়ামের পিয়ারলো, গ্রীসের প্লাষ্টিরাস যে অভিনয় করছেন—হাজার হাজার মাইল দূরে চীনের মাটিতেও সেই একই অভিনয় প্রত্যক্ষ করা

যাচ্ছে কেন—অবশ্য, চীনের অভিনয় ওদেরও আদিপর্ব। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির যোগসূত্রে, ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সংযোগে পৃথিবী আজ অখণ্ড। সেই অখণ্ডতার স্তরবিশেষে চীনও আজ আপন স্থান খুঁজে নিয়েছে। সে ধ্বনি হয়ে জীবনের গভীর সত্যের নির্দেশ দেবে—না শুধুমাত্র প্রতিধ্বনি হয়েই ভাঙা দেয়ালের ফাটলে-ফাটলে আর্তনাদ করে ফিরবে—চীনের গণশক্তিই তার উত্তর দেবে।

এরপর চিয়াংএর আক্রোশ গিয়ে পড়েছে সমস্ত রকম উদারনৈতিক মতবাদ এবং কমিউনিষ্ট মতবাদের ওপর—এরা নাকি সবই বিদেশী মাল। এই বিদেশী মালেই নাকি চীনের সর্বনাশ হয়েছে। একথা লেখার সময় চিয়াংএর হয়তো একটু আত্মভ্রান্তি ঘটেছিলো। না হলে তিনি দেখতে পেতেন, চীন বিপ্লবের আদি ঋষি সান্ ওই বিদেশী মতবাদ আমদানী করেই চীন বিপ্লবকে শক্তিশালী করেছেন। আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব তাঁর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছে, রুশ-বিপ্লব তাঁর জীবনদৃষ্টিকে সব চাইতে বেশী স্বচ্ছ করেছিলো। চীন বিপ্লব যদি শক্তিশালী হয়ে থাকে তবে এই বিদেশী মতবাদের কাছে তাকে ঋণ স্বীকার করতে হয়। সান্ইয়াতের মন্ত্রশিষ্য চিয়াং, যিনি গুরুর নামে আজও গর্ব বোধ করে থাকেন এবং যাঁর নীতি নাকি আজও তাঁর পথচলার ধ্রুবতারা—তিনিও এই ঋণে যথেষ্টভাবে ঋণী। মনের গভীরে এ সাক্ষী তাঁর জমা আছে নিঃসন্দেহে।

আসল কথা হচ্ছে—বিপ্লব কোনও দেশের একচেটিয়া সামগ্রী নয়—তাই, মতবাদও মজুত সোনার মত কারও সিন্দুকে জমা থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ এক স্তরে বিশেষ কোন দেশে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে—পাহাড়, সমুদ্রের দুর্লঙ্ঘ সীমান্ত তাকে অলঙ্ঘনীয় করে রাখতে পারেনা। মোঙ্গোলিয়ার

হলুদ সীমান্তও তার কাছে হার মানে—মেরুজীবনের গভীর রন্ধ্রে সে বাসা বাঁধে—তাকে অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই। যৌবনের মতই এর গতিবেগ অনিবার্য; কিন্তু অচেতন নয়—বরং চেতনার সর্বোচ্চ স্তরেই এর আবির্ভাব হয়। ইলেকট্রিক, গ্যাস, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন যদি স্থান কাল-পাত্রের ব্যারিকেডকে ডিঙিয়ে থাকে, তবে মতবাদও সেই বাধাকে অস্বীকার করেই এগিয়ে আসবে। চীন বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নেতা যেমন তাকে বিদেশী বলেই দূরে ঠেলে রাখেন নি—সেই বিপ্লবীর অনুগত শিষ্য বর্তমানে চীনা জাতির সর্বজনস্বীকৃত নেতা ইচ্ছা করলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। অবশ্য তিনি সেটা ঠেকিয়ে বিশেষ রাখেন নি বরং বহুবার তাঁকে বিদেশীদেরই দ্বারস্থ হতে হয়েছে। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযানের সময় একজন জার্মান সামরিক উপদেষ্টাই তাঁকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। আজও তাঁর শাসন পরিষদে এমন সভ্যের অভাব নেই যাঁরা আলোক প্রাপ্তির জন্য একবার মস্কো, আর একবার জার্মানী-জাপানে ছুটোছুটি করেছেন। চিয়াংএর বইখানাতেও যে সেই ধরণের আলোকের অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে এটা জোর করে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর বইখানার মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে 'one principle, one party, one leader'—ফুয়েরারী নীতির সাথে তার অসামঞ্জস্য নেই! তাই কমিউনিষ্ট পার্টির অস্তিত্ব তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই কমিণ্টার্ণ লোপ পাবার অজুহাত তুলে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির লোপ পাবার জন্য চাপ দেন। কমিউনিষ্ট পার্টি ভেতর থেকে ভেঙে দেবার জন্য গুপ্তচর ঢোকাবার প্রয়াস পান। কিন্তু কমিণ্টার্ণএর যবনিকাপাত হলেও যে কমিউনিষ্ট পার্টি লোপ পেতে পারে না এটা তিনি ইচ্ছা করেই বুঝতে চান না। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি হচ্ছে তার জনগণ—তাই জনগণের অস্তিত্ব

মুছে না ফেললে তার পার্টির অস্তিত্ব মুছে যাবে কি করে ! কমিণ্টার্ণ রোদে-জলে তাকে মানুষ করেছে বটে—কিন্তু সত্যিকার মাটির রস জুগিয়েছে তার অমর গণমানব। এই গণমানব তার হৃৎপিণ্ডের মত অপরিহার্য পার্টির উচ্ছেদ সহ্য করবে না। অথচ কুয়োমিনটাঙের প্রতিক্রিয়াশীল দল এই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়।

চীনে সত্যকার গণতন্ত্র কে প্রচলিত করেছে—কুয়োমিনটাং অথবা কমিউনিষ্ট—এই প্রশ্নের উত্তর ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ডজনখানেক খাঁটি সাংবাদিক দিয়েছেন। এদের মধ্যে আছেন পূর্বে উল্লিখিত সাংবাদিকরা ছাড়াও গান্থার, এপষ্টাইন, থিয়োডোর হোয়াইট, গেল্ডার প্রভৃতি। এরা সবাই কমিউনিষ্ট এমন সিদ্ধান্ত করা মূর্খতা। তবে এরা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী। তাই, এদের মূল্য অনেক বেশী। এরা সবাই কুয়োমিনটাং স্বেচ্ছতন্ত্র এবং কমিউনিষ্ট গণতন্ত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

এখন প্রশ্ন আসে চীনা ধনিকশ্রেণীর উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য তাদের ধনতন্ত্রের ধ্বজা তোলা—তাতে কোনই সন্দেহ নেই। জাপানীরা কি চীনা ধনতন্ত্রকে সহ্য করবে ? এর উত্তর সে অনেক আগেই বলেছে। জাপান আজকের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চীনা ধনিকদের সাথে অংশীদারত্বে রাজী হতে পারে—এর আগে অনেকবারই সে প্রস্তাব তুলেছে—কিন্তু, সাবালক চীনা বণিককে সে কখনই সহ্য করবে না। সুবিধানুযায়ী আপোষ করতে সে রাজী—ফ্যাসিজমএর ধর্মই তাই। কিন্তু, সে আপোষ আপোষই—সাময়িক বিরাম ছাড়া চিরস্থায়ী আরাম সে চীনা ধনিককে নিতে দেবে না। তাই, যুদ্ধ সে চালিয়ে যাবেই।

এবার সবশেষ প্রশ্ন—চীনা কমিউনিষ্টদের বাদ দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়া চলে কি ? তারও উত্তর মস্তবড় একটা 'না'। কমিউনিষ্ট

পার্টির মেম্বার আজ পাঁচ লক্ষ—পাঁচ লক্ষ তার অপরাজেয় সৈনিক—দশ-কোটি লোক তার প্রভাবাধীন। এই লোক সাধারণ লোক নয়—এদের চেতনায় অদম্য প্রতিরোধ ঘাঁটি গেড়েছে, প্রতিরোধের এতবড় শক্তিকে বাদ দেবার সাধ্য কারও নেই। তাই, চীনা ধনিকদের আপন স্বার্থেই এদের সাথে হাত মেলাতে হবে—জাপানী ধনিক চীনের কণিকা মাত্র জমিও ছেড়ে দেবে না।

মিত্রপক্ষের স্বার্থও আজ এদের সাথে এসে মিলেছে। কিন্তু, এক এক স্বার্থ এক একভাবে তার কাজ হাসিল করতে চাইছে। মিত্রপক্ষ—রুশিয়া বাদে—সামরিক বিজয়ের সম্ভাবনার সব রকম সম্ভাব্য উপায় আবিষ্কার করতে ব্যস্ত আছে। কিন্তু, রাজনৈতিক মীমাংসা ছাড়া সে সামরিক বিজয় সম্ভব হয় না। কুয়োমিনটাং আপন শ্রেণী স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রয়াসে মিত্রশক্তির শক্তিকে দিয়েই কাজ বাগাবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু, শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করা যায়না। বাকী থাকে একমাত্র কমিউনিষ্ট দল—তারা সত্যকার পথে চলেছে কিনা তার বিচার করবার যথেষ্ট মশলা পাঠক পেয়েছেন বলেই মনে হয়। চীনের প্রয়োজন শুধু রাশি রাশি ট্যাঙ্ক, কামান, এরোপ্লেন নয়—যদিও সেগুলোও অপরিহার্য—চীনের স্বার্থ পরস্পর হানাহানি নয়—প্রতিরোধের অজেয় প্রাচীর গড়ে তোলাই তার কাজ। একাজে জনগণই শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তাই, শাসনক্ষমতার রশ্মি তার হাতে তুলে দেবার কোনরকম আড়ষ্টতা সেই প্রাচীরকেই দুর্বল করবে।

জাপানের পরাজয় সুরু হয়েছে বটে—কিন্তু, যুদ্ধ আজও অসমাপ্ত। বিজয় গৌরবের শীর্ষে জার্মানীর হাতে যত জমি ছিলো, জাপান আজও তার তিনগুণ জমির মালিক। তাই, মালিক যে নেহাৎ দুর্বল নয় ওই মালিকানাই তার পরিচয়। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের যুদ্ধে কৃতিত্ব

আছে স্বীকার করি—মূল্যও তার খানিকটা অস্বীকার করবো না—কিন্তু চরম মূল্য নির্ণয়ের স্থান চীনেরই মাটিতে।

বর্মা রোড উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু চীন আজও তার সঙ্কটের লাল মেঘের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। শাসনবিভাগের সামান্য সামান্য সংস্কার সে সঙ্কটকে দূর করতে পারে না। সে সঙ্কটকে দূর করতে পারে একমাত্র গণতন্ত্রের পূর্ণ ব্যাপ্তি। কিন্তু সেপথে আজও চীন বহু পিছে। চীনের গৌরবময় জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে তার বিপদকে খাটো করে না ফেলি! চীনা গণতন্ত্রের শত্রু ততটা দুর্বল নয়। এর শত্রু নিঃসঙ্গও নয়।• সারা দুনিয়া জুড়ে বিজয়লাভের নেশায় এরা আজ মরিয়া। পৃথিবীর কোণে কোণে এদের শিকড়। বেলজিয়াম, গ্রীস, ইটালি, প্যালেষ্টাইন সর্বত্রই সে শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যাবে!

কিন্তু, এ শিকড় সবলও নয়—আলোকলতার মতই মাটির রস থেকে এরা বঞ্চিত। তাই, ফ্রান্স, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, বেলজিয়াম, গ্রীস সর্বত্রই এদের পতনের আওয়াজ শোনা গেছে। কিন্তু, চীনে এরা আজও দস্তুরমত টিঁকে আছে। এদের এই অস্তিত্বের পূর্ণ উচ্ছেদের দায়িত্ব একদিকে যেমন সোভিয়েট রুশের জনগণের, তেমনি মিত্রপক্ষের জনগণের এবং তারই সাথে প্রধান দায়িত্ব চীনের জনগণের। "Peace is indivisible"—লিটভিনফের একথার আজ মানে খুঁজে পাওয়া যায়। চীনের বুকে ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডব অক্ষুন্ন রেখে বিশ্বের জনগণ শান্তি পেতে পারেনা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অস্তিত্ব আগুনের সম্ভাবনাকে রেখেই দেবে।

চীনের বুকে ফ্যাসিষ্ট অভিযান প্রথম রূপ নেয়—চীনের বুকেই তার শেষ পরিণতি সৃষ্টি করতে হবে।

কন্‌ফুসিয়াস, লাও-সীর চীন, সান্‌ইয়াৎ সেনের চীন যে ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে এগিয়ে এসেছে, আগামী চীনের স্বপ্নময় প্রভাতের শিয়রে সেই ধারারই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে—এই বিশ্বাস নিয়েই চীনা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকব। চীনা ইতিহাসের ধারা মাটির স্পর্শ নিয়েই ছুটেছে—সেই মাটিরই স্পর্শ তাকে ভবিষ্যতের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবে—যেখানে বহু ধারার অপূর্ব সমন্বয়ে পৃথিবী রমণীয়, জীবন বরণীয় হয়ে উঠবে। সেই বহুধারার শোণিতে শোণিতে এই মাটিরই গন্ধ—সে মাটি ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—সবারই রঙ ও রূপে রঙীন্।

টাইফুনের দৌরাত্ম্যে চীন

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু মহাসংগ্রাম আজও শেষ হয় নি—বরং নতুন রূপে এবং নতুন বেগে আজ দেশে দেশে তার গতিশীল অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। গোটা ইউরোপের ওপর দিয়ে এক অভূতপূর্ব গণবিপ্লবের ঢেউ বয়ে গেছে। পদদলিত ও লাঞ্ছিত মানবের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মুখে নাৎসী বাঘা-ট্যাঙ্ক চুরমার হয়ে উড়ে গেছে—নাৎসী বেয়নেট ভোঁতা হয়ে গেছে। পশ্চিম পৃথিবীর এক বিরাট অংশ যে নাৎসী দানবের হুঙ্কারে থর থর করে কেঁপেছিলো—আজও সেখানে আলোড়নের অবধি নেই। কিন্তু সে আলোড়ন সদ্যজাগ্রত গণমানবের মুক্তি-উল্লাস, যারা নাৎসী দাসত্বের শৃঙ্খলের ফাঁকে ফাঁকে ডিনামাইটের সজীব কণিকা মাখিয়ে রেখেছিলো। জঙ্গলের ফাঁকে, অন্ধকার মাটির নীচে, পাহাড়ের

গুহায়, গাছের মাথায়, নদীর বাঁকে যারা এতকাল অদৃশ্য থেকে নতুন পৃথিবীর নেবুলা তৈরী করেছিলো—আজ সেই নেবুলা থেকেই নতুন সৃষ্টির মশলা দারুণ উৎক্ষেপে বেরিয়ে এসেছে। নাৎসীরা পরাজিত বিধ্বস্ত। নুরেমবার্গে লৌহকারায় শৃঙ্খলিত গোয়েরিং, হেস্ আজ তাঁদেরই মুক্তি-দেওয়া বুলেটের প্রতীক্ষায় আছেন। লাভাল গুলি খেয়ে মরেছেন—কুইসলিং এর প্রাণভিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে—পেঁতা রহস্যাবৃত আল্‌প্স্ এর চূড়ায় বন্দী—বিশ্বাসঘাতক মিহাইলোভিচ্ আজ শেয়ালের মত চুপি-চুপি বনে-জঙ্গলে ফিরছেন। বিশ্বজয়ের এক বর্বর চক্রান্ত আজ এমনিভাবে জনগণের অমরতার কাছে পরাস্ত।

তন্দ্রাচ্ছন্ন এসিয়ার চোখেও প্রভাতী আলোর স্পর্শ লেগেছে। বার্মার পাহাড়ে, যবদ্বীপের বনে, ইন্দোচীনের প্রান্তরেও আজ জাগ্রত মানুষের কলরোল শোনা যায়। মহাযুদ্ধ মহামানবের তমসাঘন তন্দ্রা এমনি করে ঝেড়ে দিয়ে গেছে। কোথায় ছিলো দেশভক্ত বার্মিজ বীর আউঙ্গসান্—কাল পর্যন্ত কেউ তাঁর সন্ধান রাখতো না। নৃত্য-শিল্পী যবদ্বীপের বীর নেতা সুকর্ণ—যবদ্বীপের গবর্ণর ভ্যান মুক্ স্বয়ং ছুটেছেন তাঁর সাথে আপোষের জন্যে। আমাদের কামান আজ রাস্তায় রাস্তায় দেশশত্রুর মাথায় আগুন উদ্গার করছে। দু' বছর আগে কে ভাবতে পারতো এসব। এ যেন ঠাকুমার কাছে শোনা রূপকথার স্বপ্ন-ছড়া। পরাজিত ফ্যাসিষ্ট জাপানের বিলুপ্তির পথে এসিয়ার দেশে দেশে এমনি জন-জাগরণের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে। আজকের চীনের ইতিহাসকে এরই পটভূমিকায় বিচার করতে হবে।

চীনের মুক্তি সংগ্রামের ধরণ কিন্তু আজ ইন্দোচীন বা যবদ্বীপের মুক্তি সংগ্রাম থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যবনিকা পড়ার সাথে সাথেই চীন ঘরোয়া লড়াইএ জড়িয়ে পড়েছে।

খবর এসেছে Shantung, Hopei, Suiyuan, Shansi প্রভৃতি (রয়টারের মতে, 'Stronghold of Communist activity) প্রদেশে কুয়োমিনটাং আর কমিউনিষ্ট ফৌজের মধ্যে জোর লড়াই বেধে গেছে। অবশ্য, গৃহযুদ্ধ চীনে এই নতুন নয়। ১৯৩৭এর আগের দশবছরের অন্তর্যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও জাপানী যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকেও বহুবার এই ধরণের সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু, সে সংঘর্ষের রূপ ছিলো স্বতন্ত্র,— প্রধান শত্রু জাপানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একপক্ষ ঘরের শত্রুর সামনে শুধুই আত্মরক্ষার লড়াই চালিয়ে গেছে—আর একপক্ষ তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছে পুরোদস্তুর। কিন্তু, আজকের গৃহযুদ্ধের রূপ (সত্যিই যদি গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে) হবে স্বতন্ত্র। এবার সেই 'একপক্ষের' আত্মরক্ষার দুর্বলতা নেই। তাই গৃহযুদ্ধ এবার যদি সত্যিই দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, তাহলে বিধ্বস্ত এবং পীড়িত চীনের ভবিষ্যতের পক্ষে সত্যিই আশঙ্কার কথা। তার রাষ্ট্রমর্যাদা এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দুর্বলতায় এক হীনতর পর্যায়ে নেমে আসবে। চীনের গরিমাময় সংগ্রাম জগতের লোকের কাছে এমনি করুণার সামগ্রী হয়ে উঠবে কিনা চীনের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সেটা বলতে পারে।

কিন্তু চীনের এই ঘরোয়া যুদ্ধ অসম্ভবও ছিলো না—অপ্রত্যাশিত ও ছিলো না। ১৯২৭এর পর থেকে চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চীনের স্বাভাবিক পরিণতি।

জাপানী যুদ্ধের গোড়ার দিকেই কুয়োমিনটাং চীনের মতিগতি পরিবর্তনের একটা ছোট্ট সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু, প্রতি-ক্রিয়াশীলদের বর্ধমান প্রভাব চীনকে পুরনো প্রতিক্রিয়ার পথে টেনে নিয়ে যায়। এতবড় একটা জাপানী যুদ্ধ গেলো, অথচ প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর ধরে কুয়োমিনটাং চীন একটা বেয়নেট পর্যন্ত উঠায় নি। তার বহু-

বিঘোষিত পঞ্চাশ লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক সীমান্তের পেছনে বসে barrack-room-ballad গেয়েছে আর তাদের নেতারা বসে বসে plan করেছে কী করে জাপানের সাথে আপোষ করে 'লাল দস্যুদের' দফা নিকাশ করা যায়।

কিন্তু মজা এই, চীনের সাম্প্রতিক ব্যাপক ঘরোয়া লড়াইটা এমন সময় ঘটেছে যখন সাধারণ লোকে তার জন্যে মাত্রই প্রস্তুত ছিলেন না। চিয়াংকাইসেকের উপর্যুপরি আমন্ত্রণে মাও-সে-তুং চুং-কিং গিয়েছেন—সেখানে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে কী করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চীনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তার আলোচনা চলছে—এমন কি, কতকগুলো বিষয়ে সম্মিলিত সিদ্ধান্তও নাকি সম্ভবপর হয়েছিলো শোনা যায়।

তারও আগে T. V. Soong মস্কো গিয়ে রুশ-চীন চুক্তি করিয়েছেন (অবশ্য, আগে তিনি আমেরিকা গিয়ে সোভিয়েট বিরোধী চুক্তিতে আমেরিকার কাছে বিশেষ কোন উৎসাহ না পেয়ে পরে তাঁকে চীন-সোভিয়েট চুক্তিতে উদ্যোগী হতে হয়)। রুশ-চীন চুক্তি লক্ষ্য করে সবাই ভেবেছিলেন, এইবার চীন মার্কিণ আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতা থেকে মুক্ত হয়ে সোভিয়েটের সহযোগিতায় এক শক্তিশালী মহাচীনের পটভূমিকা রচনা করতে পারবে। তার পরেই কমিউনিষ্ট নেতাদের উপর্যুপরি আমন্ত্রণের সুর লক্ষ্য করে এবং আপোষ বৈঠকের সংবাদ পেয়ে সবাই আশাশীল হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষত, বিশ্বজোড়া প্রগতিশীল শক্তির উন্মেষ দেখে সে আশা আরও দৃঢ় হয়েছিলো। কিন্তু কুয়োমিন্‌টাংএর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের সাথে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অতটা আশাশীল হতে পারেন নি। কেন পারেন নি এর উত্তর আগেই অনেকটা দেওয়া হয়েছে—আরও কিছুটা দেওয়া যাক্।

চীনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠায় সব চেয়ে বড় বাধা

কুয়োমিনটাং এর আভ্যন্তরীণ সংগঠন। ১৯২৭এর পর থেকে কুয়োমিন্‌টাং এর সাথে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই—কোন নির্বাচনও আর হয় নি। কুয়োমিন্‌টাং হচ্ছে বিভিন্ন দলের মিলন ক্ষেত্র—যেমন এর মধ্যে আছে Whampoa Academy, C. C. Clique, Kwangsi Clique, Political Science Group, এবং Dr. H. H. Kung, T. V. Soong, Snnfo, Ho Ying Ching প্রভৃতিদের দল। তাই কুয়োমিন্‌টাংএ ফ্যাসিষ্টপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদেরই একাধিপত্য। Soong, Sunfo প্রভৃতি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দু একজন আছেন বটে, কিন্তু তাঁদের সুবিধাবাদ এবং দুর্বল মনের অস্থিরতা চীনের রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁদের বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠা রাখতে দেয় নি। এই ফ্যাসিষ্টপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরাই চীনের রাষ্ট্রশাসনের উত্তুঙ্গপ্রদেশে কায়েমীস্বত্বে বিরাজমান। কোনরকম নির্বাচনের নামেই এঁরা আঁৎকে ওঠেন। এঁদের স্বেচ্ছাচারী শাসন জনগণ থেকে এঁদের বহুদূরে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই জনগণের হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে এঁদের ভয়।

এর পর আসে চীনের স্বয়ংশাসিত প্রাদেশিক শাসনকর্তার (এবং সেনাপতিরও একাধারে) দল। চীনের জাতীয় সৈন্যদল বললে কিছুই বোঝা যায় না—কেননা, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বের বাইরে এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের ব্যক্তিগত খবরদারীতে বহু সৈন্য আছে—যেমন, ধরা যাক্—Hunanএর গবর্ণর Lung Yunএর অধীনে দু লক্ষ সৈন্য আছে। মুসলমান সেনাপতি Maএর অধীনে দেড়লক্ষ সৈন্য আছে। শানসীর বহু কুখ্যাত Yen-Hsi-Shan (যিনি সম্প্রতি গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির তিন-দফা অভিযোগ কমিউনিষ্টদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন—প্রথম অভিযোগটা সবচেয়ে হাস্যকর—কমিউষ্টরা নাকি জাপানীদের সহযোগিতা গ্রহণ করছে। দ্বিতীয় অভিযোগ কমিউনিষ্টরা নাকি জনসাধারণকে

দিয়ে জোর করে আফিং চাষ করায়—যার উত্তর দিয়েছেন Epstein তার 'I visit Yennan' বইয়ের মধ্যে। তাতে তিনি বলেছেন, Communist এলাকায় এক টুকুরো আফিংএর ক্ষেতও আমার চোখে পড়েনি। উত্তর দিয়েছেন Edgar Snow তাঁর "China Resists" নামক বইএ, তিনিও ওই এক কথাই বলেছেন। তৃতীয় অভিযোগ, কমিউনিষ্টরা সবগুলো প্রদেশ দখলের মতলব করেছে—এরও উত্তরপাঠক নিজের বিচারবুদ্ধিতেই খুঁজে নিতে পারবেন বলে বিশ্বাস) এঁদেরই মত আর একজন বহু সৈন্যের মালিক। মালিক এইজন্যে বললাম যে এই সমস্ত সেনাপতিরা তাঁদের সৈন্যদের সঙ্কটময় সীমান্তে না পাঠিয়ে সীমান্তের বহুদূরে তাঁদের জমিতে এদের দিয়ে কেউ কফির চাষ করান, কেউ বা ফ্যাক্টরীতে শিল্প-দ্রব্য তৈরী করিয়ে প্রচুর মুনাফা ভোগ করেন।

এ ছাড়া মৃত সৈন্যদের নাম ভাঙিয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করার এক চমৎকার ফন্দীও এঁরা আবিষ্কার করেছেন। চীনের ভূতপূর্ব জাপানী-ঘেঁষা সেনাপতি Ho-Ying-Ching একবার ঘোষণা করেছিলেন চীনের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। নতুন সমর মন্ত্রী Chen Cheng ব্যয়বহুল এই বিরাট সৈন্যদল সঙ্কীর্ণ করার এক পরিকল্পনা করেন। অনুসন্ধান নিয়ে দেখা যায় যে এই বিপুল সংখ্যক সৈন্যদলের একটা বিরাট অংশ অপদার্থ, অকর্মণ্য—তাছাড়া আরও একটা বিরাট অংশ 'Dead Souls'. এই 'Dead Souls' সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার জন্যেই এতগুলো কথা লেখা। যে সমস্ত সৈন্য মারা গেছে তাদের 'Dead Souls' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যে সমস্ত সৈন্য বহু আগে মরে ভূত হয়ে গেছে ওইসব মালিক-সেনাপতি তাদের মাইনে, রাহাখরচ প্রভৃতি সব আত্মসাৎ করেন। এইভাবে এক অদ্ভুত উপায়ে মৃতেরাও জীবিতের তালিকায় স্থান পেয়ে এসেছে।

এ ছাড়াও চীনের সুবিখ্যাত Indusco'র (Industrial Co-operative) প্রচুর টাকাও এই সমস্ত জমিদার-মহাজন-সেনাপতিরা মহাজনী কাজে নিয়োগ করে চীনের গণতান্ত্রিক বিকাশের বলিষ্ঠ অঙ্কুরকেও মূলেই বিনাশের ব্যবস্থা করেন। তাই, সৈন্যবাহিনীর আমূল সংস্কারের জন্যে এবং সম্মিলিত সেনাপতিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন কমিউনিষ্টরা দাবী করেন তখন এই সমস্ত দেওলিয়া সেনাপতিরা যে কেন তাদের বিরুদ্ধে জাপানী সহযোগিতা, আফিং চাষ, গৃহযুদ্ধের অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা করেন তা বোঝা একটুও কঠিন নয়। জাপানী শাসকমণ্ডলী যে এদেরকেই তাদের তাবেঁদারীর কাজে সহজেই পাবে তাতেই বা বিচিত্র কী! এমন নিষ্কর্মা সেনাপতি আর সেনাদলই তো তাদের কাম্য। তাই, দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরেও কুয়োমিনটাং সীমান্তের শান্তি যে কোন দিক থেকেই কেন ব্যাহত হয় না তারও উত্তর এর মধ্যেই রয়েছে। ১৯১১ সাল থেকে যে Yen-Hsi-Hsan গবর্ণরের গদিতে এঁটে বসে আছেন— গণতন্ত্রের নামে তিনি তাই আঁৎকে উঠবেন তাতে সন্দেহ কী। আর গৃহযুদ্ধের উদ্যোগে তাঁর নিষ্কর্মা জীবন যে উল্লসিত হবে তাতেই বা অবাক হবার কী আছে। এইরকম Yen-Hsi-Hsanদের নিয়েই চীনের সেনাপতিমণ্ডলী। সারা পৃথিবী এবং তার সাথে চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের দাবী শুনে এঁরা তাই তাঁদের মান্ধাতার আমলের গদির মোহে আকুল হয়ে বেপরোয়া হবেন চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। শান্সী আর শান্টুংএর গবর্ণরদের রাজ্যসীমানার অর্ধেকের বেশীই প্রায় ইয়েনান্ গণতন্ত্রীদের অধীনে চলে গেছে। তাই অবশিষ্ট জমিটুকুর মোহে এঁরাই বেশী চঞ্চল হয়েছেন। তাই চুংকিংএর আপোষ-আলোচনার মুহূর্তটিকেই যে এঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরম এবং চরম মুহূর্ত বলেই বেছে নেবেন তাও না বললেই চলে হয়তো।

এই নিষ্কর্মা সৈন্য এবং সেনাপতিদের, ওই গণতন্ত্রবিমুখ কুয়োমিনটাং রাজনীতির (যাদের নেতাদের জাপানী সহযোগিতার বিষয় মোটেই গোপন ছিলো না) খবর রেখেই জাপান যেদিন প্রশান্তমহাসাগরীয় রণাঙ্গণের দুশ্চিন্তায় উত্তর দক্ষিণ বরাবর রাস্তা অবাধ করবার জন্যে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর পরে কুয়োমিন্‌টাং সীমান্তের শান্তি লঙ্ঘন করলো এবং দেখতে দেখতে Honan, Hunan, Kwangtung, Kwangsi প্রভৃতি প্রদেশের বড় বড় টুকরো অনায়াসে ছিঁড়ে নিলো সেদিন চিয়াং লজ্জাভরে স্বীকার করলেন—We sustain defeats, which cover the army as well as the Government with shame—অর্থাৎ, আমরা পরাজিত হয়েছি এবং এই পরাজয় সৈন্যদল এবং সরকারকে লজ্জায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

কিন্তু, হতভাগ্য চিয়াং তাঁর লজ্জার সত্যিকার উৎসের সন্ধান পেলেন না। এই পরাজয়ের পরেও কেন্দ্রীয় ফৌজের মধ্যে প্রতিআক্রমণের সঙ্কল্প না জেগে তাদের বেকার নেতাদের "maintenance of order in the rear"—পেছনের শৃঙ্খলা নীতিতেই ম্রিয়মান রইলো। মস্কোর পত্রিকাগুলো কেন্দ্রীয় ফৌজের এই নিরুদ্দম নিশ্চলতা দেখে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগলো—চুংকিং ফৌজ যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। অথচ, পাঁচলক্ষ বাছাই কেন্দ্রীয় সৈন্যের ব্যূহ উত্তর পশ্চিমের কমিউনিষ্ট এলাকা ঘিরে অক্ষুণ্ণই রইলো— তাদের সরে দাঁড়াবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেলো না।

চুকিং ফৌজের এই দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরের নিষ্ক্রিয়তার কালে ইয়েনান ফৌজ কী করছিলো তার হিসেব নেওয়া যাক এবার।

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে কমিউনিষ্ট সৈন্য ছোট বড় অসংখ্য যুদ্ধ করেছে। শত্রুসৈন্য হত বা আহত করেছে নলক্ষ ষাটহাজার—বন্দী করেছে দুলক্ষ আশীহাজার।

একলক্ষের ওপর শত্রুসৈন্য কমিউনিষ্ট ফৌজের সাথে যোগ দিয়েছে। শত্রুপক্ষের মোট ক্ষতি তেরোলক্ষ ষাট হাজার সৈন্য।

কমিউনিষ্ট ফৌজ এর মধ্যে একহাজার আঠাশটা কামান, সাত-হাজার সাতশো মেসিনগান, চারলক্ষ ত্রিশহাজার রাইফেল প্রভৃতি দখল করেছে।

চৌত্রিশহাজার জাপানী ব্লক্ হাউজ আর এগারো-হাজার শক্তিশালী ঘাঁটি অধিকার ক'রে কমিউনিষ্ট সেনাদল উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ চীনের বহু এলাকাকে মুক্ত করে এবং মুক্ত করে তাদের ন' কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ অত্যাচারিত লাঞ্ছিত দাস চীনা ভাইকে।

কিন্তু এর মধ্যে কুয়োমিনটাংএর কৃতিত্বও কিছু কিছু দেখা গেছে। সে কৃতিত্ব অর্জন করেছে কুয়োমিনটাং এর ভাড়াটে অগণিত গুপ্ত সমিতির দল। তাদের হরেক রকম নাম—"Blue shirts" (Tai Liর অধীনে, "The Regenerationists" (General Hu Tsungnan এর অধীনস্থ), তা ছাড়াও "The Three Principles Youth Brigades' এমনি আরও কত কি! হরেক হরেক রকম নামের মত হরেক হরেক প্রকার এদের পেশা—যথা, গুপ্তহত্যা, অপহরণ, ধরপাকড়, লুঠ ইত্যাদি। একবার New Fourth Armyর liason depot এর সমস্ত অফিসারকে এরা হত্যা করে। কিন্তু, United Front এর তাগিদে এবং চীনের ভাবী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই কমিউনিষ্ট নেতারা এত বড় নৃশংস ঘটনা এবং অপূরণীয় ক্ষতিকে মুখ বুজে সহ্য করে নিলেন। শুধু মাত্র ছোট্ট একটা স্মৃতিসভার আয়োজন তাঁরা চুংকিংএ করেন এবং তাতে শুধু নির্দিষ্ট কিছু সামরিক প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করা হয়। এ ধরণের ঘটনা আরও বহু হয়েছে, তার বিস্তৃত তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

এই বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী কৃতিত্ব দেখে, পাশাপাশি দুই সরকারের বিপরীত-ধর্মী সংগঠনের নমুনা দেখে এবং জাপানী পরাজয়কে ত্বরান্বিত করার আগ্রহে মিত্রপক্ষের মধ্যেও তুমুল আন্দোলন ওঠে—কুয়োমিনটাং নীতি-প্রকৃতিকে দেশ বিদেশের বহু গণতন্ত্রীই এসময় আক্রমণ করে। Edgar snow—যিনি সর্বপ্রথম রহস্যাবৃত লাল চীনের আবরণ উন্মোচন করেন তিনি বললেন, "How long, I wonderd, could a Government continue to claim to be 'national' and 'united' which officially denied the political existence of a party whose withdrawal of support could at any time expose it to utter disaster?" আমি ভেবে অবাক হয়ে যাই, কতদিন আর একটা গবর্ণমেণ্ট "জাতীয়" এবং "সম্মিলিত" বলে দাবী করবে—যে সরকারী ভাবে একটা দলের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং যার সহযোগিতা নাকচ হয়ে গেলে সে (সেই সরকার) সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়বে। ইংলণ্ডের Manchester Guardian পত্রিকা চুংকিং গবর্ণমেণ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল অথচ কটাক্ষপূর্ণ একটা প্রবন্ধে লিখলো—The Kuomintang Party tends more and more to become reactionary, almost Fascist.—কুয়োমিন্টাং দল প্রতিক্রিয়ামুখী এমন কি প্রায় ফ্যাসিষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে।

এমনকি একজন বিখ্যাত কুয়োমিন্টাং নেতা এবং Legislative Yuan এর স্পিকার Sun Fo (সান ইয়াৎ সেনের ছোট ছেলে) পর্যন্ত বক্তৃতায় বললেন, "The Kuomintang constituted only an insignificant part of the people...why does public opinion in the United States and Great Britain criticise the state of affairs in China?—Because, they think that

China is on the road to Fascism.—কুয়োমিনটাং জনগণের এক অকিঞ্চিৎকর অংশ। গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ কেন চীনের পরিস্থিতির সমালোচনা করে?—যেহেতু তারা মনে করে, চীন ফ্যাসিবাদের পথে চলেছে।

কুয়োমিনটাং এর একজন প্রাচীনতম সভ্য এবং সান-ইয়াৎ সেনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী Kunkang 'Democratic League'এর এক সভায় (চুংকিং এ গত নভেম্বরে) গভীর দুঃখের সাথে বললেন,—We have returned to the despotism of past ages, when murder and tyranny over the people knew no bounds. If democracy is not introduced now, China will find herself on the brink of disaster.—আমরা অতীতের স্বেচ্ছাচারী যুগে ফিরে গেছি—যখন, জনগণের ওপর হত্যা আর পীড়নের কোন পরিমাপ ছিলো না। এখন যদি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হয়, চীন ধ্বংসের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াবে।

তাই, দেখা যাচ্ছে, চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী শুধুই কমিউনিষ্ট দলের নয়—জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাজনৈতিক দলের দাবীই এই। শুধু চীনেই নয়—সারা পৃথিবীর জনসাধারণের মুখ্য দাবীও এই—কেননা, চীনের জন্যে সমস্ত প্রগতিশীল জনসাধারণেরই একটা উদ্বেগ দুশ্চিন্তা আছে—যেহেতু চীন সাম্রাজ্যবাদের একটা বিরাট খুঁটি স্বরূপ। এই খুঁটির জোরে দেশে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদ তাদের অমানুষিক শোষণ আর হত্যার লীলা চালিয়ে আসছে। পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের গণতন্ত্রী চীন যদি আজ গণতন্ত্রী পৃথিবীর পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান ক্ষেত্র একমাত্র নীল আকাশেই হতে পারবে।

দেশের এবং বিদেশের এই জনমতের চাপেই চিয়াংকাইশেক পর্যন্ত পয়লা মার্চের এক বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছেন,—"The tide of public opinion which is demanding national unity and constitutional Government is growing stronger and will soon become an irresistible force. Not a single political party can afford to ignore this force"—জাতীয় দাবী এবং গণতান্ত্রিক সরকারের দাবী-ভরা জনমতের স্রোত ক্রমেই ফেঁপে উঠছে এবং শীগগিরই সেটা অদম্য বলশালী হয়ে উঠবে। কোন রাজনৈতিক দলই এই শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

এই জনমতের চাপেই চিয়াং এই নভেম্বরে National Assembly ডাকার ঘোষণা করেন—কিন্তু, সে National Assembly কমিউনিষ্টরা বয়কট করেছিলো—কেননা, সেটা না National—না Assembly. যে রাজ্যে বক্তৃতার স্বাধীনতা নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (বন্যার খবর দেওয়াও যেখানে রাজদ্রোহমূলক অপরাধ) নেই, যে দেশে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক কারাপ্রাচীরের অন্তরালে—সেখানে National কথাটা ব্যবহার করাটাই সমগ্র জাতির কাছে ধিক্কার পাবার যোগ্য। কুইনাইনের তেতো ঢাকবার জন্যে চিনির আবরণ দেবার কারসাজীর আশ্রয় চিয়াংএর মত একজন নেতা নিতে পারেন এটা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। কিন্তু, চিনির আবরণে বিষ বটি গিলতে চীনের কোন প্রগতিশীল দলই রাজী হয় নি।

অথচ, কমিউনিষ্ট শক্তিকে উপেক্ষা করার সাধ্য দশবছর আগেও চিয়াংএর ছিলো না—এবং আজও নেই। যেদিন সেই কিয়াংসির নিরাশ্রয় ক্ষেত্র থেকে যাযাবরের দল একটা চলন্ত দেশ মাথায় তুলে (গন্ধমাদন পর্বত তো তাদের কাছে তুচ্ছ) উত্তরপশ্চিমের গুহার

দেশে রওনা হয়েছিলো, চিয়াং তা ভুলতে পারেন না। আজ পীত নদীর উত্তর তীরে বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে। তাদেরই দখলে আজ একশো ছেষট্টিটি নগর—চীন-মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তের বিখ্যাত সহর Shanghai Kwanও এর মধ্যে পড়ে। Ching Kuangtaoএর মত দ্বীপের নৌঘাঁটির কর্তৃত্ব তাদের হাতে—তাছাড়া Wei-Hai-Wei, Yentai প্রভৃতি বন্দরেরও মালিক তারাই। এছাড়া অগণিত জনগণের, লক্ষ লক্ষ মৃত্যুপণ সৈনিকের ও কঠোর সঙ্কল্পপরায়ণ ও সব ধরণের শিক্ষায় শিক্ষিত অজস্র যুবকের এই দুর্লঙ্ঘ দুর্ভেদ্য ব্যূহের অপরাজেয়তা সম্বন্ধে অন্তত চিয়াংএর মনে কোন সংশয় নেই। Kiangsiর একটামাত্র ব্যূহ থেকে যাদের হঠাতে পাঁচ-পাঁচটা রক্তস্রাবী অভিযান চালাতে হয়েছিলো—আজ তাদের হাতে অন্তত পাঁচ ছ'টা পাকাপোক্ত ব্যূহ। সেদিনের সেই ক্ষুৎপীড়িত, আবহাওয়া তাড়িত, বোমা বিধ্বস্ত লংমার্চের লক্ষাধিক যাযাবরকে তো তবু বিশ্বাস করা চলতো—কিন্তু এদের ?—এই সুপ্রতিষ্ঠিত গণশক্তিকে ? যাযাবর যে আজ স্থাবর হয়ে উঠেছে—এ আশঙ্কা চিয়াং ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি। তাই কাতরভাবে বার বার তিনি মাও-সে-তুংএর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছেন। যাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া একদিন কমিউনিষ্টদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো—আজ তিনিই সাক্ষাৎপ্রার্থী সেই অর্ধাহারী, পাঁচ আনা গজের জামা-পরা একজন চাষীর ছেলের সাথে—যাকে তিনি একদিন 'Red Bandit' বলে শুধু উপহাসই করেছেন ! এটাও ইতিহাসের এক করুণ রহস্য ছাড়া কী !

শেষ পর্যন্ত মাও-সে-তুং চুংকিংএ এসেছিলেন—অনেক আলোচনাও হয়েছে। শোনা যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্মিলিত সিদ্ধান্তও হয়েছে :—

(১) গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য চিয়াংএর নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সহ-

যোগিতা স্থাপন করা এবং গণতন্ত্র, ঐক্য ও একত্রীকরণের ভিত্তিতে অখণ্ড মুক্ত চীন গড়ে তোলা।

(২) জাতীয় সমস্যা এবং পুনর্গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে কমিউনিষ্ট, কুয়োমিনটাং এবং অন্যান্য দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটা পরামর্শ সভা নিয়োগ। (অন্যান্য দল প্রভৃতির সাথে আলোচনার পর উক্ত পরামর্শ সভার সংগঠন ঠিক করা হবে।)

(৩) বক্তৃতার স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা—মেলামেশা, সভা-সমিতি প্রভৃতির স্বাধীনতা—এ সম্পর্কে বর্তমান আইন সংশোধন করা হবে; এবং কমিউনিষ্ট পার্টি শুদ্ধ সমস্ত পার্টির সমানাধিকার স্বীকৃত হবে।

(৪) Regular Police ছাড়া অন্য কারও গ্রেপ্তারের অধিকার থাকবে না। কাউকে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে বিচারের জন্যে কোন বিচারালয়ে হাজির করা হবে। গুপ্ত পুলিশের সেইজন্যে কোন গ্রেপ্তারের অধিকার থাকবে না।

(৫) ফ্যাসিষ্ট বিশ্বাসঘাতক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি। ফ্যাসিষ্টদের বিচার করে শাস্তি দেওয়া হবে। জাপ-তাবেদার সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হবে। (এই ব্যাপারে কমিউনিষ্টরা দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী—কুয়োমিনটাং ডেলিগেটরা সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষে।—দুর্বলতাটা লক্ষ্য করবার মত)।

উপরোক্ত বিষয়গুলোতে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্ভব হয়। কিন্তু, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও কতকগুলো বিষয়ে কোন মীমাংসা সম্ভব হয় নি—যেমন জাতীয় পরিষদ ডাকার ব্যাপারে—সৈন্যদল পুনর্গঠনের এবং জাপদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের ব্যাপারে এবং দশকোটি অধিবাসীর মুক্ত এলাকা কেন্দ্রীয় শাসনে আনার ব্যাপারে।

জাতীয় পরিষদের ব্যাপারে কমিউনিষ্টদের প্রস্তাব হচ্ছে—সার্বভৌম

এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের পুনর্নির্বাচন। কুয়োমিনটাংএর প্রস্তাব—১৯৩৫এ জাতীয় পরিষদের যে নির্বাচন হয়ে গেছে তাই বজায় রাখা (অর্থাৎ, যখন কুয়োমিনটাং দলই—সমস্ত দলের মধ্যে—একমাত্র আইনসঙ্গত দল ছিলো। এটা কতদূর গণতন্ত্রসম্মত পাঠকরাই তার বিচার করবেন) এবং তার সাথে আরও কিছু সদস্য যোগ করা। অবশ্য, শেষে ঠিক হয় যে, পরামর্শ-সভাই এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করবে।

এরপরে আসে সৈন্যদল পুনর্সংগঠনের কথা। এ ব্যাপারেও গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। কমিউনিষ্টদের প্রস্তাব—অভিন্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত সৈন্যদলের পুনর্সংগঠন। কমিউনিষ্টরা নিজেদের সৈন্যদল পঞ্চাশ ডিভিশান থেকে কমিয়ে কুড়ি ডিভিশান করতে রাজী হয় এবং রাজী হয় তাদের সৈন্যদলকে কোন নির্দিষ্ট সীমান্তের উত্তরে সরিয়ে নিতে। কিন্তু, কুয়োমিনটাং ডেলিগেটদের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, তিনজনের এক কমিটিতে এ সমস্যার মীমাংসা করা হবে।

আলোচনায় সবচেয়ে বড় সঙ্কট দেখা দেয় কমিউনিষ্ট পরিচালিত মুক্ত এলাকা নিয়ে। কমিউনিষ্টরা এ ব্যাপারে পর পর চারটে প্রস্তাব তোলে। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, গণনির্বাচিত এইসব এলাকাকে স্বীকার করা হোক্—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অবশ্য তাদের গঠন এবং তাদের কার্যপদ্ধতির পর্যালোচনা করতে পারবেন—এতে শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

কুয়োমিনটাং ডেলিগেটদের আপত্তির ফলে কমিউনিষ্টদের তরফ থেকে দুই নম্বর প্রস্তাব উঠানো হয়। প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে কুয়োমিনটাং প্রতিনিধিদের অভিমত হচ্ছে, গবর্ণমেণ্টই ওই সমস্ত মুক্ত এলাকার

সরকারের সংগঠন সম্বন্ধে বিবেচনা করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

যাক্—দুই নম্বর প্রস্তাব হচ্ছে—ওই সমস্ত প্রান্তিক এলাকার এবং হোপেই, শান্সী, শান্টুং প্রভৃতি কতকগুলো প্রদেশের (এই সব প্রদেশ ওই মুক্ত এলাকারই অংশ বিশেষ) কমিউনিষ্ট মনোনীত প্রতিনিধিদের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট চেয়ারম্যান, প্রাদেশিক সরকারের সদস্য, কতগুলো মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান্ প্রভৃতি হিসেবে নিয়োগ করবেন। কুয়োমিনটাংএর আপত্তিতে কমিউনিষ্টরা তাঁদের দাবী খর্ব করে প্রান্তিক এলাকা এবং জেহোল্, চাহার, হোপেই, শান্টুংএর জন্যে চেয়ারম্যান্ এবং মাত্র দুটো প্রদেশ আর গোটা তিনেক নগর-মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদে সীমাবদ্ধ করতে রাজী হন। কিন্তু কুয়োমিন্টাং প্রতিনিধিদল তাতেও নাচার।

কমিউনিষ্টদের তৃতীয় পাল্টা প্রস্তাব—সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সমস্ত মুক্ত এলাকায় যে নির্বাচন হবে তার তদারকীর ক্ষমতা থাকবে যুক্ত পরামর্শ-সভার। এই ভাবে গঠিত গবর্ণমেণ্ট সমূহকে সকলেই স্বীকার করে নিতে হবে। কুয়োমিন্টাং ডেলিগেট্দের এ সম্বন্ধে অভিমত—গ্রাম সমূহের নির্বাচন ওভাবে হতে পারবে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্র ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক নির্বাচন হতে পারবে না। মধ্যবর্তী সময়ে গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত কর্মচারী শাসনকাজ চালাবে।

চতুর্থ পাল্টা প্রস্তাব—শাসনতন্ত্র ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত ওইসব গবর্ণমেণ্টকে সাময়িকভাবে স্বীকার করে নেওয়া হোক। কুয়োমিনটাং প্রতিনিধির এতেও আপত্তি—কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি চাপিয়ে প্রাদেশিক শাসনকাজ চালানোর জিদ তাঁরা ছাড়তে পারলেন না—অর্থাৎ, গণমত তাঁদের অভিমতের বিরোধী। কমিউনিষ্টরা শেষ পর্যন্ত

এও বলেছিলো যে, যুক্ত পরামর্শ-সভাই এ ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করুক। কিন্তু, তাও টেকে নি।

এইখানেই সঙ্কটের সুরু—অবশ্য, সুরু আরও অনেক আগে থেকে—এটা শুধুই অছিলা। এই বৈঠক চলার সময়ই চুংকিংএর ওয়াকিবহাল মহল থেকে গোপন খবর পাওয়া যায়—চিয়াং তিন মাস থেকে ছ' মাসের মধ্যেই কমিউনিষ্ট এলাকা খতম করতে পারবেন—আলোচনা বৈঠকটা শুধু লোক দেখানো। হিটলারের রাশিয়া ধ্বংসের দশ সপ্তাহী প্ল্যানের মত চিয়াংএর ছ' মাসি প্ল্যানের ভাগ্য কি হবে চীনের ভাবী ইতিহাসই তার উত্তর দেবে—কিন্তু তাঁর লোক-দেখানো বৈঠক সম্বন্ধে দেখছি Democratic Leagueএর চেয়ারম্যান Mr. Changlan পর্যন্ত বলছেন, "The negotiations are merely window dressing to deceive the people as well as foreign countries".—দেশের লোক এবং বিদেশী লোকদের প্রতারণাই হচ্ছে এই আপোষ-আলোচনার মূলসূত্র।

কিন্তু, দেশ-বিদেশের লোককে deceive করার প্রয়োজন আজ হয় কেন, এইটুকু বুঝলেন না বলেই চিয়াং নিজে একদিন deceived হবেন—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

কিন্তু, আরও খবর এসেছে, রয়টার স্বয়ং জানাচ্ছেন, (খুব সম্প্রতি) কমিউনিষ্ট নেতা চৌ-এন্‌-লাইএর হাতে এক বন্দী বৈমানিকের দলিল পড়েছে। দলিলটা অবশ্য চিয়াংএর পাঠানো—তাতে নির্দেশ আছে অচিরেই কমিউনিষ্ট এলাকার ওপর চরাও হয়ে তাদের দফা শেষ করতে। চারিদিকের আবহাওয়ায় খবরটাকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না—যখন, স্বয়ং রয়টারই এরকম খবর দিচ্ছেন।

ওদিকে চু-তে হুঁসিয়ারী দিচ্ছেন, শান্‌সীতে কেন্দ্রীয় সরকারী ফৌজ

দুটো সশস্ত্র জাপ-ডিভিসন্‌কে কমিউনিষ্ট-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে পরিণত করছে।

সাংহাই, নানকিং আজও জাপানী সেনার হাতে। মাত্র সাতশো কুয়োমিনটাং প্যারাস্যুট-সৈন্য নানকিংএ এবং চারশো সাংহাইএ অবতরণ করেছে। অবতরণকারী সৈন্যরা জাপ সৈন্যদের নিরস্ত্র করার বদলে সহরে লুটপাট করে দুর্ভাগ্য পরিবর্তনের দিকে মন দিয়েছে—আর, জাপানী সৈন্যরা নির্বিবাদে তাদের দখলী এলাকা বজায় রেখেছে।

আর একদিক থেকে খবর এসেছে, জাপ-তাবেদার বেকার সৈন্যদের নিয়ে মস্ত মস্ত কমিউনিষ্ট-বিরোধী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। এর সাথে আছে কুড়ি লক্ষ Mintuan (সামন্তদের ভাড়াটে সৈন্য)—সারা যুদ্ধের ভেতর যাদের আজকের এই শুভ মুহূর্তটির জন্যে তৈরী করা হয়েছিলো, এবং যাদের একমাত্র কাজ ছিলো কৃষকদের কাছ থেকে জোরজার করে খাজনা, ট্যাক্স, সুদ, দেনা এবং আরও নানা অবৈধ পাওনা আদায় করা।

শান্‌সী শান্‌টুংএর মাটিতে রক্তের বন্যা বয়ে গেলো—তবু আলোচনা চলছিলো—পার্ল হারবারের বিপর্যয়ের মুহূর্তেও জাপানী প্রতিনিধি নির্বিকারভাবেই আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু, সে আলোচনা যেমন রক্তসমুদ্রেই ডুবে গেছলো—চুংকিংএর আলোচনাও তেমনি ডুবে গেছে। খবর এসেছে, কমিউনিষ্টরা আলোচনা বাতিল করে দিয়েছে।

আরও খবর পাওয়া যাচ্ছে, মার্কিন পোত কেন্দ্রীয় ফৌজ আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গন মুখে ছুটে চলেছে। সংশ্লিষ্ট কয়েকজন মার্কিন সৈন্যও ইতিমধ্যে কমিউনিষ্টদের হাতে ধরা পড়ে ক্ষমা চেয়েছেন - কিন্তু, মার্কিন সরকার ক্ষমা চান নি। বরং তাঁরই প্রতিনিধি ওয়েড্‌মেয়ার পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, কেন্দ্রীয় ফৌজকে মার্কিন সেনাপতি

কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু···অবশ্য অমন 'কিন্তু'র অভাব হয় কখনও না। মার্কিন ভূমিতে নিগ্রোদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে সুবর্ণ-বিলাসীর দল যেদিন আমোদ উপভোগ করতেন সেদিনও অমন ঢের 'কিন্তু'র সন্ধান পাওয়া যেত। আমাদের একথা বুঝতে অসুবিধা হয়না যে চীনের এই ঘরোয়া যুদ্ধে মার্কিন হস্তক্ষেপ আকস্মিক নয়—যেমন গ্রীসের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ-ঘুণধরা পুঁজিবাদের রক্তাক্ত হস্তক্ষেপটা আকস্মিক ছিলো না। পররাজ্য-গ্রাসের আধুনিক (অর্থনৈতিক) রূপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বেশ ধাতস্থ—তাই পৃথিবীর বহু জায়গায়ই এর প্রমাণও পাওয়া গেছে। পোর্টোরিকোর মত ক্ষুদ্র দেশ তাবেদারীর মধ্যে রেখে মার্কিনী লালসার আর নিবৃত্তি হচ্ছে না, সেকথা চীনের ক্ষেত্রে বহুদিন থেকেই মার্কিন বীররা প্রমাণ করেছেন। চীনের কমিউনিষ্টরা সমগ্র চীনের জাগ্রত গণমানব, তার সেই লোভের অন্তরায় হয়ে উঠছে বলেই চীনের ঘরোয়া যুদ্ধে আটলান্টিক চার্টারের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে নিমন্ত্রিত যাঁরা তাঁদের পাতে পান্থাভাতও পড়বে কিনা—সেটা দেখবার জন্মে আমরা উদগ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করে আছি। কিন্তু, আমেরিকান কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র Daily Worker চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে মার্কিন সহযোগিতার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে যে তিনহাজার মার্কিন বিমান সরবরাহ করা হয়েছে তা অবিলম্বে ফিরিয়ে নেওয়া হক ইত্যাদি। অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল নরনারীও এর প্রতিবাদ করছেন। ঘরে বাইরের এই প্রতিবাদ উপেক্ষা করার ক্ষমতা আজকের মার্কিন সরকারের নেই।

চিয়াং সরকার এতদিন মার্কিন সাহায্য হারাবার ভয়ে উগ্র

কমিউনিষ্ট-বিরোধী নীতি অবলম্বন করার একটা যুক্তি দিতেন। সে সাহায্য তিনি আর বেশীদিন পাবেন কিনা সন্দেহ। ওদিকে কুয়োমিনটাং এলাকার Democratic Leagueও দশ দফা দাবী জানিয়ে গণতান্ত্রিক পথেই এগিয়ে যাবার ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। সারা পৃথিবীর জনমত এদেরই পক্ষে।

চীনের জনসাধারণ আজ রক্ত চায় না—বহু রক্তই সে দেখেছে। সে চায় জমি, রুটি—যা সেই রক্তকে সঞ্চিত করতে পারবে। সে চায় শান্তি—রক্তের অপব্যবহার সে আর সহ্য করবে না। এই জমি, রুটি আর শান্তির শত্রু কে এবং কারা সে জানে। এবং এই যুদ্ধের আলোড়নে বেশী করেই জানে। Soong, Sun-Foর মত যেসব দুর্বল গণতান্ত্রিক এতদিন ইতস্তত করছিলো তারাও আজ সারা পৃথিবীর এবং তার সাথে চীনের নাড়ীর সত্যিকার খবর ধরতে পেরেছে—তাই, তাঁদের মুখেও আজ সুস্পষ্ট বাণী ফুটেছে।

চীনা কমিউনিষ্টরা কি রক্তাক্ত কমিউনিষ্ট বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন? তার উত্তর দিয়েছেন, ইয়েনানে ফিরে যাওয়া খ্রীষ্টান মিশনারীরা—"The liberals of Yennan had overnight abandoned Communism in favour of Democracy"—ইয়েনানের উদারনৈতিকরা রাতারাতি সাম্যবাদ ছেড়ে গণতন্ত্রের পথ ধরেছেন। সাম্যবাদ ছেড়েছেন কিনা সেকথা সাম্যবাদীরাই ভালো বিচার করতে পারবেন; আমরা শুধু দেখছি Gelder, Epstein থেকে আরম্ভ করে Edgar Snow পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপীয় এবং মার্কিন লেখক এবং সাংবাদিকই ইয়েনানের সার্থক গণতন্ত্র মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখে এসেছেন।

কুয়োমিনটাং কি গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক? চীনের ইতিহাসের মশলাই তার উত্তর দেবে।

সামন্তবাদের উচ্ছেদ আর সাম্রাজ্যবাদের উৎসাদন—জমি, রুটি আর শান্তি—এদের সুষ্ঠু সমাধানের ক্ষমতা যাদের থাকবে না—কোটি কোটি Mintuanএর অস্ত্রবল, অজস্র মার্কিন বোমা-কামানও তাদের রক্ষা করতে পারবে না। একথাই অন্যভাবে এবং চমৎকারভাবে বলেছেন মাও-সে-তুং—"It is simple enough for us to see in China that those who are really capable of leading the people for the overthrow of Imperialism and the feudal interest, especially Imperialism, will be trusted by the people : because Imperialism and the feudal interests are the two main enemies of the people. To-day those who are able to defeat Japanese Imperialism and put Democracy into practice will be regarded by the people as the saviours. If the Chinese bourgeoisie is capable of fulfilling their duty, it certainly deserves every praise. Otherwise, the task inevitably falls on the shoulders of China's proletariat."

বহুদিনের বহু আশঙ্কিত টাইফুনের দৌরাত্ম্যে আজ চীনের মাটি টলমল। চীনা ইতিহাসের ধারা সেই দৌরাত্ম্যকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যাবে—যেমন, কালের ভ্রূকুটি, মরুভূমির উত্তপ্ত স্পর্শ, বন্যনদীর উচ্ছৃঙ্খলতা, পাহাড়ের খবরদারীকে অগ্রাহ্য করেই সে মহাকালের ইঙ্গিতে তরতর করে বয়ে এসেছে।